সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী

....

কাবুল থেকে আম্মান

আবদুল মতীন জালালাবাদী
অনূদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

কাবুল থেকে আম্মান

মূল : সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী
অনু : আবদুল মতীন জালালাবাদী

প্রকাশকাল
আষাঢ় : ১৪০১
মহররম :১৪১৫
জুন : ১৯৯৪

ইফাবা. অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১২৪
ইফাবা. প্রকাশনা : ১৭৬৪
ইফাবা. গ্রন্থাগার : ৯৫৮.১
ISBN : 984-06-0148-2

প্রকাশক :
পরিচালক,
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ ও বাধাইয়ে :
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০।

প্রচ্ছদ অংকনে : কাজী শামসুল হক

মূল্য : ৫৫.০০ (পঞ্চান্ন) টাকা মাত্র।

"KABUL THEKE AMMAN" (Reminiscence from Kabul to Amman): Written by Syed Abul Hasan ali nadavi in Urdu, translated by Abdul Matin Jalalabadi into Bengali and published by Islamic Foudation Bangladesh, Dhaka. June-1994

price : Tk. 55.00 U. S. Dollar: 2.75

প্রকাশকের কথা

'কাবুল থেকে আম্মান' পুস্তকটি মূলতঃ একটি ভ্রমণ কাহিনী। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ইসলামী চিন্তাবিদ, মুহাক্কিক আলিম ও বুযুর্গ আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (মা.জি.আ)-এর আফগান রাজধানী কাবুল থেকে জর্দানের অন্তর্গত ইতিহাসখ্যাত ইয়ারমুক পর্যন্ত সফরকে কেন্দ্র করে লিখিত "দরিয়া-এ কাবুল সে দরিয়া-এ ইয়ারমুক তক" নামক পুস্তকের এটি বাংলা তরজমা। আল্লামা নদভী (মা. জি. আ) রাবিতা-ই-আলমে ইসলামীর প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য হিসাবে ১৯৭৩ সালে এ সফর করেন এবং এ সফরে মুসলিম বিশ্বের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ-যেমন আফগানিস্তান, ইরান, লেবানন, সিরিয়া, ইরাক ও জর্দান-বিশেষ করে এসব দেশের রাজধানী শহর সহ কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ করেন। তারপর এই সফর থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতাকেই অত্যন্ত সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন বর্তমান বইয়ে। লেখক এসব দেশ ও দেশের সাধারণ জনজীবনের নিখুঁত চিত্র যেমন এতে এঁকেছেন, তেমনি সেসব দেশের শাসকশ্রেণীর হাল-হাকিকতেরও বিবরণ পেশ করেছেন। এতে মুসলিম বিশ্বের বর্তমান অনগ্রসরতা ও পশ্চাৎপদতার মৌল কারণ, তাঁদের সমস্যা ও সম্ভাবনা, শাসকমহল এবং শাসিত সাধারণ জনগণের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও তা নিরসনের উপায়, পশ্চাত্য সংকট এবং এর হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় প্রভৃতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে হলেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

এখানে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, লেখক ১৯৭৩ সালে যখন এসব দেশ সফর করেছিলেন-তারপর এসব দেশের বুকে অনেক উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে গেছে। এসব পরিবর্তনের মধ্যে আফগানিস্তানে কম্যুনিষ্ট বিপ্লব, আর এ বিপ্লবকে রক্ষার নামে সোভিয়েট রাশিয়ার নগ্ন আগ্রাসন, এরপর এই বিপ্লব ও নগ্ন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আফগান জনগণের সুদীর্ঘ প্রতিরোধ ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম-ফলে অপরিমেয় কুরবানীর মাধ্যমে ইরানের শাহী শাসনের

অবসান এবং ইসলামী বিপ্লবের অভূতপূর্ব সাফল্য ও বিজয়, তারপর এ সাফল্য ও বিজয়ে ভীত ও হতচকিত পাশ্চাত্য বিশ্বের নানাবিধ ষড়যন্ত্র,- তারপর ইরাক-ইরানের দীর্ঘ আত্মঘাতী যুদ্ধের কলংকজনক অধ্যায় ও এর অবসান, ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখল এবং একে কেন্দ্র করে বৃহৎ শক্তিবর্গের নেতৃত্বে আরব বিশ্বের সংগে ইরাকের যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য। এসব ঘটনা আলোচ্য পুস্তকে স্থান না পেলেও এ ধরনের ঘটনার নেপথ্য যেসব কারণ - সে সবের কেবল ইংগিতই নয়-বরং অনেক স্থলেই এর খোলামেলা আলোচনাও এসে গেছে। মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দ, শিক্ষিত ও সাধারণ গণমানুষ এ বিষয়ে সচেতন না হলে এবং এসব কারণ দূরীকরণে সচেষ্ট না হলে এধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি এখানে ঘটতেই থাকবে। এজন্য তিনি মুসলমানদের ইসলামী আদর্শের পরিবর্তে পশ্চিমা আদর্শ গ্রহণকে যেমন দায়ী করেছেন, তেমনি এর হাত থেকে উদ্ধার পেতে মুসলমানদের শক্তি সামর্থের মৌল-উৎস কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরারও পরামর্শ দিয়েছেন। তারপর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমূল ঢেলে সাজাবার জন্য জোর আহবান জানিয়েছেন

আল্লামা নদভী (মা. জি. আ) আজ অশীতিপর বৃদ্ধ। সুদীর্ঘ জীবনের সুবিপুল অভিজ্ঞতা, বহু শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ থেকে প্রাপ্ত সোহবতের ফয়েয ও ঈমানী অন্তর্দৃষ্টির আলোকে যে পরামর্শ ও আহবান আমাদের সামনে রেখেছেন আমরা যেন তা গ্রহণ করে মুসলিম বিশ্বের আগামী দিনের সাফল্যের বুনিয়াদ নির্মাণে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে পারি সেই আশায় আমরা এর প্রকাশে ব্রতী হয়েছিলাম। আল্লাহ আমাদের সেই আশা সফল করুন-মহান আল্লাহর দরবারে এটাই একান্ত মুনাজাত।

মুহাম্মদ লুতফুল হক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

মুখবন্ধ

সব প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। আর দরূদ ও সালাম তাঁর উপর, যিনি রাসূলদের নেতা।

কিছুদিন পূর্বে, এই ভ্রমণ কাহিনীর লেখকের ভাগ্যে জুটেছিল একটি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বদানের সম্মান। প্রতিনিধিদলের সফরসূচীর মধ্যে ছিল আফগানিস্তান, ইরান, লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, জর্দান তথা পশ্চিম এশিয়ার ছয়টি মুসলিম ও আরব দেশ পরিক্রমণ। প্রতিনিধিদলটি ছিল ঐ সমস্ত প্রতিনিধিদলের অন্যতম যাদেরকে মক্কা মুকাররামা ভিত্তিক রাবেতায়ে আলমে ইসলামী হিঃ ১৩৯৩, মুতাবিক ১৯৭৩ ইং সনে বিশ্বের পাঁচটি মহাদেশের বিভিন্ন দেশ সফরে পাঠিয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল একদিকে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের মুসলমানদের সাধারণ অবস্থা, তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও দৈনন্দিন আবশ্যকাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং অন্যদিকে তাদেরকে রাবেতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করা।

এই পুস্তকের সাথে সংশ্লিষ্ট সফরের সময়কাল ছিল ৪ জুন, ১৯৭৩ থেকে ২০ আগস্ট, ১৯৭৩। এই সফরের তথ্যাদি, বাহ্যিক ও অন্তর্দৃষ্টিতে দেখা ঘটনাসমূহ ও তার প্রভাব প্রতিক্রিয়া, বিভিন্নজনের সাথে অনুষ্ঠিত আলাপ-আলোচনা, বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত বক্তৃতা-বিবৃতি, বিভিন্ন জনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ এবং বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনের বিবরণী প্রধানতঃ লেখকের স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে লেখা। অবশ্য কখনো সখনো এজন্য টেপ-রেকর্ডারের সাহায্যও নেওয়া হয়েছে। ফলে এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের জীবন ও জীবিকার বিভিন্ন দিক, সেখানকার অধিবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা, তাদের চিন্তাজগত, সভ্যতা সংস্কৃতি ও মনঃজগতের প্রয়াস-প্রচেষ্টার একটি জীবন্ত ছবিতে পরিণত হয়েছে। যারা ঐ সকল দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আগ্রহ পোষণ করেন তারা এর

মাধ্যমে ঐ সকল দেশের সঠিক পরিস্থিতি এবং ঘটনার ক্রমধারা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

এখানে দু'টি বিষয় বিশেষভাবে প্রনিধান যোগ্য।

১. এই পুস্তকে যে সব মানসিক প্রতিক্রিয়া,চাক্ষুষ দৃশ্য এবং প্রস্তাবনা ও পর্যালোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে লেখকের মানসপটে অংকিত এই সফরের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা ও চিন্তা-ভাবনার প্রতিচ্ছবি মাত্র। এতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে লেখকের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, অভিজ্ঞতা, অভিমত ও চিন্তাধারা। তাই এর দায়-দায়িত্বও লেখকের। এই পুস্তক লেখার সময় লেখক শুধুমাত্র রাবেতারই মুখপাত্র ছিলেন না; অতএব এটা অপরিহার্য নয় যে, রাবেতা এই পুস্তকে বর্ণিত যাবতীয় বিষয়ের সাথে একমত হবে কিংবা লেখকের প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাভাবনার দায়-দায়িত্ব রাবেতার উপর আরোপিত হবে।

২. লেখক তার বর্ণনায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবধারা, সত্যতা, ন্যায়ানুভূতি এবং নিরপেক্ষতার প্রতি সজাগ ও সতর্ক ছিলেন এবং প্রতিটি বিষয়ের গভীরে পৌঁছার আন্তরিক প্রয়াস চালিয়েছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও বিভিন্ন ব্যক্তি, আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অভিমত প্রদানের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ-সংকোচন, ভুল-ভ্রান্তি ও হ্রাস-বৃদ্ধি থেকে নিখুঁত মুক্তির কোন দাবী এখানে করা হচ্ছে না। কেননা এটা শুধু ঐ ব্যক্তির জন্যই সাজে, যিনি বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে ঐ সমস্ত দেশে দীর্ঘ অবস্থান, ব্যক্তিগত জ্ঞান অর্জন ও বিস্তারিত চিন্তা-ভাবনা ও পর্যালোচনার সুযোগ পেয়েছেন। অনেক পর্যটক ও পরিভ্রমণকারী এক্ষেত্রে প্রায়ই ভ্রান্তির শিকারে পরিণত হন। অতএব আমার এই প্রতিবেদনেও যদি সে ধরনের কোন ভ্রান্তি শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের দৃষ্টিগোচর হয় তবে তারা যেন তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন। আর প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই তো ভুলভ্রান্তি থেকে চিরমুক্ত নয়।

সৌভাগ্যক্রমে এই সফরের সূচনা আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল এবং পরিসমাপ্তি জর্দানের রাজধানী আম্মানে। তাই এই পুস্তকের নাম রাখা হয়েছে দরিয়া-ই-কাবুল সে দরিয়া-ই-ইয়ারমুক তক (কাবুল নদী থেকে ইয়ারমুক নদী পর্যন্ত)। এই ঐতিহাসিক নদী দু'টি উল্লেখিত দু'টি দেশের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত এবং এগুলোর সাথে অতীত ও

বর্তমানের অনেক ঐতিহাসিক ও ইসলামী ঘটনা সম্পৃক্ত। এই দু'টি নদীর মধ্যবর্তী ভূ-ভাগসমূহের মধ্যে প্রাথমিক যুগের ইসলামী জয়যাত্রার কল্লোলধারাও একটি পারস্পরিক যোগসূত্র সৃষ্টি করেছিল।

ইতিপূর্বে এই লেখকের, ৩১৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত আর একটি ভ্রমণকাহিনী গ্রন্থনার সুযোগ ঘটেছিল যা 'মুযাক্কারাতে সাইহীন ফীশ্ শারকিল্ আরবী' (মধ্যপ্রাচ্য পর্যটকের ডাইরী) শিরোনামে ইং ১৯৫৪ সনে কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।১

এই ভ্রমণকাহিনী ঐ গ্রন্থনা-ধারারই দ্বিতীয় পর্যায়।শ্রদ্ধেয় পাঠক এই দুই ভ্রমণকাহিনী হতে গত ২২ বছর সময়কালীন ঘটনাপঞ্জীর রদবদল ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন, অনায়াসে আঁচ করে নিতে পারবেন। এগুলোর মধ্য দিয়ে তারা সন-তারিখ, ঘটনাপ্রবাহ এবং মনস্তাত্মিক ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতা এবং প্রাকৃতিক পার্থক্যও উপলব্ধি করতে পারবেন। প্রথম ভ্রমণ কাহিনী ছিল একটি বিস্তারিত দিনপঞ্জী ও অবিন্যস্ত ভ্রমণগাঁথা, আর এই ভ্রমণকাহিনী হচ্ছে ঐ সমস্ত দেশের একটি মোটামুটি পর্যালোচনা-প্রতিবেদন। যারা ঐ সমস্ত দেশের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আগ্রহশীল, যারা মুসলিম বিশ্বের ঘটনা-প্রবাহ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকতে চান, এই ভ্রমণকাহিনী যেমন তাদের চিন্তার খোরাক যোগাবে তেমনি তাদেরকে কিছুটা মর্মাহত ও বিচলিতও করতে।

এই পুস্তক من نهر كابل الى نهر اليرموك শিরোনামে দারুল হেলাল (আংকারা, তুরস্ক)-এর পক্ষ থেকে ইং ১৯৭৪ সনে মুদ্রিত হয়। পুস্তকটি প্রেস থেকে বেরিয়ে আসার আগেই গ্রন্থকার, এর বিভিন্ন অংশ উর্দূতে ভাষান্তরিত করার দায়িত্ব আপন বন্ধু ও প্রিয়জনদের হাতে সমর্পণ করেন। বন্ধুরা কাজটি এত সুষ্ঠুভাবে ও দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করেন যে, আরবী সংস্করণ বের হওয়ার পূর্বেই উর্দূতে ভাষান্তরের কাজ শেষ হয়ে যায়। এসব বন্ধু ও প্রিয়-জনদের নাম যথাস্থানে দেওয়া হবে। গ্রন্থকার অনুবাদটির উপর পুনরায় দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়েছেন। আরবী সংস্করণে প্রধানতঃ ফারসী কবিতা বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং আরবদের অভিরুচির প্রতি লক্ষ্য রেখে শুধুমাত্র আরবী কবিতাই তাতে সংযোজিত হয়েছিল। কিছু ব্যাখ্যা, যা আরবী পাঠকদের জন্য খুব একটা প্রয়োজনীয় ছিল না

তাও বাদ দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়বার চোখ বুলাবার সময় সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এভাবে পুস্তকটি মূল আরবী পুস্তকের চাইতে অধিকতর উপকারী, উপমহাদেশের উর্দূভাষী জনগোষ্ঠীর জন্য অধিকতর আকর্ষণীয় এবং তাদের অভিরুচির অধিকতর নিকটবর্তী হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে সবিনয় ও আন্তরিক প্রার্থনা, তিনি যেন পুস্তকটিকে উপকারী করেন, এর মাধ্যমে অন্ধকার পথসমূহ আলোকিত করেন, যারা ইসলামী পয়গামের বাহক, যারা ঐ সমস্ত দেশের সেবায় নিয়োজিত এবং ঐ সমস্ত দেশকে বিভিন্ন সংকট ও প্রতিবন্ধকতার নিত্য-নতুন চ্যালেঞ্জ থেকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর, এ পুস্তক যেন তাদের মধ্যে শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তার সঞ্চার করে। وعلى الله قصد السبيل গন্তব্যস্থানে পৌছানোর মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তাআ'লাই।

আবুল হাসান আলী নদভী

১. বন্ধুবর মওলভী শামসুল হক নদভী (অধ্যাপক, দারুল উলূম, নওয়াতুল উলামা) 'শারকে আওসাত কী ডাইরী' শিরোনামে দিনপঞ্জী আকৃতির ঐ ভ্রমণকাহিনীর উর্দূ অনুবাদ' মাকতাবায়ে ফেরদাউস লক্ষ্মৌ থেকে প্রকাশ করেছেন।

সূচীপত্র

প্রাণ উৎসর্গকারী রক্ষীসেনার দেশ জর্দান—৬

মুজাহিদীন ও দিগ্বিজয়ীদের দেশ

আফগানিস্তান

১

পাক–ভারত ও ইসলামের ইতিহাসে আফগানিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

ইসলামী ইতিহাসের প্রতিটি যুগেই আফগানিস্তান ছিল বীরযোদ্ধা ও অসমসাহসী অশ্বারোহীদের কেন্দ্রভূমি, দিগ্বিজয়ী বীর যোদ্ধাদের জন্মস্থান, সিংহ পুরুষদের লালন ক্ষেত্র, আর ইসলামের সুদৃঢ় দুর্গ। প্রধানতঃ এ কারণেই বাগ্মিতার রাজা আমীর শাকীব আরসালা এই দেশের ইতিহাস লিখতে গিয়ে ভাবোচ্ছ্বাসে এত বিহবল হয়ে পড়েন যে, ঐ সমস্ত দিগ্বিজয়ী মুজাহিদদের প্রতিচ্ছবি তার মানসপটে জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠে এবং তিনি তার তীক্ষ্ণধার লেখনীকে বাগে রাখতে না পেরে লিখে বসেন।

"আমার প্রাণের শপথ, যদি সমগ্র বিশ্বে ইসলামের স্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়, কোথাও যদি এর মধ্যে জীবনের শেষ চিহ্নটুকুও বাকি না থাকে তাহলেও হিমালয় ও হিন্দুকুশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারীদের মধ্যে ইসলাম যিন্দা থাকবে—যৌবনদীপ্ত থাকবে তার অন্তর্নিহিত দৃঢ়তা ও প্রাণচাঞ্চল্য।"[১]

আফগানিস্তান পাক-ভারতের প্রতিবেশী দেশ এবং এমন প্রতিবেশী যে, হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শুরু থেকেই[২] উভয় অঞ্চলের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য ও রাজনীতি প্রশাসন একটি অন্যটির দ্বারা এতই প্রভাবিত যে, উভয়ের সম্মিলন ও সংমিশ্রণের ফলে এমন এক সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ লাভ ঘটেছে, যাকে পুরোপুরিভাবে না আফগানী বলা যায়, আর না পাক-ভারতীয়, আর না নিখুঁত ইসলামী। অবশ্য শেষ যুগে একে হিন্দ আফগান ইসলামী সভ্যতা (INDO-AFGAN MUSLIM CULTURE) নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৩]

হিজরী পঞ্চম শতাব্দী থেকে যারা পাকভারত উপমহাদেশের উপর নিজেদের শাসন-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন তারা ছিলেন হয় তুর্কী বংশোদ্ভূত, নয়ত বংশ, সভ্যতা ও ঐতিহ্যগত দিক দিয়ে খাঁটি আফগানী। যে সমস্ত তুর্কী পরিবার আফগানিস্তানের পথ ধরে পাক-ভারতে এসেছিলেন তারা যে সব দেশের মধ্য দিয়ে আসেন সেখানকার সৈনিক ও স্বেচ্ছাসেবকদেরও তাদের সংগে নিয়ে পাক-ভারতে প্রবেশ করেন। তাঁদের কেউ ছিলেন গজনভী, কেউ দাস-বংশোদ্ভূত সুলতান, কেউ খিলজী, কেউ তুঘলক এবং কেউ মুঘল। আর যারা ছিলেন আফগান বংশোদ্ভূত তাদের কেউ ছিলেন ঘূরী, কেউ লূধী, আবার কেউ সূরী। ঐ যুগ থেকেই পাক-ভারত উপমহাদেশ এই

সমস্ত সুঃসাহসিক ও অতুলনীয় বীর-বিক্রমদের বিচরণ-ক্ষেত্র হয়ে রয়েছে। পর্বত-পরিবেষ্টিত এই দেশটি ছিল উচ্চাভিলাষী ঐ জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিতে সীমিত ও অপ্রশস্ত। তাই বিজয়ের নেশা প্রশমন ও বীরত্বের বিস্ময়কর লীলাখেলা প্রদর্শনের জন্য যথাযোগ্য ক্ষেত্রের সন্ধানে তাঁরা পাক-ভারতে আগমন করতেন। পাক-ভারতে বিভিন্ন সময়ে যখন মানসিক জড়তা, আলস্য, কর্মবিমুখতা, বিশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক অসন্তোষের শিকারে পরিণত হত, বিশেষভাবে তখনই চিত্তচাঞ্চল্যে ভরপুর ও কষ্টসহিষ্ণু এই আফগান বীর-যোদ্ধারা পাক-ভারত-অভিমুখী হতো। সংখ্যায় অল্প হওয়া সত্ত্বেও তারা বড় বড় শত্রু বাহিনীকে অনায়াসে পরাস্ত করতেন, শক্ত সুদৃঢ় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতেন এবং পাক-ভারতের দুর্বল সমাজদেহে নতুন রক্ত প্রবাহের সৃষ্টি করতেন।

অনুরূপভাবে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে কিংবা সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসকারী অনেক পরিবার জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান ও আসবাবসামগ্রীর অপর্যাপ্ততার কারণে, জীবিকার সন্ধানে অথবা ভাগ্য পরীক্ষার মানসে পাক-ভারতে আগমন করত। এ ধরনের কাফেলা ইসলামী যুগের সূচনা থেকেই পাক-ভারতে আসতে থাকে-আসতে থাকে সংগে নিয়ে নিজেদের বংশগত বৈশিষ্ট্যাবলী ও ঐতিহ্যগত যোগ্যতা, আর এখানে এসে লাভ করে পাক-ভারতীয় পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যাবলী-উদার দৃষ্টিভঙ্গি, ইসলামী ভাবধারা এবং সেই সাথে পাক-ভারতীয় চরিত্র ও শিষ্টাচার। ফলে তাদের বীরত্ব, সাহসিকতা, প্রতিভা ও দূরদর্শিতা আরো উজ্জ্বল, আরো প্রদীপ্ত হয়ে উঠে। পরবর্তীকালে লক্ষ্য করা যায় যে, বীরত্ব, আত্মসম্মানবোধ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সূক্ষ্মদর্শিতায় তারা তাদের প্রাচীন স্বদেশীয়দের চাইতেও অগ্রগামী হয়ে গেছেন। অনুরূপ বহু জনগোষ্ঠী পাক-ভারত উপমহাদেশের দৈর্ঘপ্রস্থে ছড়িয়ে আছে। তারা এখানে এসে নিজেদের ছোট বড় রাজ্যও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাদের থেকেই সংগৃহীত হত বিভিন্ন রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপকবৃন্দ। আর তারাই ছিলেন প্রত্যেকটি যুগে সামরিক শক্তির উৎস ও মৌলিক উপাদান।

পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত আফগানিস্তানকে মনে করত একটি দেশ, যা পাক-ভারতের শাসক-প্রশাসক, ব্যবস্থাপক ও সৈন্য-সামন্তের রফতানীকারক বা যোগানদার। তারা এর নাম দিয়েছিলে বেলায়েত, যেমন বৃটিশ শাসনামলে ইংল্যান্ড এবং তার রাজধানী লন্ডনকে

বেলায়েত (বিলাত) বলা হত। আফগানিস্তান থেকে পাক-ভারতে গমনকারীকে বলা হত বেলায়েতী (বিলাতী)। আফগানিস্তান থেকে আমদানীর এই ধারা বীর সিপাহী ও সমরনায়ক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না, ক্রমে তা অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিস্তার লাভ করে। এই ধারা অনুসারেই বহু বিশিষ্ট পন্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি আফগানিস্তান থেকে পাক-ভারতে আগমন করেন এবং এমন সব গ্রন্থ প্রণয়ন করেন যেগুলোর পঠন-পাঠন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে এ দেশের আলিম সমাজ দীর্ঘদিন পর্যন্ত ডুবে থাকেন।[৪]

আফগানিস্তান ঃ পাক-ভারতীয় মুসলমানের দৃষ্টিতে

পাক-ভারতীয় মুসলমানরা যখনই কোন শোচনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে, চোখে অন্ধকার দেখেছে, দেখেছে চতুর্দিকে নৈরাশ্যের ঘনঘটা অর্থাৎ যখনই এমন অবস্থায় পৌছেছে, যে অবস্থায় মানুষ বাইরের সাহায্যের প্রত্যাশা করে-তখনই তারা আশা ও প্রতীক্ষার দৃষ্টিতে আফগানিস্তানের দিকে তাকিয়েছে-হয়ত বা ওরা তাদেরকে এই সংকট-জনক অবস্থা থেকে, বিপদের এই ঝড়-ঝাপ্‌টা থেকে, রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের এই প্রত্যাশা, তাদের মনের এই আকুতি ও রংগীন স্বপ্ন নিশ্চিত আশার রূপ নিয়েছে। পাক-ভারতীয় মুসলমানদের এই আশা বিস্ময়করভাবে তখন পূর্ণ হয়েছে যখন দিল্লীতে মারাঠাদের শক্তি অসম্ভব রকম বেড়ে যায় এবং এমন আশংকার সৃষ্টি হয় যে, তারা গোটা উপমহাদেশের উপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করে ফেলবে এবং মুসলমানদের যা কিছু প্রভাব প্রতিপত্তি অবশিষ্ট রয়েছে তারও মূলোৎপাটন করবে। তখন দিল্লীর রাজশক্তি মারাঠাদের খেলার পুতুলে পরিণত হয়েছিল, আর মুসলমানরা পরিণত হয়েছিল তাদের কৃপার পাত্রে। নৈরাশ্য, অস্থিরতা ও ক্লান্তির শিকার মুসলমানরা যখন বর্ধিষ্ণু মারাঠা শক্তির মুকাবিলা করতে অপরাগ হয়ে পড়ল, তখনই তাকালো আফগানিস্তানের দিকে। কেননা ওরাই এখন তাদেরকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে। কোন কোন মুসলিম ধর্মীয় নেতা সমকালীন প্রাচ্যের সর্ববৃহৎ সমরনেতা আহমদ শাহ আবদালীর দৃষ্টি পাক-ভারতীয় মুসলমানদের এই শোচনীয় অবস্থার প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং তাঁকে পাক-ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানান।[৫]

তখন আহমদ শাহ আবদালীর উত্থান সবেমাত্র শুরু হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি যুদ্ধে তিনি তাঁর নেতৃত্ব ও বীরত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এ ১৭৬১ সালের ঘটনা। পাক-ভারতের সকল মুসলিম শক্তি তাদের মত ও

পথের বিভিন্নতা সত্ত্বেও আহমদ শাহ্ আবদালীর পতাকাতলে সমবেত হয় এবং দিল্লীর নিকবর্তী পানিপথে মারাঠাদের সাথে তাদের ভাগ্য-নির্ধারক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধের পর মারাঠারা আর কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি।

বৃটিশ শাসনামলে পাকভারতীয় মুসলমানরা আফগানিস্তানের সাহায্য-সহায়তার উপর আরো বেশী ভরসা করতে থাকে। তাদের দৃষ্টি সব সময় ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপর নিবদ্ধ থাকত এই আশায় যে, হয়ত আহমদ শাহ্ আবদালীর মত কোন সেনাপতি তার দুরন্ত-দুর্বার ফৌজ নিয়ে খায়বার গিরিপথ অতিক্রম করে তাদেরকে বৃটিশ আধিপত্য থেকে মুক্ত করতে এগিয়ে আসবেন। স্বাভাবিক কারণেই তাদের এই আশা পূরণ হয় নি। কেননা আফগানীরা তখন ছিল নিজেদের আভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়েই জর্জরিত। তাছাড়া তারা ছিল বহিঃআক্রমণের সম্মুখীন-একদিকে বৃটিশ শক্তি তাদের দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল, অন্যদিকে রুশ শক্তি ছিল তাদের হজম করার অপেক্ষায়। এমতাবস্থায় ক্ষুদ্র অথচ দুর্বল ভারতের উপর আক্রমণ চালিয়ে শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ শক্তিকে পরাস্ত করা কি সম্ভব? যাহোক আফগানীর না এলেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত পাক-ভারতের স্বাধীনচেতা মুসলমানরা আশায় বুক বেঁধে তাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

আমীর আবদুর রহমান খানের পুত্র আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানকে ১৯১৯ সনে হত্যা করা হলে তার পুত্র আমীর আমানুল্লাহ্ খান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে কিছু কিছু দুঃসাহসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং জেনারেল মুহাম্মদ নাদির খানের নেতৃত্বে আফগ্যান সেনাবাহিনী বৃটিশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকবার জয়লাভ করে। এতে আমীর আমানুল্লাহ্ খান সাধারণ মুসলমান-বিশেষ করে স্বাধীনতা প্রিয় মুসলমানদের ভালবাসা ও আশা উদ্দীপনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। এদিকে পাকভারতীয় মুসলমানরা বৃটিশ শাসনের প্রতি একেবারে ত্যক্তরিক্ত হয়ে উঠে। এ অবস্থায় আফগানিস্তানের দিকে পুনরায় হিজ-রতের ঢল নামে। অনেক বিশিষ্ট মুসলিম নেতাও হাজার হাজার শিক্ষিত সংগ্রামী যুবক কাবুলে এসে উপনীত হয়। কিন্তু এই পদক্ষেপ যেহেতু কোন পূর্বপরিকল্পনার অধীন ছিল না, এ থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার সম্পর্কে কোন নেতাই পূর্বাহ্ণে চিন্তাভাবনা করেন নি এবং এ ব্যাপারে আফগান রাষ্ট্রের সাথেও কোন বুঝাপড়া হয়নি তাই শেষ পর্যন্ত এই

আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং হিজরতকারীরা কিছু কিছু অসুবিধারও সম্মুখীন হন।

এরপর আমীর আমানুল্লাহ্ খানের কিছু কিছু ইসলাম বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ, মুস্তাফা কামাল পাশার ন্যায় পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ এবং আপন রাণীকে পর্দার বাইরে বের করার কারণে আফগান জাতির মধ্যে তার বিরুদ্ধে দারুণ অসন্তোষ দেখা দেয় এবং প্রধানতঃ তা থেকেই বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। ইংরেজরা দীর্ঘদিন থেকে এ ধরনের একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তারা এই গণ-অসন্তোষ ও বিদ্রোহকে আমীর আমানুল্লাহ্ খানের ক্ষমতাচ্যুতির ষড়যন্ত্রে যথাযথভাবে ব্যবহার করে। ১৯২৭ সনে আমীর আমানুল্লাহ্খান ক্ষমতাচ্যুত হন এবং তার স্থলে. হাবীবুল্লাহ্ খান ওরফে বাচ্চা সাক্কাহ্ কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করে। এই অবস্থা লক্ষ্য করে ভারতবাসীরা যারপরনাই চিন্তিত ও বিচলিত হয়। এ যেন তাদের নিজেরই দেশের সমস্যা। যাহোক জেনারেল নাদির খান যখন বাচ্চা সাক্কাহ্কে হটিয়ে কাবুলের শাসন ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন এবং দেশের পরিস্থিতিকে মোটামুটি অনুকূলে নিয়ে আসেন তখন আফগানিস্তান সম্পর্কে আশা-পোষণকারীরা পুনরায় কিছুটা আশ্বস্ত হন।

মনে হচ্ছে এটা যেন কাল পরশুরই কথা যে, জেনারেল মুহাম্মদ নাদির খান, আল্লামা ইকবাল, স্যার রাস মাসউদ এবং আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীকে ১৯৩৩ সনে তাঁর দেশের কিছু কিছু ইসলামী ও শিক্ষাগত সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণের জন্য কাবুল ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানান। তারা সানন্দে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং একটি প্রাচীন ইসলামী রাজ্য পরিদর্শন এবং একজন মুসলিম মুজাহিদ শাসকের সাথে সাক্ষাতের এই সুযোগকে একটি সুবর্ণ সুযোগ বলেই মনে করেন।

আমার পরিষ্কার মনে আছে, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মরহুম আল্লামা সুলায়মান নদভী কাবুল থেকে ফিরে আসার পর অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে সেখানকার অবস্থা বর্ণনা করতেন। তিনি বাদশাহ্র সাথে সাক্ষাৎকারের এক গভীর প্রভাব নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন। তিনি লক্ষ্ণৌতেই অবস্থান করছিলেন, এমন সময় অকস্মাৎ বাদশাহ্র নিহত হওয়ার সংবাদ পান এবং এতে তিনি যারপরনাই বিচলিত ও দুঃখিত হন।

বৃটিশ শাসনামলে ভারত–আফগানিস্তান সীমান্ত ছিল উন্মুক্ত। তাই সেখানকার বণিক, আলিম ও বিদ্যার্থীরা ভারতে আসত। ভারতবাসীরা তাদেরকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখত এবং তাদেরকে নিজেদের চাইতে অধিক শক্তিশালী ও আত্মসম্মানী মনে করত। আমাদের বাল্যাবস্থায় কাবুলের বণিকরা তাদের অঞ্চলের বিভিন্ন জিনিষপত্র নিয়ে প্রায়ই এদেশের গ্রামে–গঞ্জে ও শহরে–বন্দরে ঘোরাফেরা করত। ওরা ছিল নামাযের খুবই পাবন্দ। ওদের দৈহিক শক্তি, কঠিন গঠন প্রকৃতি এবং ঢিলাঢালা পোশাক–পরিচ্ছদ দর্শকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করত। ওদের 'আগা' বলা হত। ছোটবেলায় আমি আফগানী বলতে শুধু এই ধরনের বণিকদেরই দেখেছি। কিন্তু যখন আস্তে আস্তে বয়স বাড়তে থাকে এবং বিদ্যাবুদ্ধির পরিসরও বর্ধিত হয় তখন নিজের এই প্রতিবেশীদের সম্পর্কে বহু কিছু পড়েছি, অনেক তথ্য জেনেছি, সাথে সাথে দেশটি দেখার দারুণ আগ্রহও সৃষ্টি হয়েছে।

আফগানিস্তান সফরে বিলম্ব

বিদেশ সফর আমার জীবনে কোন নতুন ঘটনা নয়। আমি বেশ কয়েকবারই বিভিন্ন দেশ সফর করেছি। একাধিকবার ইউরোপেও গিয়েছি, মুসলিম বিশ্বের হারিয়ে যাওয়া সোনার দেশ স্পেনও সফর করেছি। পশ্চিম এশিয়ায় বেশীর ভাগ এবং ভারত মহাসাগরের কিছু কিছু দেশে যাবারও সুযোগ হয়েছে। প্রতিবেশী এই দেশটি সফর করার যাবতীয় কার্যকারণও মওজুদ ছিল। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর উভয় দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। কাবুল এবং গযনীতে আমার বেশ কিছু বন্ধুবান্ধবও ছিলেন, যাঁদের সাথে দ্বীনী ও ইলমী যোগাযোগ ছিল।

হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (মৃত্যু হিঃ ১২৪৬) ইসলাহ্ (সংস্কার) ও তাজদীদের দাওয়াত (আহবান) এবং জিহাদ আন্দোলনেও আফগানিস্তান এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা তাদের যাবতীয় তৎপরতা ও সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দুতে উপনীত হয় আফগানিস্তানেরই পথ ধরে। আফগানীরা অত্যন্ত উৎসাহ–উদ্দীপনা ও জাঁকজমকের সাথে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানায়। গোটা জাতি ও রাষ্ট্র তাঁদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আফগানিস্তানের শাসক পরিবারের সাথেও তাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তবে সে সম্বন্ধ ছিল কখনো দৃঢ়, আবার কখনো শিথিল। ইতিহাস গ্রন্থাদিতে এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে।[৬] যদি

ঐ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ঐতিহাসিক মুহূর্তে আফগানিস্তানের আমীররা সময়ও সুযোগের গুরুত্ব অনুধাবন করতেন, ঐ আন্দোলনের নেতার আন্তরিকতাকে উপলব্ধি করতেন তাহলে আজ এই অঞ্চলের মুসলমানদের ইতিহাস আরো প্রদীপ্ত, আরো গৌরবোজ্জ্বল হত।

আমি আমার যৌবনেই সাইয়িদ আহমদ শহীদ এবং তার দাওয়াতের উপর একটি পুস্তক রচনা করি[৭] এবং ঐ সমস্ত এলাকাও বারবার পরিদর্শন করি যেখানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এবং যেখানে একটি ইসলামী রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ঐ দাওয়াতের ইতিহাসের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রক্ষাকারী এবং অতুলনীয় আত্মসম্মানবোধের অধিকারী আফগানদের দেশ সফর করার সুযোগ আমার ভাগ্যে জোটেনি।

রাবিতা–ই আলমে ইসলামীর প্রতিনিধিদল

আল্লাহ্ তাআলা রাবিতা–ই আলমে ইসলামীর মঙ্গল করুন, তারাই আমাকে এই বীরত্ব ও আত্মবিসর্জনের দেশ আফগানিস্তান সফর করার সুযোগ করে দিয়েছেন। তারা এই সফরের যাবতীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আমার উপর এমনভাবে চাপ সৃষ্টি করেছেন যে, আমার কোন ওজর–আপত্তি বা কর্মব্যস্ততাই তখন আর এপথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারেনি। ফলে দীর্ঘ দিন থেকে অন্তরে পোষিত আমার একটি আশা পূরণের সুযোগ অনায়াসে এসে যায়। 'রাবিতা' আফগানিস্তান, ইরান এবং পশ্চিম এশিয়ার কয়েকটি আরব দেশ সফরের জন্য একটি প্রতিনিধিদল গঠন করে। মজলিসে তাসীসী (Foundation Body)–এর দু'জন সদস্যকে প্রতিনিধিদলের সদস্য, রাবিতা–সচিবালয়ের ইসলামী তানযীম শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত ডঃ আবদুল্লাহ্ আব্বাস নদভীকে সেক্রেটারী ও আমার বিশেষ সাহায্যকারী এবং আমাকে নেতা নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু উভয় সদস্যই–বৈরুতের শায়খ সাদী ইয়াসীন এবং শ্রীলংকার জনাব হানীফা–ই মুহাম্মদ হানীফা (শ্রীলংকার প্রাক্তন মন্ত্রী) কোন না কোন কারণে ভারতে আসতে পারেন নি। তাই রাবিতা সচিবালয়ের 'নাযীরে ইনতেখাব' (নির্বাচন কমিশনার) সাউদী আরবের প্রখ্যাত লেখক, মজলিসে শুরার সদস্য এবং জেদ্দাস্থ বাদশাহ আবদুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ের অধ্যাপক শায়খ আহমদ মুহাম্মদ জালালকে এ প্রতিনিধি দলের সদস্য

মনোনীত করা হয়। এ মনোনয়ন ছিল খুবই সুন্দর ও যথাযথ। তিনি ইং ১৯৭৩ সনের ৩রা জুন রোববার সকালে মক্কা থেকে সোজাসুজি কাবুলে এসে পৌঁছেন এবং কারণবশত আমি একদিন পর অর্থাৎ ইং ১৯৭৩ সনের ৪ঠা জুন সন্ধ্যায় কাবুলে গিয়ে পৌঁছি।

রাবেতা-ই- আলমে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল জনাব শায়খ সালেহ কায্যাব-এর পৃষ্ঠপোষকতায় আমানতে আম্মা (জেনারেল সেক্রেটারীয়েট), প্রতিনিধিদলের কর্মসূচী এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে আফগানিস্তানের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ এবং কাবুলের সাউদী দূতাবাসের সাথে পূর্বাহ্নেই যোগাযোগ স্থাপন করেছিল, যাতে করে প্রতিনিধিদল সুষ্ঠুভাবে নিজেদের দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারে।

আফগানিস্তান সরকার সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে বিশ্বের সর্ববৃহৎ এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিনিধি দলকে, যে সংস্থা সমগ্র ইসলামী বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম, ফাযিল, চিন্তাবিদ এবং 'আসহাবে রায়' -এর প্রতিনিধিত্ব করছে এবং যে সংস্থা এমন শহরে স্থাপিত, যে শহরের সম্মান ও মর্যাদা মুসলিম মাত্রেরই অন্তরে প্রতিষ্ঠিত-সর্বোপরি যে সংস্থার পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন খাদিমুল হারমাইন্ আশ্ শারীফাইন্ এবং ইসলামী ঐক্যের মহান আহবায়ক মহামান্য শাহ্ ফায়সাল।

অতিথি সেবার ক্ষেত্রে আফগানদের খ্যাতি সর্বজন বিদিত। সুতরাং প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী আফগান সরকার জবরদস্তিমূলকভাবেই প্রতিনিধিদলকে সরকারী মেহ্মানের তালিকাভুক্তি করে নেন এবং তাদেরকে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের এবং তাদের ভ্রমণ ও সাক্ষাৎকার কর্মসূচী প্রণয়নের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ণ দায়িত্ব তাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করেন। সাউদী দূতাবাসও ধন্যবাদের সাথে তাদের সে বদান্যতা গ্রহণ করে।

কাবুল ভূখণ্ডে

আমরা ১৯৭৩ সনের ৪ঠা জুন সোমবার দিল্লী থেকে একটি আফগানী বিমানে কাবুল অভিমুখে রওয়ানা হই। বিমানের ঘোষক যখন ঘোষণা করল, 'কাবুল সন্নিকটে' তখন তার সে ঘোষণা অতি মিষ্টি সুরে বাজল আমার কানে, আনন্দে ভরে উঠল মন। কেননা আমার মনের বহু দিনের একটি সুপ্ত আশা

আজ বাস্তবায়িত হতে চলেছে। স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৫টায় আমাদের বিমান কাবুল বন্দরে অবতরণ করে। আবহাওয়া ছিল মনোরম।দিল্লীর উষ্ণ আবহাওয়ার অনুপাতে আমাদের খুবই অনুকূল।

আমাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন ভারতে নিযুক্ত সাবেক সাউদী রাষ্ট্রদূত ও ভারতীয় মুসলমানদের অতিপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ও বর্তমানে আফগানিস্তানে নিযুক্ত সাউদী রাষ্ট্রদূত শায়খ মুহাম্মদ আল হাম্দ আশ শাবীলী এবং তাঁর সাথে ছিলেন সাউদী দূতাবাসের সহকারী রাষ্ট্রদূত আলী আল–ফাওযান, আমাদের প্রতিনিধিদলের সদস্য আহমদ মুহাম্মদ জামাল, কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের কুল্লিয়াতুশ শারীআহ্–এর প্রিন্সিপাল গুলাম মুহাম্মদ নিয়াযী, আফগানী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ধর্মীয় শিক্ষার পরিচালক শায়খ মুহাম্মদ ইসলাম তাসলীম, কাবুলের 'দারুল 'হুফ্ফায' এর মাদীর (তত্ত্বাবধায়ক) মুহাম্মদ ইয়াকূব হাশিমী, 'কুল্লিয়াতুশ্ শারীআহ্' –এর অধ্যাপক আবদুল রাসূল সাইয়াফ প্রমুখ বিশিষ্ট আলিম ও ব্যক্তিবৃন্দ।

'হোটেল কাবুলে' আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। আজ থেকে ঠিক চল্লিশ বছর পূর্বে আল্লামা সাইয়িদ সুলায়মান নদভী, আল্লামা ইকবাল এবং স্যার রাস মাসউদ সমন্বয়ে গঠিত যে প্রতিনিধি দলটি কাবুল সফরে এসেছিলেন তারাও কাবুলে এ হোটেলেই অবস্থান করেছিলেন। ইতিমধ্যে ইমারতটি নতুনভাবে নির্মিত হয়েছে এবং তাতে কিছু পরিবর্তন পরিবর্ধনও করা হয়েছে। আমি যে কক্ষে থাকতাম সে কক্ষের জানালা দিয়ে আমীর আবদুর রহমান খান গাযীর সমাধি নজরে পড়ত। ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা এবং দূর–দূরান্তের অপরিচিত এলাকাসমূহে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর বিরাট অবদানের কথা সর্বজন বিদিত।[৮] অতএব তাঁর পবিত্র সমাধি যেন আমাকে অতীতের সেই সুন্দর স্বর্ণালী দিনগুলোর কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দিত।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আতিথ্য ও সহযোগিতা

কাবুলে আমাদের অবস্থানকাল ছিল মোট ছয়দিন। সে অনুযায়ী স্থানীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় সৌদী দূতাবাসের সহায়তায় বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন, সাক্ষাৎকার, বৈঠক এবং বক্তৃতা বিবৃতির বিস্তারিত কর্মসূচী তৈরী করে রেখেছিল। এই কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন তথা প্রতিনিধিদলের যাবতীয়

কাজে সহায়তা প্রদান, তাদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন-ইত্যকার দায়িত্ব প্রধানতঃ 'কুল্লিয়াতুশ শারীআহ'-এর প্রিন্সিপাল ডঃ গুলাম মুহাম্মদ নিয়াযীর উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি সর্বপ্রথম কুল্লিয়াতুশ্ শারীআহ-এর অধ্যাপক আবদুস রাসূল সাইয়াফকে প্রতিনিধিদলের সঙ্গী (গাইড) এবং দোভাষী নিয়োগ করেন। ভাব প্রকাশে পারঙ্গমতা, কর্মচাঞ্চল্য তথা ঐ কঠিন দায়িত্ব সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পালনের যাবতীয় যোগ্যতাই তাঁর মধ্যে ছিল। তাঁর মত এমন সক্ষম অনুবাদক ও সার্থক ভাব সম্প্রসারণকারী আমি খুব কমই দেখেছি। সেখানকার যুব সমাজের সাথেও ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঠিক পথ প্রদর্শন এবং তাদের উচ্চ ধ্যান-ধারণা ও মন-মানসিকতা গড়ে তোলার প্রতি তিনি খুবই উৎসাহী। তিনি আল্-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কুমিল্লায়াতু উসলিদ্ দ্বীন' থেকে ডিগ্রী প্রাপ্ত। ইতিমধ্যে তিনি আমার লেখা কিছু কিছু বই-পুস্তকও পড়েছেন। তিনি এবং তাঁর বন্ধুবান্ধব সাইয়িদ কুতুব শহীদ, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মাওদূদী এবং এই লেখকের পুস্তকাদি দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবান্বিত এবং ফারসী, পশতু উভয় ভাষায়ই এই সমস্ত বইপুস্তক অনুবাদ করতে আগ্রহী। এই আগ্রহ আরো দু'জন সম্মানিত আলিম ডঃ মুহাম্মদ মূসা তাওয়ানা ও বুরহানুদ্দীন রাব্বানীও পোষণ করেন। শেষোক্ত জনের বেশ কয়েকটি পুস্তক ও অনুবাদ গ্রন্থ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

আমরা কাবুলে যে ছয় দিন অতিবাহিত করেছি তা পরিমাণের দিক দিয়ে-বিশেষ করে ঐ দেশের বিরাটত্বের প্রেক্ষিতে খুবই কম ছিল বটে, তবে ব্যাপক কর্মসূচী ও অত্যাধিক কর্মচাঞ্চল্যের প্রেক্ষিতে তার মূল্য ছিল অনেক বেশী। সংক্ষিপ্ত অবস্থান হেতু-যেজন্য আমরা ছিলাম অনন্যোপায়-কাজের অসম্ভব ভিড় এবং প্রোগ্রামের অস্বাভাবিক চাপ আমাদের সহ্য করতে হয়েছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একই দিনে চার পাঁচটি প্রোগ্রাম আমাদের করতে হয়েছে-যার মধ্যে ছিল কোন বিরাট প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, ছাত্র-শিক্ষক সমাবেশে বক্তৃতা, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাৎকার ও আলাপ আলোচনা। এতে গোটা দিনটাই কেটে যেত এবং আমরা ক্লান্ত হয়ে রাতের বেলা হোটেলে ফিরে আসতাম। কিন্তু প্রতিনিধিদলকে প্রদত্ত আফগানী আলিম সমাজ ও কর্মকর্তাদের সাদর অভ্যর্থনা এবং তাদের কাজের প্রতি পরিলক্ষিত যুব-সমাজের বিশেষ আগ্রহ উদ্দীপনা ছিল আমাদের সে ব্যস্ততার নগদ এবং বলতে গেলে শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার।

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংস্থাসমূহ পরিদর্শন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আমরা সর্বপ্রথম কাবুলের শহরতলীতে অবস্থিত 'মাদ্রাসা-ই-আবী হানীফা' দেখতে যাই। সেখানকার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে আলাপ-আলোচনা হয়। মাদ্রাসাটি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক--এই তিনটি স্তরে বিভক্ত। মাদ্রাসার নাযিম (সুপারিনটেনডেন্ট) উস্তাদ মুহাম্মদ সায়লানী ঘুরে ঘুরে আমাদেরকে মাদরাসার শ্রেণীকক্ষ, হোস্টেল এবং রন্ধনশালা দেখান। আমরা বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের সাথে কথাবার্তা বলি এবং মসজিদে একটি সাধারণ জমায়েতেও বক্তৃতা দেই। শিক্ষার্থীরা আরবী ভাষা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকায় আমাদের ভাষণ বিবৃতি ফারসী ভাষায় অনুবাদ প্রয়োজন দেখা দেয় নি।

এরপর আমরা দারুল হুফ্ফাজে যাই। সেখানকার নাযিম সাইয়িদ মুহাম্মদ ইয়াকূব হাশিমী আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। আমাদের সম্মানে একটি সভার আয়োজন করা হয়। তাতে মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ এবং কাবুলের বহু সংখ্যক উলামা ও মাশায়েখ অংশগ্রহণ করেন।

এরপর আমরা দারুল উলুম পরিদর্শনে যাই। রাজধানীতে এটাই সর্ববৃহৎ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। আমি শুনেছি, বর্তমান প্রধান মন্ত্রী ডঃ মুহাম্মদ মূসা শফীকও এই প্রতিষ্ঠান থেকেই শিক্ষাপ্রাপ্ত। এর শিক্ষকমণ্ডলী খ্যাতনামা আলিম ও শায়খদের সমন্বয়ে গঠিত। এর শায়খুল হাদীস ও প্রধান শিক্ষক হচ্ছেন মওলভী গুল মুহাম্মদ। তাঁর আঙ্গিনায় একটি সভার আয়োজন করা হয়। তাতে শহরের বহু সংখ্যক আলিম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ অংশ গ্রহণ করেন। তারা অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে প্রতিনিধিদলকে অভ্যর্থনা জানান। সভায় উস্তাদ আহমদ মুহাম্মদ জামাল এবং আমি বক্তৃতা করি। আমার বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাবলী, ঈমানের দৃঢ়তা, ধর্মবিমুখ ও ধর্ম বিনষ্টকারীদের হাত থেকে দীনকে রক্ষা, তাঁর বিখ্যাত উক্তি ينقص الدين و انا حى। (ধর্মের মধ্যে কাট ছাঁট হবে অথচ আমি জীবিত থেকে তা দেখবো?)- এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং নিজ নিজ দেশ ও অঞ্চলের উলামা সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে আমি বিস্তারিতভাবে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানীর ঐ সমস্ত কৃতিত্বপূর্ণ কাজের উল্লেখ করি, যা তিনি পাক-ভারতকে ইসলামী গন্ডীর আওতায় রাখার উদ্দেশ্যে আনজাম দিয়েছিলেন। কেননা আফগানিস্তানের বর্তমান যুগ ও

অবস্থার সাথে মুজাদ্দিদে আলফে সানীর যুগ ও অবস্থার বিশেষ মিল রয়েছে এবং তিনি এখানকার সর্বস্তরের লোকের কাছেই সম্মানিত ও সমাদৃত। পরিবেশ ছিল জ্ঞানময় ও ধর্মীয় এবং বেশীরভাগ শ্রোতাই আরবী ভাষা বুঝতেন, তাই আমাদের বক্তৃতা অনুবাদের কোন প্রয়োজন ছিল না। আমরা সরাসরি শ্রোতা সাধারণের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখেই সে সভায় আমাদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

আমরা যে সব আরবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবার এবং সেখানকার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে আলাপ আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কুল্লিয়াতুশ্ শারীআহ্। এই জায়গাটির প্রতি প্রতিনিধিদল স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট ছিলেন। কেননা যারা আজ এখানে শিক্ষার্থী তাদের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করছে দেশের ভবিষ্যৎ ধর্মীয় নেতৃত্ব। এখানকার শিক্ষকবৃন্দ তাঁদের চিন্তাভাবনা, জ্ঞানগত যোগ্যতা, জ্ঞান চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ সুনামের অধিকারী। এই কলেজই ছিল প্রতিনিধিদলের মূল মেযবান (নিমন্ত্রণকারী)। এর প্রিন্সিপাল ডঃ গুলাম মুহাম্মদ নিয়াযী একজন স্বনামখ্যাত গবেষক, আলিম ও পণ্ডিতব্যক্তি। ইসলামিয়াত বিষয়ে তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী। বন্ধুবান্ধবদের পরস্পর পরিচিতির জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ একটি নৈশ ভোজের আয়োজন করেন। কলেজের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় হলে একটি বিরাট সভারও আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় কিছু সংখ্যক বিদেশী রাষ্ট্রদূত, বিখ্যাত আলিম, উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি, সরকারী কর্মকর্তা এবং বিরাট সংখ্যক শিক্ষিত যুবক ও কলেজ শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় প্রদত্ত বিবরণ পরবর্তীতে পেশ করা হচ্ছে।

আমরা মেলালী গার্লস কলেজেও যাই। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেত্রী মেলাল নামীয় একজন আফগান মহিলার নামে কলেজটির নামকরণ করা হয়েছে। সেখানে উস্তাদ মুহাম্মদ জামাল একটি সুন্দর ও পরিবেশ উপযোগী বক্তৃতা দেন। তাতে তিনি ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিতে মুসলিম মহিলাদের স্থান এবং মুসলিম সমাজে তাদের অধিকার, গুরুত্ব ও মর্যাদার উপর আলোকপাত করেন। ঐ কলেজে এমনটি হচ্ছিল, যেন আমরা ইউরোপের কোন গার্লস কলেজে অথবা পাশ্চাত্য দেশীয় কোন মহিলা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছি। বেপর্দা ছিল একটি সাধারণ ব্যাপার, তবে সেই সাথে লজ্জা ও শালীনতার চিহ্নাদিও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। আফগান রমণীদের এ গুণাবলী

এক যুগে কিন্তু দস্তরমত প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল। ঐ সভায় অত্যন্ত সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সাথে বক্তাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়। উস্তাদ আহমদ মুহাম্মদ জামাল অত্যন্ত যোগ্যতা ও যৌক্তিকতার সাথে ঐ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি মুসলিম মহিলাদের অধিকার এবং এ বিষয়ে ইসলামী আইন ও অন্যান্য আইনের তুলনামূলক জ্ঞানে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। কলেজের মেয়েরা প্রিন্সিপালের কাছে দাবী জানায়, যেন বহু বিবাহের অবৈধতার উপর সর্বসম্মত ফাত্ওয়া জারী করা হয় ; কেননা এতে মহিলাদের অমর্যাদা ও অবমাননা নিহিত রয়েছে। সুযোগ্য বক্তা উপরোক্ত দাবীর জবাবে ঐ সমস্ত যুক্তি ও কার্যকারণ অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেন যার প্রেক্ষিতে ইসলাম ঐ ব্যবস্থা বহাল রেখেছে।

আমরা 'মাদ্রাসা-ই-ইসতেক্লাল' নামক ছেলেদের একটি কলেজেও দেখতে যাই। ঐ কলেজে ফরাসী প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কলেজের প্রিন্সিপাল উস্তাদ আবদুল হাদীও ফ্রান্সে শিক্ষাপ্রাপ্ত। সেখানকার শিক্ষার্থীদেরকে সম্বোধন করে কিছু বলার সুযোগ আমার হয়েছিল। আমার বক্তব্য বিষয় ছিল, 'কোন একজন কামিল ব্যক্তিকে অনুকরণীয় আদর্শ তথা উস্ওয়া (IDEAL) হিসাবে গ্রহণ করা এবং যুব সমাজের প্রতিপালন ও চরিত্র গঠনে তাঁর প্রভাবকে কাজে লাগানো'

আধুনিকতা প্রিয় আফগান মহিলাদের সাথে আলাপ-আলোচনা

সউদী দূতাবাসের একান্ত ইচ্ছা ছিল, যেন কাবুলে আমাদের এই সংক্ষিপ্ত অবস্থান অধিক থেকে অধিকতর উপকারী হয়। তাই এই সুযোগে তারা শিক্ষামূলক ও ধর্মীয় মজলিসাদি, বিভিন্ন সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছিলেন। রাষ্ট্রদূতের জাঁকজমকপূর্ণ বিরাট বাসস্থানের দুটি বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এর একটি বৈঠক ছিল বিশিষ্ট, সম্মানিত ও ধর্মপরায়ণ অভিজাত মুসলিম মহিলাদের। আল্লাহ্র শুক্র, ঐ মহিলাদেরকে ইসলামী আকায়েদের প্রতি বিদ্রোহী কিংবা আধুনিক সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুকরণ করতে গিয়ে ধর্মের প্রতি ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠতে দেখি নি।

আফগান মহিলাদের মধ্যে আধুনিক সভ্যতা ও প্রাচ্যবিদদের চিন্তার প্রভাব

আমরা এ কথা উপলব্ধি না করে পারি নি যে, আফগানিস্তান পাশ্চাত্য সভ্যতা অনুকরণের ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে গেছে এবং তার ফলাফলও

ইতিমধ্যে প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। ১৯২৮ সন এবং ১৯৭৩ সনের আফগানিস্তানের মধ্যে ব্যবধান যেন প্রশস্ত পারাবারের।

আমীর আমানুল্লাহ্ খানের যুগ পর্যন্ত আফগান জাতি ইসলামী আফগানী মিশ্র সংস্কৃতির উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারা সেটাকে দাঁত দিয়ে এমনভাবে আঁকড়ে ধরেছিল যে, তাতে কিছুটা বাড়াবাড়িই পরিলক্ষিত হত। সম্ভবতঃ এরই ফলশ্রুতিতে, আমীর আমানুল্লাহ্ খানের কিছু প্রাচীন চাল-চলনের বিরুদ্ধাচরণের কেন্দ্র করে তাঁর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিদ্রোহের ঝড় উঠে এবং তাকে শেষ পর্যন্ত সিংহাসনচ্যুত হতে হয় কিন্তু এখনকার অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখন আফগানীরা তাদের অতীত ঐতিহ্য থেকে অনেক দূর সরে গেছে। এই দূরত্ব মাস ও বছরের হিসাবে নিঃসন্দেহে অনেক কম-অর্থাৎ মাত্র ৪৫ বছর, কিন্তু প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে অনেক বেশী। অধিকাংশ জাতিই এই দূরত্ব অতিক্রম করতে শতাব্দীর পর শতাব্দী পার করে দেয়। পর্দা প্রথা আজ সেখানে পশ্চাৎ-পদতা, মূর্খতা ও দারিদ্রের আলামত বলে সাধারণভাবে চিহ্নিত। তাই আজ পল্লী অঞ্চলের কোন কোন ধর্মপরায়ণ আলিম পরিবার এবং রাজধানী থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থিত কৃষক পরিবারের মধ্যেই পর্দাপ্রথা সীমাবদ্ধ। ইংরেজী পোশাক-পরিচ্ছেদের প্রচলন সার্বজনীন। তবে প্রাচীন পরিবেশ ও প্রাচীন মন-মেজাজের ইসলামী বৈশিষ্ট্যাদির কিছু কিছু প্রভাব এখনো এই মহিলাদের মধ্যে অবশিষ্ট আছে। বোধহয় একারণেই তাদের জিজ্ঞাসার ধরন ও আলাপের ভঙ্গিতে অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার কোন প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়নি। আমাদের সাথে আলাপ আলোচনা করার সময় তাদেরকে অত্যন্ত সতর্ক দেখা যায়। তাদের কথাবার্তার মধ্যে ধর্ম ও ধর্মপরায়ণদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটা অকৃত্রিম ভাব পরিলক্ষিত হয়। ইসলাম মহিলাদেরকে সমাজে কি স্থান ও মর্যাদা দিয়েছে তা জানার জন্য তারা খুবই উৎসাহী। কিন্তু তাদের জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা থেকে বুঝা যাচ্ছিলো, ভিন জাতির সভ্যতা সংস্কৃতির প্রভাব এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও ইসলামী মূলনীতির বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদদের প্রোপাগাণ্ডা ও পাশ্চাত্য সমাজে প্রচলিত স্ত্রী পুরুষের তথাকথিত সাম্যনীতির বাহ্যিক আকর্ষণ ইতোমধ্যে তাদেরকে স্ব-অবস্থান থেকে অনেক দূর সরিয়ে নিয়েছে। আমরা তখন গভীরভাবে উপলব্ধি করছিলাম ইসলাম ও ইসলামী শারীআতকে আধুনিক ভঙ্গিতে উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা। আমাদের চোখে

পরিষ্কার ভেসে উঠছিলো, আধুনিক শিক্ষিত সমাজকে তৃপ্তিদানের ক্ষেত্রে মুসলিম ধর্মীয় নেতা, ধর্মীয় লেখক এবং ধর্মের প্রতি আহবানকারীদের প্রচার কার্যের প্রয়োগিক ও কলা-কৌশলগত দুর্বলতা। মোটকথা দীনের প্রতিনিধিত্বকারী উলামা এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে ইতোমধ্যে এমন বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে যা দূর করা আদৌ সহজ ব্যাপার নয়।

ঐ বৈঠকে আমাদের সুবিজ্ঞ বন্ধু উস্তাদ আহমদ মুহাম্মদ জামাল কথাবার্তা বলেন এবং ইতোমধ্যে বলাও হয়েছে, তিনি এই বিষয়ে একজন স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ। তিনি এ বিষয়ের উপর 'মা কানুকি তুহ্মাদী' (مكانك تحمدى) শীর্ষক একটি সুন্দর গ্রন্থও রচনা করেছেন। আমি শ্রোতাদের মনমানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রেখে সাধারণ ভঙ্গিতেই কিছু বলা সমীচীন মানে করলাম। আমার বক্তব্য ছিল নিম্নরূপঃ

পর্দালংঘন এবং সামাজিক রীতিনীতির প্রতি বিদ্রোহ জাতীয় অধঃপতনেরই পূর্বাভাস

"আমি বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস (বিশেষ করে বিভিন্ন জাতির এবং বিভিন্ন সভ্যতার উত্থান-পতনের ইতিহাস) গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেছি এবং তাতে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে, বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এমন কি, শীর্ষস্থানীয় ও যাদুকরী সভ্যতা-সংস্কৃতির পতন ও ধ্বংসপ্রাপ্তির সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক কারণ হলো, তাদের সামাজিক ব্যবস্থাপনায় বিশৃংখলা, পারিবারিক জীবনে ভারসাম্যের অভাব, নারীপুরুষের পরস্পর মেলামেশার মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও বিচ্যুতি, গৃহস্থালী জীবনের প্রতি নারী সমাজের অন্যমনস্কতা এবং আপন আপন স্বাভাবিক দায়িত্ব থেকে পলায়ন মনোবৃত্তি। অতীতে দ্রুত ধ্বংস হয়েছে কিংবা বর্তমানে দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এমন জাতির দিকে তাকালে দেখা যায়, সর্বপ্রথম তাদের নারী সমাজ গৃহস্থালী জীবন এবং নিজেদের নির্ধারিত দায়িত্ব থেকে পরাম্মুখ হতে শুরু করেছে, বঞ্চিত হয়েছে প্রীতি ভালবাসার মানসিকতা থেকে, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সন্তানের লালন-পালন ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ থেকে, ভুলে গেছে নিজের ঘরকে সুখশান্তির আলোয়ে পরিণত করার কথা এবং যেস্থলে তাদের পরশে ও প্রভাব তাদের ঘর পুরুষের জন্য জান্নাত-সদৃশ অনুভূত হওয়ার কথা, সে স্থলে তারা ঘর ছেড়ে,

নিজেদের আসল দায়িত্ব ও কর্তব্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে পুরুষদের কর্মক্ষেত্রে তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় উঠে পড়ে লেগেছে। ফলে ঐ সমস্ত সমাজে মানসিক ও চিন্তাগত দ্বন্দ্ব, ঢালাওভাবে আইন লংঘন, স্বেচ্ছাচারিতা এবং চারিত্রিক অধঃপতন দেখা দিয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে তারা অত্যন্ত দ্রুত-গতিতে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে গেছে। এই হচ্ছে প্রাচীন গ্রীকদের কাহিনী এবং প্রাচীন রোমীয় ও ইরানীদের অধঃপতনের মূল কথা। প্রাচ্যে দেশীয় জাতি-সমূহকেও এই একই ভোগান্তির শিকার হতে হয় কি না, আমি সে আশংকাই করছি এবং অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলছি যে, প্রাচ্যদেশীয় ইসলামী সমাজে ঐ সমস্ত চিহ্নাদি ইতোমধ্যে প্রকাশিতও হয়ে পড়েছে।

আংশিক সংশোধনের সাথে এই হচ্ছে আমার সেদিনকার ভাষণের সার কথা (অবশ্য লেখা ও ভাষণের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা পার্থক্য হয়ে যায়)। আশাকরি, আমার সম্মানিত আফগানী বোনদের কাছে আমার এই কথাগুলো পৌঁছবে। হায়, যদি তারা আসন্ন এই বিপদটি প্রতিহত করার ক্ষেত্রে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারতেন।

তারপর উস্তাদ আহমদ মুহাম্মদ জামাল একটি জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেন। তাতে তিনি নারীদের সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজে তাদের মর্যাদা, মানবজীবনে তাদের কর্তব্য এবং একটি ভাল বংশ ও এমন সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে তাদের কি দায়িত্ব ও ভূমিকা রয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এরপর যেন প্রশ্নের এক অবারিত বন্যা আছড়ে পড়ে। বেশীর ভাগ প্রশ্নই বহু বিবাহ, তালাকের অধিকার, পুরুষেদের বৈশিষ্ট্য এবং শরীআত নির্দেশিত পর্দা সম্পর্কিত। শেষ পর্যন্ত শান্তি ও গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শেষ হয় এবং সব শ্রোতাই নৈশ আহার এবং ইশার নামাযের জন্য উঠে পড়েন।

আমার বন্ধু উস্তাদ আহমদ জামাল কাবুলের মহিলাদের আর একটি বৈঠকে যোগদান করেন। আমি তখন গযনীতে ছিলাম। সেখান থেকে ফিরে আসার পর তিনি আমাকে জানান যে, ঐ বৈঠকেও তালাকের অধিকার এবং বহু বিবাহ সম্পর্কে কড়া তর্ক-বিতর্ক হয়। এই সমস্ত ঘটনা দ্বারা অনুমান করা যেতে পারে, আফগান নারী সমাজ তাদের চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে আজ বিশৃংখলার কোন্ স্তর অতিক্রম করছে এবং কি পরিমাণ প্রভাবিত করেছে তাদের অন্তর ও মন-মানসিকতাকে বিজাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির অপপ্রচার।

কাবুলের উলামার সাথে আলাপ আলোচনা

সাউদী দূতাবাস আয়োজিত দ্বিতীয় বৈঠকটি ছিল উলামাদের জন্য নির্দিষ্ট। যেহেতু ধর্মীয় ও মাযহাবী পর্যায়ে সাউদী দূতাবাসকে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়, তাই দূতাবাস আয়োজিত ঐ বৈঠকে বিরাট সংখ্যক উলামা ও মাশায়েখ অংশগ্রহণ করেন এবং সেখানে অত্যন্ত ভ্রাতৃত্বসুলভ পরিবেশে ও খোলা মনে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ রাতে আমার আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল "ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারের ক্ষেত্রে উলামা সমাজের দায়িত্ব ও জনগণের সাথে তাদের সরাসরি যোগাযোগ।" যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমি উলামা সমাজের দৃষ্টি যুব শ্রেণীর প্রতিই বিশেষভাবে আকর্ষণ এবং এ ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের কোন কোন প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলন কর্তৃক অর্জিত অভিজ্ঞতার একটি ছবিও তাদের সামনে তুলে ধরি। আমি তাদের কাছে উপমহাদেশের তাবলিগী জামাআত এবং তাদের গৃহীত কর্মসূচীর উল্লেখ করে কিভাবে এই জামাআতটি আমাদের এই যুগে জনগণের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে ইসলামের পয়গাম সাধারণ মুসলমানের ঘরে, হাটে-বাজারে ও গ্রামেগঞ্জে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে, কিভাবে তাদের দাওয়াত দূরদূরান্তের দেশসমূহে বিস্তার লাভ করেছে, কিভাবে তারা সাধারণ মানুষের অন্তরে ধর্মীয় চেতনা, দ্বীনী প্রেরণা, আল্লাহ্‌র পথে ত্যাগ স্বীকারের মনোবৃত্তি জাগ্রত করার সার্থক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তার একটি মোটামুটি বিবরণ তুলে ধরি। আমি বলি, সাধারণ মানুষ বিশেষ করে যুব সমাজকে ধর্মের পথ প্রদর্শন, ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং ধর্মীয় জ্ঞান ও অনুভূতি থেকে বঞ্চিত রাখা একটি অতি মারাত্মক ব্যাপার। কেননা এমতাস্থায় তারা যে কোন দুষ্কৃতিকারী ও অবিশ্বাসীর সহজ পাচ্য ও উপাদেয় খাদ্যগ্রাসে পরিণত হতে পারে এবং অতি সহজেই যে কোন ধ্বংসাত্মক ও ইসলাম বিরোধী আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়ে পড়তে পারে।

আমি যুব সম্প্রদায় বিশেষ করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি উলামা সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কেননা এরাই জাতির ভবিষ্যৎ। এরাই অদূর ভবিষ্যতে দেশের নেতৃত্ব তথা সামাজিক আইন-কানুন রচনা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গতি নিয়ন্ত্রণ এবং দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। রাষ্ট্র পরিচালনার চাবিকাঠি থাকবে এদের হাতেই। অতএব এদের সংশোধন মানে

দেশ ও জাতির সংশোধন। ইসলামী আকীদার উপর এদের দৃঢ় বিশ্বাস এবং ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি এদের আন্তরিক আকর্ষণ জন্মালেই এই অঞ্চলে ইসলাম পুর্নজাগরিত এবং ফলে-ফুলে সুশোভিত হয়ে উঠতে পারে। ইসলামের জনকল্যাণমূলক কাজের প্রতি এদের অবিশ্বাস, এদের আকীদা, বিশ্বাসগত দুর্বলতা, ইসলামের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং নেতৃত্বের যোগ্যতার প্রতি নৈরাশ্য, পাশ্চাত্য সভ্যতাকে মানুষের উন্নতি, স্বাধীনতা এবং সম্মান ও সৌভাগ্যের শেষ কথা মনে করা, প্রকৃতপক্ষে চিন্তাগত ও সাংস্কৃতিক সত্যবিমুখতা ছাড়া কিছু নয়। যখন এই চিন্তাধারা কোন দেশ ও জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তখন তার দাবাগ্নি থেকে না কোন প্রাসাদ অট্টালিকা রক্ষা পায়, আর না রক্ষা পায় দারিদ্রের পর্ণকুটির, কিষাণের শস্যক্ষেত, আলিমের মাদ্রাসা অথবা সংসার ত্যাগী সাধকের খান্‌কা। আমি প্রসঙ্গত কিছু সংখ্যক ইসলামী রাষ্ট্রের দুঃখজনক পরিণতির এমন কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরি, যাতে পরিষ্কারভাবে দেখানো হয় যে, সেখানকার উলামা তাদের যুব সমাজের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রতি নির্লিপ্ত থাকার ফলে কি নিদারুণভাবে তাদের দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধাররা অবিশ্বাস, অধর্ম, কম্যুনিজম ও বস্তুবাদের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছে। কম্যুনিস্টরা অন্যান্য আরো অনেক দেশের ন্যায় ঐ সমস্ত মুসলিম দেশেও ছাত্রছাত্রী তথা যুব সম্প্রদায় এবং সামরিক বাহিনীর সদস্যদেরকে তাদের প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে চিহ্নিত করে এবং মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তাদের আন্দোলন এমন শক্তিশালী হয়ে উঠে যে, তারা গোটা দেশকে লাঠির জোরে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় এবং রাষ্ট্রের মূল চাবিকাঠি হস্তগত করে শাসন পরিচালনার মূলনীতি নির্ধারণের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব লাভ করে।

আমি একথাও পরিষ্কার করে বলি যে, যুবকদের মধ্যে কাজ করতে হলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ, যুবকদের মন-মানসিকতা গভীরভাবে অধ্যয়ন এবং সে প্রেক্ষিতে প্রতিটি বিষয় ও প্রতিটি সমস্যা অনুধাবনের চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে হযরত আলী (কা. অ.)-এর নিম্নোক্ত উপদেশটি অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে।

كلموا الناس على قدر عقولهم

اتريدون ان يكذّب الله و رسوله

অর্থাৎ " মানুষের বুদ্ধি–বিবেচনার (পরিমাণের) প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের সাথে কথা বলো। তোমরা কি চাও যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হোক।"

এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, যুব সমাজের অন্তরে ও মন–মস্তিষ্কে এ চিন্তাধারা নতুনভাবে বদ্ধমূল করে দিতে হবে যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা অনুসরণের মাধ্যমেই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের যাবতীয় যোগ্যতা ও গুণাবলী অনায়াসে অর্জন করা সম্ভব। ইসলাম শুধু যুগের সাথে খাপ খাইয়ে চলে না, সর্বযুগে মানব সমাজকে সঠিক পথে নেতৃত্ব প্রদানেরও সর্বাধিক যোগ্যতা রাখে।

صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِىْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ

অর্থ ঃ ''এটা আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি নিপুণতা, যিনি সমস্ত কিছুকে করেছেন সুষম।"–(২৭ ঃ ৮৮)

এই লক্ষ্য হাসিলের জন্য এমন ইসলামী সাহিত্যের প্রয়োজন যা যুবকদের আত্মিক তৃষ্ণা মেটাবে, তাদের মস্তিষ্কের গ্রন্থিসমূহ উন্মোচন করে দেবে। এ ধরনের আঞ্চলিক ভাষায় রচনা করা যেতে পারে অথবা অন্যান্য ভাষা থেকে অনুবাদও করা যেতে পারে।

ঐ বৈঠকে উস্তাদ আহমদ মুহাম্মদ জামালও তার বক্তব্য রাখেন এবং তাতে তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তুলে ধরেন। এরপর আলোচনা শুরু হয়। কয়েকজন বিশিষ্ট শ্রোতা আমাদের বক্তৃতার উপর তাদের মতামত পেশ করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের 'ওয়াজ ও ইরশাদ' বিভাগের মহাপরিচালক উস্তাদ বাশ্‌শার এবং শায়খ মুহাম্মদ হাশিম মুজাদ্দিদী। তারা আমাদের উপস্থাপিত বক্তব্যের উপর তাদের মতামত ব্যক্ত করেন এবং কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাখ্যাও প্রদান করেন। তারপর বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় এবং সকলে হাসিখুশী মনে সেখান থেকে বিদায় নেন।

মন্ত্রী ও অন্যান্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাৎকার

যে সব দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সাথে আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটে তাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন শিক্ষামন্ত্রী জনাব মুহম্মদ ইয়াসীন আজীম

এবং সহকারী মন্ত্রী ডঃ মুহাম্মদ সিদ্দীক। আমরা তাদের সাথে তাদের অফিসেই সাক্ষাৎ করি এবং তাদের সাথে ইসলামী দেশসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করি। শিক্ষামন্ত্রী অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে আমাদের কথা শুনেন। যেহেতু সফরসূচী তৈরী থেকে শুরু করে প্রতিনিধিদলকে প্রয়োজনীয় সব রকমের সুযোগ সুবিধা প্রদানের দায়িত্ব মূলতঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত ছিল এবং এই মন্ত্রণালয়ই আফগানিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের আমন্ত্রণকারী ছিলেন, তাই আমরা শিক্ষামন্ত্রী ও সহকারী শিক্ষামন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। শিক্ষামন্ত্রী আমাদের সম্মানে একটি ভোজসভার আয়োজন করেন। তাতে প্রধানতঃ কুল্লিয়াতুশ্ শারীআহ্-এর শিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

সদরে আজম (প্রধানমন্ত্রী)-এর বিশেষ উপদেষ্টা উস্তাদ আবদুস সাত্তার সীরত-এর সাথেও আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তিনি মিসরের আল -আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত। তিনি আরবদের মতই অনর্গল আরবী ভাষায় কথা বলতে পারেন। এছাড়াও আমাদের সাথে সাক্ষাৎ হয় বিচার মন্ত্রণালয়ের আণ্ডার সেক্রেটারী জনাব সামীউদ্দীন যুন্দ, নিয়াবতে আম্মার আণ্ডার সেক্রেটারী আবদুল হাদী হিদায়েত, সেন্ট্রাল ওয়াক্ফ্ বোর্ডের পরিচালক উস্তাদ কামিল শিন্ওয়ারী, আটগান জামীয়াতুল উলামার সদ্‌র মুহাম্মদ সিদ্দীক কুবারী প্রমুখ ব্যক্তিবৃন্দের সাথে। তাদের সাথে ছিলেন বিচার মন্ত্রণালয়ের পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং তাদের কোন কোন বিভাগের নির্বাচিত কিছু সংখ্যক দায়িত্বশীল ব্যক্তি। উস্তাদ আহমদ মুহাম্মদ জামাল আমার কাবুল পৌছার আগেই তথ্য মন্ত্রীর সাথে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়েছিলেন। উস্তাদ আবদুর রাসূল সাইয়াফ প্রায় সব সাক্ষাৎকার এবং সভা-বৈঠকেই অত্যন্ত যেগ্যতা ও পারদর্শিতার সাথে আমাদের বক্তব্য ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেন। আমি একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করছি যে, সেখানকার সব লেখাপড়া জানা লোক, মন্ত্রীবর্গ এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ ফারসী ভাষায় কথাবার্তা বলেন অথচ সেখানকার সরকারী ভাষা হচ্ছে পুশ্তু। সরকারী আদেশ-নির্দেশ ও বিজ্ঞপ্তিসমূহ এই ভাষায়ই প্রকাশিত হয়, সরকারী চিঠিপত্রও এই ভাষা ব্যবহার করা হয়। আমন্ত্রণপত্রের ভাষাও এই পুশ্তু ; এতদ্সত্ত্বেও ফারষী ভাষা সবাই বুঝে এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক সব ধরনের অনুষ্ঠানে ফারসী ভাষাই ব্যবহার করা হয়। আমাকে বলা হয়েছে যে, পাখতুনিস্তান

আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে এবং বেলুচিস্তান সংলগ্ন কান্দাহার অঞ্চলেও ফারসী ভাষা বহুলভাবে প্রচলিত।

এই সফরে যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ করে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হই এবং যাদের সংসর্গে দীর্ঘ সময় কাটাই তাদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মদ ইসলাম তাসলীম এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হচ্ছেন ঐ সমস্ত উলামার অন্যতম যারা ধর্মের উপর সুদূর থেকেও আধুনিক আফগানিস্তানে নিজেদের উচ্চ সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা বজায় রেখেছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল ও উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ তাকে অত্যন্ত সমীহ করে চলেন। পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মাওলানা তাদের আস্থা পুরোপুরি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

জাতির মধ্যে দিন দিন আলিম সমাজের প্রভাব হ্রাস এবং তার ফলশ্রুতি

আফগানিস্তান কিছু দিন পূর্বেও ছিল উলামা ও মাশায়েখের দেশ। সেখানে আলিমদের প্রভাব এত বেশী ছিল, যা অন্য কোন দেশেই ছিল না। যে কোন ব্যক্তি বা সরকারের কাছে আলিমদের সাহায্য সহযোগিতা এবং তাদের সন্তুষ্টি–অসন্তুষ্টির একটি বিরাট মূল্য ছিল। কেননা এগুলোর প্রতিক্রিয়া ছিল সুদূর প্রসারী। তাই সরকার, জাতি–উভয়ের কাছেই আলিম সমাজের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। উলামাদের জিহাদ–ধ্বনি (না'রাই জিহাদ) যাকে তারা সাধারণ ভাষায় 'গাযা' বলে থাকেন– যখন শহরে পল্লীতে গুঞ্জরিত হত তখন সাধারণ–অসাধারণ নির্বিশেষে সকলের হৃদয় ও মন–মস্তিষ্ক নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ত। ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, ধর্মীয় প্রভাব সংরক্ষণ, ইসলামী চরিত্র ও চালচলনের উপর বহাল থাকা এবং ইসলাম বিরোধী আন্দোলনের স্বার্থক মুকাবিলা এই আলিমদেরই প্রভাব প্রতিপত্তি ও সক্রিয় সহযোগিতার দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। যখন বেশীর ভাগ মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটেছে তখন আফগানিস্তানে এখনো শরয়ী আদালত ও ইসলামী কানূন বহাল থাকার কারণ সম্ভবত এই উলামাই। এই প্রেক্ষিতে আফগান সরকার নিঃসন্দেহে মুবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য।

এই কিছুদিন পূর্বেও হাজার হাজার আফগান ছাত্র পাক-ভারতের বড় বড় ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে-বিশেষ করে দারুল উলুম দেওবন্দে বিদ্যা শিক্ষার

জন্য আসত। কেননা আফগানরাও তুর্কীদের মত শতকরা একশ জনই সুন্নী, হানাফী। কিন্তু এবারকার সফরে বুঝতে পারলাম, সেই জাতিগত ঐতিহ্যের পরিসম্পাপ্তি ঘটেছে অথবা শীঘ্রই ঘটতে যাছে।

কালের আবর্তন বিবর্তনের সাথে সাথে আলিম সমাজ তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেকখানি খুইয়ে বসেছেন। এতে অবশ্য সরকারের 'দূরদর্শী' কর্মসূচীও কাজ করেছে। সে দেশের সরকার তাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকেই উক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। তারা লক্ষ্য করেছে যে, উলামা সমাজ আমীর আমানুল্লাহ্ খানের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই সমগ্র দেশ ব্যাপী তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে এমনভাবে জ্বলে উঠেছিল যে, তিনি দেশ ছাড়া না হয়ে নিস্তার পান নি। সম্ভবতঃ আল্লামা ইকবাল বর্ণিত ইবলীসের ঐ কৌশলপূর্ণ উপদেশের কথাও কাবুলের বিজ্ঞ রাষ্ট্র নায়কদের দৃষ্টি এড়ায় নি, যাতে ইবলীস তার ভক্ত অনুরক্ত নেতাদেরকে সম্বোধন করে বলছে-

افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج

ملا کو اس کے کوہ و دمن سے نکال دو !

আসল ওষুধ আফগানীদের সাচ্চা দীনী গায়রাতে
দাও হাকিয়ে সব ক্ষমতার আসন হতে মোল্লাদের।[১]

সুতরাং আজ আফগানীদের ধর্মীয় সম্ভ্রম ও আত্মসম্মানবোধ লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। আফগানী সমাজ-ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন এসেছে এবং জাতি তা এমনভাবে হজম করে নিয়েছে যে, তাদের মধ্যে কোন হৈচৈ পরিলক্ষিত হয় নি। সেখানে বেপর্দার সয়লাব আছে, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ ও ফিরিঙ্গি আচরণের স্রোত বয়ে গেছে, কিন্তু কেউ এগুলোর বিরুদ্ধে টু শব্দটি করে নি। আর এখন তো আফগানিস্তান হিন্দীদের একটি বড় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। হাশীম এবং অন্যান্য মাদক দ্রব্য সেখানে প্রচুর পরিমাণে বেচাকেনা হয়। আমি ভালভাবে উপলব্ধি করেছি যে, মাদক দ্রব্য ব্যবসায়ীদের একটি বিরাট দল আমাদের সাথে একই বিমানে ছিল। বিমান কাবুলে অবতরণ করার সাথে সাথে তারা মুহূর্তের মধ্যে এদিক ওদিক ছিটকে পড়ে। নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার কুফল ইতিমধ্যে

আফগানীদের জাতীয় চরিত্রে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপার সেখানে কোন প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি করতে পারছে না। আর এটাই হচ্ছে আফগানীদের 'দীনীগায়রাত' ও ইসলামী আত্মাসম্মানবোধ হারিয়ে যাবার বড় প্রমাণ। এর সবচেয়ে বড় কারণ হলো, সামাজিক নেতৃত্ব উলামাদের হাত থেকে রাজনীতিকদের হাতে চলে গেছে। আর রাজনীতিকরা প্রত্যেকটি সামাজিক বিষয়কে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিতে দেখেন বলে উপস্থিত যে কোন পরিস্থিতির সামনে মাথা ঝুকিয়ে দেওয়াকেই তারা বুদ্ধিমত্তার কাজ বলে মনে করেন।

আমি শুনেছি, হিরাত এখনো ইলম, উলামা, মাদ্রাসা ও মসজিদের শহরই রয়ে গেছে। সেখানে এখনো দ্বীনী ইলম্ ও উলামাকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হয় এবং সর্বত্রই পুণ্য ও তাক্ওয়ার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমি এই ঐতিহাসিক শহর এবং দ্বীনী ও ইলমী কেন্দ্র দেখে আসতে পারি নি। সেখান থেকে অনেক উলামা ও সমাজ সংস্কারকের আবির্ভাব হয়েছে। এক্ষেত্রে বিখ্যাত আরিফ (তত্ত্ব-জ্ঞানী) ও মুহাক্কিক (গভীর জ্ঞানী) ইমাম আবদুল্লাহ্ আনসারী (যার প্রণীত গ্রন্থ 'মানাযিলুস্ সাইরীন' এর ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম তার বিখ্যাত গ্রন্থ মাদারিজুস সালিকীন লিখেছেন) এবং বিখ্যাত মুহাদ্দিস (হাদীসবেত্তা) ফকীহ্ ও মুহাক্কিক আল্লামা নূরুদ্দীন আলী বিন সুলতান মুহাম্মদ (যিনি মুল্লা আলী ক্বারী নামে সমধিক খ্যাত)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কাবুলে মুজাদ্দিদী বংশ

রাজধানী এবং তার আশেপাশে প্রাচীন উলামা ও মাশায়েখের বংশ-ধরদের কিছু লোক এখনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তারা পঠন-পাঠন, সংস্কার সংশোধন এবং 'দাওয়াত ইলাল্লাহ্' (ইসলাম প্রচার)-এর কাজে ব্যস্ত। কাবুলের সন্নিকটে অবস্থিত 'কিল্লাহ্ জাওয়াদ' নামে খ্যাত মুজাদ্দিদী বুযুর্গদের (মহান ব্যক্তিদের) একটি খানকাহ্ আছে। এর কোন কোন শায়খের খ্যাতি আফগানিস্তানের বাইরেও বিস্তার লাভ করেছে। এই পরিবারেই নূরুল-মাশায়েখ শায়খ ফযলে উমর মুজাদ্দিদী নামক একজন বুযুর্গ ছিলেন, যিনি শের আগা নামেই ছিলেন সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর মুরীদ ও শিষ্যের সংখ্যা

ছিল হাজার হাজার এবং তাদের অনেকেই ছিলেন পাক ভারতীয়।১০ তাঁর ভাই শায়খ মুহাম্মদ সাদিক মুজাদ্দিদীকে, (মধ্যপ্রাচ্যে আফগানিস্তানের সাবেক রাষ্ট্রদূত এবং রাবেতা-ই-আলমে ইসলামীর নির্বাহী কমিটির সদস্য) তাঁর যোগ্যতা, তাক্ওয়া এবং ইসলামী সমস্যাদির সমাধানে নিবেদিত প্রাণ হওয়ার কারণে আরব দেশসমূহ তাকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখে। ঐ গণ-বিপ্লবে তিনি এবং তাঁর ভাই নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছিলেন, যার ফলশ্রুতিতে আমীর আমানুল্লাহ্ খান সিংহাসন হারান এবং নাদির শাহ্ ক্ষমতা লাভ করেন। আমরা 'কিল্লাহ্ জাওয়াদে' ও গিয়েছিলাম। এখনো খানকাহ্টি শিক্ষার্থী ও ভক্তে অনুরক্তে পরিপূর্ণ, মসজিদ মুসল্লীতে ভর্তি এবং মাদ্রাসায় বিরাট সংখ্যক শিক্ষার্থী জ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত। হযরত নূরুল মাশায়েখের খলীফা ও পুত্র শায়খ মুহাম্মদ ইবরাহীম মুজাদ্দিদী বেশ কয়েকবারই আমাদের হোটেলে আসেন এবং আমাদের সাথে আলাপ আলোচনা করেন। এই খান্দানের শায়খ আবদুস সালাম মুজাদ্দিদী প্রমুখ বুযুর্গদের সাথেও আমাদের দেখা হয়। ভ্রাতৃপ্রতিম সিব্গাতুল্লাহ মুজাদ্দিদীকে তো আমি কখনো ভুলতে পারব না। তাঁর কচি বয়সেই, ১৯৫১ সালে কায়রোতে তাঁর সাথে আমার আলাপ-পরিচয় হয়। তিনি 'মসজিদে আকসায়' অবস্থিত তার দাদা শায়খ মুহাম্মদ সাদিক মুজাদ্দিদী-এর হুজ-রায় কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। কাবুলে তাঁর আমার সাক্ষাৎ হয় বেশ কয়েকবারই। দীর্ঘস্থায়ী বৈঠকও হয়। কথাবার্তাও হয় অনেক। তিনি অতীতের ঐ সমস্ত ঘটনার পুনরুল্লেখ করেন যখন মুসলমানরা ছিল অত্যন্ত সম্মানিত এবং আমাদের আমলনামাও ছিল অধিকতর পবিত্র ও আলোকিত। শেখ সিব্গাতুল্লাহ্ মুজাদ্দিদী আফগানিস্তান জমীয়তে উলামার প্রতিষ্ঠাতা এবং নির্বাহী কমিটির সদস্য। কোন কোন কারণে তাঁকে শক্ত পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এভাবে মুহ্তারাম বুযুর্গ শায়খ মুহাম্মদ সাদিক মুজাদ্দিদীর পুত্র শায়খ মুহাম্মদ হাশিমও আমাদের বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে আমরা অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করি। এঁরা উভয়ই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে জড়িত।

আরো কয়েক জন ইল্মী ও দ্বীনী ব্যক্তিত্ব

মুজাহিদে কাবীর মাওলানা সাইফুর রহমান টুংকী[১১] মুহাজিরে কাবুল-এর

পুত্র মওলভী আবদুল আযীয এবং তার ভাতিজা মওলভী আযীযুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেও আমরা খুব খুশী হই 'মসজিদের পুলখাশ্তী' এর ইমাম মওলভী গুলাম রাব্বানী–এর সাথেও আমাদের সাক্ষাৎকারের সুযোগ ঘটে। এটা হচ্ছে রাজধানীর সর্ববৃহৎ জামি মাসজিদের ইমাম অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও অনুপম চরিত্রের লোক। আমরা দারুল্ উলুম–এর শায়খুল হাদীস মওলভী মুহাম্মদ গুল–এর সাথেও দেখা করি। আরো অনেক বুযুর্গের সাথে দেখা হয়, কিন্তু তাঁদের নাম এখন আর মনে নেই। আমাদের কর্মসূচী অত্যন্ত ঠাসা থাকায় এবং অনবরত বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হওয়ায় সকলের নাম সংগে টুকে রাখি নি কিংবা স্মৃতির উপর নির্ভর করে পরবর্তী সময়ে নোট করে রাখাও সম্ভব হয়নি।

কাবুলের জামি মাসজিদে

কাবুল আমরা একটি জুমাআই পাই এবং পুল–খাশ্তীর জামি মাসজিদে নামায আদায় করি। সাউদী রাষ্ট্রদূত ও সেখানে নামায আদায় করেন। মাসজিদ মুসল্লীতে ছিল ভরপুর। সেখানকার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী আমি এবং শায়খ আহমদ জামাল জুমাআর নামাযের পূর্বে বক্তৃতা দেই। আমি আমার বক্তৃতায় নিম্নোক্ত বিখ্যাত হাদীসটির ব্যাখ্যা প্রদান করি।

بدأ الاسلام غريبا و سيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء

অর্থঃ ''ইসলামের সূচনা হয়েছে অসহায় অবস্থা থেকে এবং পুনরায় তা অসহায় অবস্থায়ই গিয়ে পৌঁছবে। অতএব অসহায়দের জন্য সুসংবাদ।"

হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদানকালে, প্রাচীনতম ইসলামী দেশসমূহও যে আজ ধর্মবিরোধী নানা বিপদ–বাধায় পতিত হয়েছে, সেদিকে আমি সূক্ষ্মভাবে ইংগিত প্রদান করি। আমার বক্তব্য ছিল, দ্বীন ও মাযহাব একদা যাদের রক্তমজ্জায় মিশে গিয়েছিল তারাও আজ ঈমান ও আকীদার অগ্নি পরীক্ষায় পতিত। প্রাণ তাদের ওষ্ঠাগত। কেননা বিজাতীয় অনুকরণ এবং ইসলাম বিমুখতা আজ তাদের উপর বেপরোয়া আক্রমণ চালিয়েছে। আমার বক্তৃতাকালে হঠাৎ একব্যক্তি মসজিদের একটি কোণা থেকে আবেগপূর্ণ শ্লোগান (নারা) তুলেন। তারপর অত্যধিক আবেগ–উচ্ছ্বাসে তিনি অনুভূতিই হারিয়ে ফেলেন। সত্যিকার মুসলমানরা মুসলিম বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির উপর কী পরিমাণ উদ্বিগ্ন –এ থেকে তা কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে।

উস্তাদ আহমদ, মুহাম্মদ জামাল الدنيا سوق এবং اتدرون من المفلس
قامت ثم انقضت - এর ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

প্রাচীন নিদর্শনাদি এবং উদ্যানসমূহ

প্রাচীন নিদর্শনাদির মধ্যে আমরা ভারতের মুঘল সাম্রাজ্যের বিদ্যোৎসাহী প্রতিষ্ঠাতা জহীরুদ্দীন বাবরের সমাধি দেখতে পাই। সমাধিটি কাবুলের সন্নিকটে, একটি সুদৃশ্য মনসবুজ উদ্যানে অবস্থিত। বাবরের কাছে কাবুল ছিল খুবই প্রিয়। তাই বুঝি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর শেষ বিশ্রামস্থল হিসাবে কাবুলকেই নির্ধারণ করেছেন। আমরা পাগমানের বিখ্যাত উদ্যানটিও দেখতে পাই। প্রকৃত অর্থে এটা বিশ্বের বিখ্যাত এবং বিরাট উদ্যানসমূহের মধ্যে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। মাওলানা সাইয়িদ সুলায়মান নদভীর ধারণা এই যে, পাগমান উদ্যানের অনুকরণে কাশ্মীর এবং লাহোরে 'শালিমার বাগ' তৈরী করা হয়েছে। আমরা 'কারীয মীর' বাগও দেখেছি। এটা একটা সুদীর্ঘ ও ঘন গাছপালা পূর্ণ উদ্যান। পানির প্রাচুর্য রয়েছে, তাই গাছপালার এই সমারোহ। মাঝে মাঝে পাকা রাস্তাও রয়েছে।

সুলতান মাহমূদ গযনভীর রাজধানীতে

আমাদের এই সফর কাবুল এবং তার আশেপাশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন ব্যক্তি এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কেননা সময় ছিল কম এবং প্রোগাম ছিল অনেক ভারী। এতদ্‌সত্ত্বেও আমি শিক্ষা মন্ত্রী এবং তার সেক্রেটারীর কাছে নিবেদন করলাম, যেন আমাদেরকে পাক-ভারতের মাটিতে ইসলামের পতাকা উত্তোলনকারী, ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপনকারী, ইসলামের 'আলেকজান্ডার, গাযী সুলতান মাহমূদ গযনভীর রাজধানী গযনী দেখার অনুমতি প্রদান করা হয়। কেননা সেখানে হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শেষে ও পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমে সভ্যতা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কাব্য সাহিত্যের এমন এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল যা মাহাত্ম্যে ও শান-শওকতে স্পেনের কর্ডোভা ও গ্রানাডাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং এখন সেখানে বিরাট বিরাট প্রাসাদ, হাটবাজার, প্রচুর জনবসতি এবং আধুনিক সভ্যতা-সংস্কৃতির চাইতেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত জিনিষ রয়েছে তা হলো, অতীতের গৌরবময় ইতিহাস, উপকথা, পৌরাণিক নিদর্শনাদি এবং

ধ্বংসাবশেষ। অতএব আমি যদি মাহমূদ গযনভী এবং হাকীম সানায়ীর শহর গযনী না দেখে নিজের দেশে ফিরে যাই তাহলে আমার কাবুল সফরই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এবং একটি অতি পুরাতন মনোবাঞ্ছা অন্তরে গুমরে মরবে। শিক্ষামন্ত্রী অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে আমার আবেদন মঞ্জুর করেন এবং সহকারী মন্ত্রী প্রতিনিধি দলকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের ব্যাপারে গযনীর প্রশাসক এবং শিক্ষা পরিদফতরকে নির্দেশ প্রদান করেন। বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান করা হয়, যেন পৌরাণিক ইতিহাস ও নিদর্শনাদি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে প্রতিনিধিদলের সাথে দেওয়া হয়, যাতে তারা প্রতিনিধিদলকে ঐতিহাসিক স্থানসমূহ এবং প্রাচীন নিদর্শনাদি সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত করতে পারেন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে গযনীর অবদান

৬ই জুন শনিবার সকালে আমরা গযনীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। গযনী কাবুল থেকে ১২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সেখানকার প্রশাসক ও শিক্ষা পরিদফতরের কর্মকর্তারা আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। একজন অভিজ্ঞ পথ প্রদর্শক ও পৌরাণিক নিদর্শন ও খনন কার্যের সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েক ব্যক্তিকে আমাদের সাথে দেওয়া হয়। আমরা সাথে সাথেই পুরাতন শহরের দিকে রওয়ানা হই। পুরাতন শহর বর্তমানে শহর থেকে পূর্বদিকে কয়েক কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। এখন সেখানে শুধু ধ্বংসাবশেষ ও ভগ্ন প্রাচীরসমূহই বিদ্যমান। কোন এক যুগে এখানেই গযনী সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল এবং তা জনবসতির ঘনত্বে, শহরের বিরাটত্বে এবং সভ্যতা সংস্কৃতিতে ইসলামী বিশ্বের সর্বপ্রধান কেন্দ্র এবং আব্বাসীয়া সাম্রাজ্যের রাজধানী দারুস সালাম বাগদাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছিলো। সেদিন এই শহরের দিকে ছুটে আসছিলো গোটা বিশ্বের বাছা বাছা জ্ঞানীগুণী, কবি সাহিত্যিক, স্থপতি, শিল্পী, কথক, কবি, বক্তা, আলিম, পুণ্যবান, অলী, ধীমান, চিকিৎসক, তার্কিক, এবং দুঃসাহসী বীরযোদ্ধা, যেমন অবাধে ছুটে আসে ছোটবড় লৌহখন্ড, চুম্বকের দিকে। তখন এখানকার বাজার ছিল বিভিন্ন শিল্প সামগ্রীতে ভর্তি। বিজিত দেশসমূহ থেকে মালে গনীমত, সেখানকার মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বস্তুরাজি, উৎকৃষ্টতম মাল-সামগ্রী এই শহরের দিকে এমনভাবে ধাওয়া করেছিল যেমনভাবে ধাওয়া করে নদী নালার পানি সমুদ্রের দিকে।

সুলতান মাহমূদের উৎসাহ অনুপ্রেরণায় সেদিন গযনীতে যে সব জ্ঞানী-গুণী এসে জড়ো হয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন সুসাহিত্যিক ও সুকবি বাদীউয্‌যামান হামদানী, গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রের ইমাম আবূ রায়হান আল বিরূনী এবং চিরস্মরণীয় কবি ফেরদাওসী। এছাড়া সেখানে ছিলেন আস্‌জ াদী উনসুরী, আসাদী, গাযারী, ফাররুখী, মানুচেহ্‌রী প্রমুখ স্বনামখ্যাত ফারসী কবিগণ। সুলতান মাহমূদ যে সমস্ত কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন তাদের সংখ্যা চারশ' পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

গযনীর পতন

গযনী পুরো এক শতাব্দী পর্যন্ত ছিল জাঁকজমক ও সভ্যতা-সংস্কৃতির শীর্ষে, ছিল শৌর্যবীর্যে ও শক্তিপরাক্রমের মূল কেন্দ্রভূমি। শেষ পর্যন্ত তা বিদ্যোৎসাহী ঘোরী বংশের (যে বংশে পরবর্তীকালে শাহাবুদ্দীন ঘোরীর মত বীর মুজাহিদের আবির্ভাব হয়) ক্রমাগত হামলার শিকারে পরিণত হয়। এই বংশেরই আলাউদ্দীন হুসায়ন বিন হাসান তার সমকালীন গযনীর বাদশাহ্‌ বাহরান শাহ্‌-এর উপর অত্যন্ত রাগান্বিত হল এ কারণে যে, বাহরাম তার ভাই সায়ফুদ্দীনকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং তিনি গযনীর উপর চড়াও হয়ে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করেন। শুধু এখানেই শেষ নয়, তিন দিন পর্যন্ত গযনীতে অবাধে লুটপাট চলতে থাকে, ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়, যা সমগ্র শহরে ছড়িয়ে পড়ে এবং আর্দ্রশুষ্ক সব কিছুকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। ফলে উদ্যানসম অনুপম শহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় এবং আলাউদ্দীন দিগ্বিজয়ী উপাধিতে ভূষিত হল। এটা হচ্ছে ৫৪৭ হিজরীর ঘটনা। আল্লাহ ঠিকই বলেছেন-

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ

অর্থঃ "জমি তো আল্লাহ্‌রই; তিনি তার দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা-এর উত্তরাধিকারী করেন।"-(৭ঃ১২৮)

ঐ সমস্ত ধ্বংসাবশেষ অতিক্রম করার সময় আমরা আবুল আলা মাআররীর কবিতার নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আবৃত্তি করছিলাম।

خفف الوطأ ما أظن اديم الأ + رض الا من هذه الاجساد

و قبيح بنا و ان قدم العهد + هوان الاباء و الاجداد

مر ان استطعت فی الهواء و يدا + الاختيالا على رفات العباد ـ

অর্থঃ "পথিক, একটু ধীরে চল; আমার কল্পনায়, এই ভূখন্ড মাটির নীচে লুক্কায়িত ঐ সমস্ত দেহ ছাড়া কিছু নয়। সে অনেক দিন আগেই বাপ দাদারা মাটির নীচে গেছেন, এমতাবস্থায় তাদেরকে অপমান ও তিরস্কার করা কোন ভাল কথা নয়। যদি পার তাহলে এসমস্ত স্থান দিয়ে ধীর পদে চল, আল্লাহ্র বান্দাদের বিদীর্ণ কংকালের উপর দিয়ে অন্ততঃ জোরে পা ফেলে চলো না।"

খনন কাজ চালানোর পর সেখানে এমন এমন সব দালানের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে যেগুলো সুলতান মাসউদ বিন মাহ্মূদ এবং তার নিকট পরবর্তী লোকদের আমলের বলে মনে হয়। খনন কাজ এখনো অব্যাহত রয়েছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, আনুমানিক দশ বছরের মধ্যে এই মাটিচাপা শহরের নিদর্শনাদি চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

পন্ডিত, শাসক, সাধক ও বাদশাহের সমাধি ভূমিতে

হাকীম সানায়ীর সমাধিতে আমি সামান্য কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ফাতিহা পাঠ করে তার জন্য দু'আ করি।১২ মনে পড়লো আল্লামা ইকবাল ১৯৩৩ সনের নভেম্বর মাসে এই সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করেছিলেন এবং তা থেকে প্রভাবিত হয়েই উচ্চ ভাব-সমৃদ্ধ একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছিলেন।১৩ কবিতার প্রথম পংক্তি হচ্ছে-

سما سکتا نہیں پہنائے فطرت میں مرا سودا

غلا تھا اے جنون شاید ترا اندازہ صحرا

আর শেষ পংক্তি হচ্ছে-

سنائی کے ادب سے میں نے غواصی مہ کی ورنہ

ابھی اس بحر میں باقی ہیں لاکھوں لولوئے لا لا

আমরা বিভিন্ন আউলিয়া ও সাধক, যেমন সাইয়িদ বাহ্লূল দানা, সাইয়িদ আলী লালা, খাজা বালগার, শামসুল আরিফীন প্রমুখের মাযারসমূহও ঘুরে ঘুরে দেখি।

এরপর আমি মুজাহিদে ইসলাম, ভারত বিজয়ী সুলতান মাহ্মূদ গযনভীর সমাধির কাছে গিয়ে উপস্থিত হই যার জন্য বিরাট বিরাট সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব

দান, অন্য দেশের দূর–অভ্যন্তরে নির্বিঘ্নে ঢুকে পড়া এবং আক্রমণের পর আক্রমণ ও যুদ্ধের পর যুদ্ধ পরিচালনা এত সহজ ও সাধারণ ব্যাপার ছিল যেমন আজকালকার যুবকদের জন্য পিক্‌নিক কিংবা সকাল সন্ধ্যায় খালি মাঠে পায়চারি। তিনিই পাক-ভারতে মুসলমানদের অসীম শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করেন এবং এমন মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন যে, বিভিন্ন বংশের মুসলমানদের মাধ্যমে তা প্রায় আটশ' বছর পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। আমি তাঁর সমাধি পাশে নিশ্চল মূর্তিসদৃশ দাঁড়িয়ে ছিলাম। এখানেই সেই সিংহ শায়িত যার ভয়ে আফগানিস্তান ও হিন্দুস্তানের রাজা–বাদশাহ্ ও সেনানায়কদের নিদ্রা টুটে যেত। আজ স্বয়ং সেই চির নিদ্রায় মগ্ন। সুলতান মাহমূদের সভাকবি ফাররুখী তাঁর মৃত্যুকালে যে হৃদয় বিদারক মার্সিয়া (জারী) রচনা করেছিলেন তার কয়েক পংক্তি ছিল নিম্নরূপ–

خیز شاها ! رسولان شان آمده اند
هدیها دارند آورده مرا و ان و نثار
که تواند ـ که برانگیز دازین خواب ترا
خفتی خفتی ، کز خواب نگردی بیدار
خفتن بسیار اے خواجه خوے تو بنود
ہیچ کس ندیداست ترازین کردار

জেগে উঠো হে রাজন দূতগণ রাজন্যবর্গের
উপস্থিত তব দ্বারে ডালি বয়ে উপঢৌকনের।
ভাঙায় তোমার ঘুম মহিতলে এই সাধ্যকার
বিভোর এমন ঘুমে যা কখনো ভাঙিবেনা আর।
দীর্ঘক্ষণ শুয়ে থাকা ছিলনা তো অভ্যাস তোমার
প্রভু হে এখন এরূপ ঘুম কেউ তব দেখেনি তো আর।[১৪]

উপদেশ গ্রহণের স্থান

আমি এই সফর থেকে চিন্তিত মন, ভগ্ন হৃদয় ও বিপর্যস্ত অন্তর নিয়ে ফিরে এসেছি। আল্লাহ্‌র অসীম মাহাত্ম্য এবং তার চির বিদ্যমানতার উপর

আমার বিশ্বাস আরো সুদৃঢ় হয়েছে আর মানুষের দুর্বলতা ও অপরিণামদর্শিতা সম্পর্কে ধারণা হয়েছে আরো পাকাপোক্ত। বড় বড় সাম্রাজ্যের উপর থেকে আমার বিশ্বাস উঠে গেছে। যারা আজ জনসংখ্যার আধিক্য, দালান–কোঠার দৃঢ়তা এবং রাজনৈতিক ভিত্তির উপর গর্ব করেন, যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতা তাদের অনুসারীদের উপর দৃঢ় আস্থা রেখে নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যারপরনাই আশাবাদী তাদের বিশ্বাস ও মন–মানসিকতার উপর আমার করুণা হয়। এমনিভাবে বিরাট জাঁকজমক, শান–শওকত, লোকলস্কর, বিদ্যাবুদ্ধি, প্রভাব-প্রতিপত্তি, সুদৃঢ় কেল্লা, সুরক্ষিত চূড়া, সুউচ্চ ইমারত ও বিরাট বিরাট কারখানার অধিকারী শক্তিশালী ও সুবৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের উপর থেকে আমার বিশ্বাস উঠে গেছে। আমি গভীরভাবে ভেবে দেখেছি বাগদাদ, গযনী, কর্ডোভা, গ্রানাডা, সমরখন্দ বুখারা যখন ধ্বংস হয়ে গেছে তখন বর্তমান রাজ –ধানীসমূহ, শহরসমূহ, সভ্যতা সংস্কৃতির কেন্দ্রসমূহ এবং রাষ্ট্রসমূহের স্থায়িত্ব সম্পর্কে কী নিশ্চয়তাই বা থাকতে পারে? ঐ ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশসমূহের রাজা–বাদশাহদের বিক্রম ও প্রভাব প্রতিপত্তির পরিণাম দেখে এমন মনে হয়, যেন সেগুলো বাচ্চাদের খেলাধূলা অথবা ষ্টেজের অভিনয় ছাড়া কিছু ছিল না।

سروری زیبا فقط ذات بے ہتا کو ہے
حکمران ہے بس وہی باقی بتان آذری

প্রভুত্ব তারই, কেউ জুড়িয়ার নেই এ বিশ্বের
সম্রাট তিনিই শুধু আর সব মূর্তি আযরের।

আল্লাহ্ তা'আলা কী সুন্দরই না বলেছেন,

وَ تِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ـ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ـ

অর্থঃ "মানুষের মধ্যে আমি পর্যায়ক্রমে এই দিনগুলোর আবর্তন ঘটাই, যাতে আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য হতে কিছু লোককে সাক্ষী করে রাখতে পারেন এবং আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসে না।"–(৩ ঃ ১৪০)

মূল্যবান জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি নিয়ে আমরা ফিরে এলাম। অতিথি ভবনে দুপুরের খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে জুহরের নামায আদায় করলাম। জিজ্ঞাসাবাদের পর জানতে পারলাম, বর্তমান শহরের জনসংখ্যা মাত্র দশ থেকে পনের হাজার। কোথায় বিশ্ব বিখ্যাত বিরাট নগরী, আর কোথায় দশ পনর হাজার জনসংখ্যা অধ্যুষিত একটি ছোট পল্লী। এর চাইতে বিস্ময়ের ব্যাপার আর কী হতে পারে ? আল্লাহর নাম সবার উপরে, রাতদিনের আবর্তন-বিবর্তন তারই হাতে, কালচক্রের গতিপ্রকৃতি তারই অধীন।

মালিক মুহাম্মদ জাহির শাহ ও সরদার দাঊদ খান

দৃঢ় আশা ছিল যে, প্রতিনিধিদলকে শাহের সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ দেওয়া হবে। রাবেতা-ই-আলমে ইসলামী-এর প্রতিনিধি দল যে সমস্ত দেশ সফর করেছে সেখানকার বাদশাহ অথবা রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে তারা সাক্ষাৎ করেছেন। কিন্তু ভাবেসাবে মনে হলো, সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা এটা পসন্দ করেনি। আমরা শুনেছি, শাহকে একেবারে অন্তিম সময়ে যখন প্রতিনিধিদল সম্পর্কে অবহিত করা হয় তখন তিনি বলেন, 'কেন আমাকে প্রথম থেকে অবহিত করা হলো না-যখন হাতে সময় ছিল ? শাহ্ তাঁর জাতি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে আপন মহলেই সময় অতিবাহিত করেন, বাইরে আসেন খুব কম। অন্যান্য দেশের কোন কোন মুসলমান বাদশাহ্র মত তাঁর দৈনন্দিন জীবন খেলামেলা বা সাধারণ্য নয়। সাউদী রাষ্ট্রদূত শায়খ মুহাম্মদ হাম্‌দ শাবীলী বলেছেন যে, তিনি শাহ্কে শুধুমাত্র একবারই দেখেছেন তাও তখন, যখন তিনি তাঁর কাছে আপন পরিচয়পত্র পেশ করতে গিয়েছিলেন।

আমি আমার বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্যিক জাঁকজমকের প্রতি দেশের উন্মাদবেগে ছুটে চলার, আফগানী মহিলাদের বেপর্দা হওয়ার এবং সম্পূর্ণরূপে কম্যুনিষ্ট ব্লকের সাথে দেশের অন্তর্ভুক্তির পিছনে কার প্রভাব বা মন-মানসিকতা কাজ করছে ? তাদের উত্তর ছিল, 'এ জন্য শাহের চাচাত ভাই এবং ভগ্নিপতি সরদার মুহাম্মদ খানই দায়ী। আমরা যখন পাগমান যাই তখন লোকেরা তার প্রাসাদের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিল, 'এখানে পূর্বে একটি মাদ্রাসা ছিল। দাঊদ খান মাদ্রাসাটিকে অন্যত্র

স্থানান্তরিত করে এই স্থানটিকেই নিজের প্রাসাদের জন্য নির্বাচিত করেছেন। আমি উপলব্ধি করেছি যে, ধর্মপ্রাণ ও ধর্মপ্রিয় লোকেরা দাউদ খানের এই সব কর্মকাণ্ড আন্তরিকভাবে পসন্দ করে না। আমি এও জানতে পেরেছি যে, এই ব্যক্তিই পাখতুনিস্তান আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক এবং মূল হোতা বটে।[১৫]

মুসলিম দেশের দায়িত্ব

কম্যুনিজম বা ধর্মহীনতার কোলে আশ্রয় গ্রহণ, পাশ্চত্য সভ্যতা ও তার বাহ্যিত জাঁকজমকের দিকে দ্রুত ছুটে চলা এবং পাশ্চাত্য জাতি- সমূহের আচার-আচরণ গ্রহণ করার মূলে শুধু আফগানিস্তান দায়ী না বরং এই দায়-দায়িত্ব গোটা ইসলামী বিশ্বের উপর বর্তায়। এটা সকলেরই জানা যে, আফগানিস্তানের আমদানীর মাধ্যমে একেবারেই সীমিত। এখানে পণ্য-সামগ্রীর কোন প্রাচুর্য নেই। খনিজ সম্পদ কিংবা তরল সোনারও অস্তিত্ব নেই। নিজের অধিকারে কোন সমুদ্র বন্দর নেই বলে আমদানী রফতানীর স্বাধীনতা থেকেও দেশটি বঞ্চিত। দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি শুষ্ক ফল, ভেড়ার পশম ও চামড়া রফতানীর উপরই নির্ভরশীল। কাজে কাজেই সে তার অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান, উন্নয়নমূলক শিক্ষামূলক ও প্রতিরক্ষামূলক পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য এমন সব উন্নত ও প্রাচুর্যময় দেশের সাহায্যের প্রত্যাশী যাদের কাছে মালসম্পদ ও আমদানীযোগ্য শিল্প সামগ্রীর প্রাচুর্য রয়েছে। যদি আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদশালী মুসলিম দেশগুলোকে এই তাওফীক দিতেন যে, তারা আফগানিস্তানের দিকে সাহায্যের হাত বাড়াত, তার উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে সহায়তা করত তাহলে সাহায্যের জন্য ঐ সমস্ত ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলোর দিকে হাত বাড়াবার কোন প্রয়োজনই তার দেখা দিত না, সে ইসলাম বিমুখ হওয়ার পরিবর্তে বরং ইসলামী আদর্শ সংরক্ষণের কাজেই আত্মনিয়োগ করত, এর বাস্তবায়ন এবং প্রচার ও প্রসারের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করত, গোটা ইসলামী বিশ্বকে সাহায্য করত, তাদের শক্তি পরাক্রম, সম্মান ও সমৃদ্ধির উৎসে পরিণত হত- সর্বোপরি ইসলামী আত্মসম্মানবোধ ও ধর্মীয় প্রেরণা সমৃদ্ধ একটি সুপ্রাচীন মুসলিম জাতি, বিজাতীয় চিন্তা ও বিজাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির নির্দয় হামলা থেকে পরিত্রাণ পেত।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, সম্পদশালী মুসলিম দেশগুলো উন্নয়নশীল মুসলিম দেশগুলোর প্রতি এখনো সাহায্য সহায়তার হাত আশানুরূপ বাড়ায়নি। আর এই অবস্থারই সুযোগ নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন সাহায্য সামগ্রী নিয়ে আফগানিস্তানে এসে হাযির হয়।[১৬] তারা বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য বিরাট সাহায্যের প্রস্তাব দেয়। আর এটা স্বাভাবিক যে, চিন্তাগত, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক তথা সর্বক্ষেত্রে এরূপ সাহায্য সহায়তার অনুকূল প্রভাব না পড়ে পারে না। এ ক্ষেত্রেও হলো তাই। আফগানিস্তান দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেমন রাশিয়ার সাহায্য কোন না কোনভাবে ব্যবহার করেছে তেমনি প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের উপর পড়েছে ইসলাম বিরোধী কম্যুনিষ্টনীতির প্রভাব।

আফগানিস্তান শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ইসলামী বিশ্বের বাইরে পড়ে থাকে। বিদিত রাজনৈতিক কারণে প্রতিবেশী মুসলিম দেশ পাকিস্তানের সাথে তার সম্পর্ক থাকে তিক্ত। মাঝপথে পাকিস্তান থাকায় বিরাট সভ্যতার কেন্দ্র ভারত থেকেও তারা বিচ্ছিন্ন থাকে। বাধ্য হয়ে তারা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তাদের প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়েই থাকে তুষ্ট। ফলে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্মীয় তৎপরতা ও অন্যান্য আন্দোলনের সাথে তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে উঠেনি। যদি মিসর এবং মিসরের 'জামে আযহার না থাকত (যেখানে আজো আফগানী ছাত্ররা যায় এবং যথেষ্ট উপকৃত হয়। মিসরে অবস্থানকালেই তারা ইসলামী সাহিত্য এবং ইসলামী ধ্যান-ধারণার আধুনিক গতি প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হয়) তা হলে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং বিভিন্নমুখী ইসলামী আন্দোলন থেকে আফগানিস্তান একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত এবং আফগানরা লৌহ প্রাচীরের আড়ালে অত্যন্ত অপ্রশস্ত ও সীমিতগণ্ডীতে তাদের জীবন অতিবাহিত করত। এখনো সেখানে দৃঢ় চিন্তা ও দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী লোকের সংখ্যা অল্প হলেও যে শিক্ষিত যুবকরা রয়েছে তারা আল-আযহার থেকেই শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং মিসরে বেশ কিছুকাল কাটিয়ে এসেছে।

প্রতিনিধিদলের সম্মানে সউদী দূতাবাস আয়োজিত ভোজসভা

আফগানিস্তানে নিযুক্ত সাউদী আরবের রাষ্ট্রদূত শায়খ মুহাম্মদ আহমদ আশ-শাবীলী হোটেল কাবুলে, যেখানে আমরা অবস্থান করছিলাম,

প্রতিনিধিদলের সম্মানে ৯ই জুন রোববার রাতে এক জাঁকজমকপূর্ণ নৈশভোজের আয়োজন করেন। উদ্দেশ্য ছিল যাতে শহরের সম্মানিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে আমাদের আলাপ-পরিচয় হয়। সেখানে সমগ্র আরব রাষ্ট্রের প্রায় সকল রাষ্ট্রদূত, আফগানী-ক্যাবিনেটের কিছু সংখ্যক মন্ত্রী। কাবুলের গভর্নর, শাহী পরিবারের কিছু সংখ্যক সদস্য, কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ, অন্যান্য উলামা ও মাশায়েখ, দূতাবাসসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু সংখ্যক আরব দেশীয় খ্রীস্টান জ্ঞানীগুণী এবং উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ আমন্ত্রিত হন। মাননীয় রাষ্ট্রদূত অনুরোধ করেন, যেন আমি মেহমানদের অভ্যর্থনা জানাই, তাদের সামনে বক্তৃতা দিই এবং সুযোগ-সুবিধা মত প্রতিনিধিদলের পর্যবেক্ষণ এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা দান করি। আমি এজন্য তাঁকে গতানুগতিক ধন্যবাদ জানিয়েই ক্ষান্ত হই নি, বরং এই মূল্যবান সময় ও সুযোগকে যথাসাধ্য কাজে লাগাবার চেষ্টা করি। আমি সম্মানিত মেহমানদেরকে শুধু অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করি নি, এই সুযোগে তাদের সাথে মুসলিম জাতি ও মুসলিম বিশ্বের জন্য উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথাবার্তা বলি এবং আনুষ্ঠানিকভাবে একটি ভাষণও পেশ করি। শুধু স্মরণ শক্তির উপর ভরসা করে পরবর্তী সময়ে আমি ঐ ভাষণটি লিপিবদ্ধ করে নিয়েছি, যা খানিক পরেই পেশ করা হচ্ছে।

আমার পর উস্তাদ মুহাম্মদ জামাল দণ্ডায়মান হন এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি আফগানী জাতি ও আফগান সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদলের প্রতি যে সম্মান, সমাদর, আতিথেয়তা ও আন্তরিকতা দেখানো হয়েছে সেজন্য শুকরিয়া আদায় করেন, আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে যাঁরা এখানে হাযির হয়েছেন তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানান, রাবেতা-ই আলমে ইসলামী-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন, মুসলিম ঐক্যের জন্য শাহ ফায়সাল যে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তার উল্লেখ করেন এবং ইসলাম প্রচার ও 'শাহাদতে হক্ (সত্যের সাক্ষ্য)-এর ক্ষেত্রে উলামায়ে কিরামের দায়িত্ব ও কর্তব্যের পুনরুল্লেখ করেন।

তারপর নৈশ্যভোজ শেষে মেহমানরা হাসিখুশী মনে নিজেদের ঘরে ফিরে যান। কাবুলে এটাই ছিল আমাদের শেষ সাক্ষাৎকার। পরদিন অর্থাৎ ১১ই জুন ১৯৭৩ সন সকালে ইরানের উদ্দেশ্য আমাদের রওয়ানা হওয়ার কথা।

উপরে উল্লেখিত দু'টি বক্তৃতার বিবরণী নিম্নে পেশ করা হচ্ছে।

আফগানী জাতির বিপ্লব ও তাদের শক্তির উৎস

[এই বক্তৃতা প্রদান করা হয় কাবুল 'বিশ্ববিদ্যালয় হলে' অনুষ্ঠিত একটি সভায়। তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট সংখ্যক ছাত্র ও শিক্ষক এবং সাউদী আরবের মহামান্য রাষ্ট্রদূত উপস্থিত ছিলেন। হলটি ছিল শ্রোতায় পরিপূর্ণ]

সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র; দরূদ ও সালাম তার নবীর উপর ঃ

সাউদী আরবের মাননীয় রাষ্ট্রদূত, মাননীয় চ্যান্সেলর, বিভিন্ন বিভাগের প্রধানগণ, অধ্যাপকবৃন্দ এবং আমার প্রিয় ছাত্র বন্ধুগণ,

এই উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময় চেহারাসমূহ এবং সম্মানিত ও সর্বজনমান্য মহান ব্যক্তিদের সামনে দাঁড়াবার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে আমার অন্তর খুশীতে ভরে উঠেছে। এই প্রিয় দেশটি নিকট থেকে দেখার প্রবল বাসনা দীর্ঘদিন থেকে অন্তরে পোষণ করে আসছিলাম। এই দেশ সম্পর্কে অনেক শুনেছি, অনেক পড়েছি এবং আমি বলতে পারি, সুযোগ মত কোথাও ব্যক্ত ও করেছি যে, এই দেশের গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে, রয়েছে ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য। এর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিজয় কাহিনী অধ্যয়নে আমি দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছি, এর ধীমান ও অতুলনীয় মহান ব্যক্তিবৃন্দ এবং বিশ্ব- বিখ্যাত বীর বিজেতাদের জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনা-পর্যালোচনায় কাটিয়েছি জীবনের একটি বিরাট অংশ। এঁরাই এই আকাশচুম্বী পর্বত-রাজির অপরপারের দেশ ভারতকে এবং অন্যান্য প্রতিবেশী দেশকেও জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামের আলোয় আলোকিত করেছেন। তাই এদেশে আসাকে সৌভাগ্যের চিহ্ন মনে করা বা এখানে আসার সুযোগ পেয়ে জীবনকে ধন্য মনে করা আমার জন্য কোন অস্বাভাবিক বা বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। এটা হলো একজন মুসলমানের আনন্দোচ্ছ্বাস যা এই পর্বতরাজির আঁচল ঘিরে বসবাসকারী তার প্রিয় মুসলমান ভাইদের দেখে উথলে উঠেছে, অন্তরাকাশে আকুলি-বিকুলি করছে। আমি আরো বেশী খুশী হয়েছি এজন্য যে, আপনারা আমাকে এই সমাবেশে অংশগ্রহণ এবং এখানে কিছু বলার সুযোগ দিয়েছেন। আফগানিস্তান সফরকালীন এই সাক্ষাৎকার এবং এই মজলিসে অংশগ্রহণ করার স্মৃতি আমার অন্তরে চির জাগরূক থাকবে। এজন্য আমি আপনাদের সকলকে অন্তরের অন্তরস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই।

উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী, আপনারা এবং বিশেষ করে ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ পোষণকারীরা একথা ভালভাবেই জানেন যে, আফগানী জাতি সেই সুপ্রাচীন জাতিসমূহের অন্যতম, যারা হাজার হাজার বছর ধরে স্বাধীনতা, সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার জীবন অতিবাহিত করে আসছে। আল্লাহ্ তা'আলা প্রাচীনকাল থেকেই এদেরকে অকল্পনীয় মানবিক শক্তি ও দক্ষতার অধিকারী করেছেন। বন্ধুগণ, ইতিহাসের প্রতি আমার একটি বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে এবং কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই বলতে পারি যে, ইতিহাস অধ্যয়ন এবং এর আলোচনা পর্যালোচনায় আমি আমার গোটা জীবনটাই কাটিয়ে দিয়েছি। এটাই আমার কাছ সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। আজ এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই আপনাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা, এর পিছনে এমন কী কারণ রয়েছে যে, শতাব্দীর পর শাতব্দী ধরে আফগানী জাতি বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করছে ? বিশ্বে সংঘটিত মঙ্গল-অমঙ্গল, পাপপুণ্য, জয়-পরাজয় এবং অনাচার-অবিচারের প্রতি কেন তারা নির্বিকার ? বীরত্ব,. আত্মসম্মানবোধ ও নেতৃত্বের অধিকারী প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর, সুঠামদেহী, বিদ্যোৎসাহী সুযোগ্য ও সম্মানিত এই জাতির দীর্ঘকাল থেকে বিশ্ব থেকে দূরে সরে থাকা, নিজেদের আবর্তে ঘুরপাক খাওয়া এবং এক কোণে জমে থাকার কারণ কি ? তাদের বদ্ধ ঘরে আবদ্ধ থাকার কারণ কি এই যে, আফগানিস্তান এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের মধ্যে সুউচ্চ, অনতিক্রম্য ও বন্ধুর গিরিশ্রেণী দাঁড়িয়ে রয়েছে ? না, বন্ধুগণ, না ! ইতিহাস তো এই সাক্ষ্যই দেয় যে, বরফাবৃত, দুর্লংঘ্য ও আকাশচুম্বী পর্বতরাজি কখনো বীর মুজাহিদ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিজয়ীদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে নি। আপনারা ভালভাবেই অবগত আছেন যে, এই দুর্গম বন্ধুর আঁকা বাঁকা গিরিপথ, যা যে কোন মানুষের মনে আতংক সৃষ্টি করে এবং যা আফগানিস্তানকে ভারত ও পাকিস্তান থেকে পৃথক করে রেখেছে এই দেশের কৃতি সন্তান সুলতান মাহমূদ গযনভী, শাহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ঘোরী এবং আহমদ শাহ্ আবদালীর মত বিদ্যোৎসাহী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দিগ্বিজয়ী কর্তৃক পরিচালিত অভিযানকালে ইসলামের প্রবল বন্যা স্রোতে ভেসে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এরপরও কি এই জাতি বন্দী জীবন কাটাতে পারে ? তাদের হাত পায়ের

বাঁধন অটুট থাকতে পারে ? না, তা কখনো হতে পারে না। বার বার এরা তাদের বীরত্বের প্রমাণ দেখিয়েছে, নিজেদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছে। এরপরও কেন এরা সীমিত চারণভূমি এবং সীমিত জীবনোপকরণ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে ? এই সব প্রশ্নের উত্তর আজ আপনাদেরকে দিতে হবে।

আমরা ইতিহাসে পড়েছি, যখন এই অঞ্চলে ইসলামের আগমন ঘটল তখন অকস্মাৎ এই জাতি হাজার হাজার বছরের ঘুম গা থেকে ঝেড়ে ফেলে জেগে উঠলো এবং এমনভাবে লাফিয়ে উঠল যার তুলনা বিরল। ইসলামের ছত্রচ্ছায়ায়, আশ্রয় নেওয়ার সাথে সাথে এই জাতি সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী, সবচেয়ে বেশী বাহাদুর, সবচেয়ে বেশী সাহসী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠলো। এই জাতি যখন বিশ্বের অন্যান্য জাতির কাতারে শামিল হল তখন মনে হলো, যেন এরা ছিল ভূগর্ভে রক্ষিত কোন রত্নভাণ্ডার কিংবা আগাগোড়া রহস্যাধার, যা অকস্মাৎ ঝল-মলিয়ে উঠেছে। এদের দেহে এমন বিদ্যুৎ সংযোগ ঘটেছিল অথবা যাদুকাঠির পরশ লেগেছিল যে, দেখতে দেখতে শান্ত সমাহিত, বিশ্বসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এই জাতি একটি তীক্ষ্ণ আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন, কর্মচঞ্চল, বিজয়ী বীর বিক্রম জাতিতে পরিণত হল। এখন কি তাহলে এই খরস্রোতা নদীর মোহনায় এমন কোন বিরাট পাহাড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে যার ফলে এর গতিবেগ হ্রাস পেয়েছে ?

আফগানীদের বিপ্লবী জীবনের মূল কারণ ও আসল রহস্য হলো, আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের কল্যাণ ও বরকতে এদেরকে তিনটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ গুণে গুণান্বিত করেছেন। যথা ঃ

১. শক্তিশালী পয়গাম এবং তার জোরদার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

২. মানবজাতি, বহির্বিশ্ব ও বস্তুরাজি সম্পর্কে প্রশস্ত ধ্যান-ধারণা।

৩. আল্লাহ্র সাহায্য সহায়তার উপর পরিপূর্ণ আস্থা ও চেষ্টা সাধনার ফলাফলের উপর দৃঢ় বিশ্বাস।

এ হলো সেই তিনটি উপাদান যার দ্বারা জাতির কর্মকাণ্ডে নতুন জোয়ার আসে,তারা নতুন জীবন লাভ করে, নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে এবং নিজেদের অপ্রকাশিত শক্তি ও গোপন দক্ষতা কাজে লাগিয়ে দুনিয়াকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করে দেয়।

পূর্বে এই জাতির কাছে কোন পয়গাম ছিল না, ছিল না কোন মহৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলের মধ্যেই তাদের আনাগোনা সীমাবদ্ধ ছিল। তারা নিজেদের গৃহপালিত পশু নিয়েই রাতদিন মগ্ন থাকত। প্রায়ই আপোসে মারামারি ও লড়াই যুদ্ধ করত। যেমন একজন আরব কবি বলেছেন-

و احيانا على بكر اخينا   اذا ما لم نجد الا اخانا

অর্থঃ "যখন যুদ্ধংদেহী মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার উপযোগী কোন শত্রুর সাক্ষাৎ পাওয়া না যায় তখন আমরা আমাদের ভাই-বেরাদরকেই (যুদ্ধের) বিষয়বস্তুতে পরিণত করি।

প্রকৃতপক্ষে চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক দৈন্যই হচ্ছে আপোসে মারামারি ও লড়াই ঝগড়ার মূল কারণ। বর্বর যুগে আরবরাও গৃহযুদ্ধে লিপ্ত থাকত, এক গোত্র অন্য গোত্রের উপর হামলা করত, এক বংশ অন্য বংশকে নির্বংশ করার তালে থাকত। এভাবে আফগানীদের সামনেও আশেপাশে লড়াই যুদ্ধ ও রক্তারক্তি করা ছাড়া নিজেদের আত্মসম্মানবোধ ও বংশগৌরব বহাল রাখার (?) অন্য কোন পন্থা ছিল না। একজন আরব কবি এই তাৎপর্যেরই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন।

النار تأكل نفسها   ان لم تجد ما تأكله .

অর্থঃ "আগুন যদি জ্বালাবার মত কিছু না পায় তাহলে নিজেই নিজেকে জ্বালাতে থাকে।

কিন্তু যখন ইসলামের আবির্ভাব হল তখন আরবদের চোখের সামনে ভেসে উঠলো একটি উন্নত লক্ষ্য, মানবতার এক শক্তিশালী পয়গাম। অনুরূপ অবস্থা ছিল আফগানীদেরও। ইসলাম পৌছার আগে তাদের জীবন ছিল শুধু তাদের নিজেদের জন্যই, কিন্তু যখন তাদের কাছে ইসলামরূপী আল্লাহ্র পয়গাম পৌছল তখন তাদের কান দিয়ে যেন মরমে প্রবেশ করলো।-

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ .

অর্থ ঃ "তোমরাই শ্রেষ্ঠ দল, মানব জাতির জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান কর, অসৎকার্য নিষেধ কর এবং আল্লাহ্তে বিশ্বাস কর।(৩ঃ ১১০)

তাদের মন-মস্তিস্কে একথা গেঁথে গেল যে, তারা উদ্যানে বা শস্যক্ষেত্রে আপনা আপনি অংকুরিত কোন আজেবাজে লতাগুল্ম নয়, বরং তাদের জীবনেও রয়েছে একটা মহৎ উদ্দেশ্য। তাদেরও রয়েছে বিরাট দায়-দায়িত্ব। তাদের চেষ্টা প্রচেষ্টা ও কর্মতৎপরতায় রয়েছে সুমহান লক্ষ্য। তাদের অন্তরে একথা বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, তারা এমন একটি জাতি, যাদেরকে মানুষের মঙ্গলের জন্য বিশেষভাবে তৈরী করা হয়েছে। তারা শুধু লুটপাট ও খুনাখুনি মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য আপনা আপনি সৃষ্টি হয় নি, বরং তাদের সৃষ্টির মূলে রয়েছে এক অনুপম লক্ষ্য। এইসব চিন্তাধারা তাদের অন্তরকে গভীরভাবে নাড়া দিল। তারা উপলব্ধি করল যে, দুনিয়াকে ফিত্না-ফাসাদ থেকে পবিত্র করার জন্য ততক্ষণ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে, ত্যাগ স্বীকার করতে হবে-যতক্ষণ না ইবাদত উপাসনা স্রেফ আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়, মানব জাতি অন্ধকার থেকে আলোয় বেরিয়ে আসে। আল্লাহ্র বান্দারা মুক্তিলাভ করতঃ আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়, দুনিয়া ও আখিরাতে প্রকৃত শান্তির সন্ধান পায় এবং অন্যান্য ধর্মের বাড়াবাড়ি থেকে পরিত্রাণ পেয়ে ইসলামী সাম্য ও সুবিচারের ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। বন্ধুগণ, এই জাতির কাছে কোন পায়গাম ছিল না। ইসলাম আসার সাথে সাথে এদের সামনে এসে হাযির হলো এক মহান পয়গাম, এক মহান জীবন ব্যবস্থা। তারা ইসলামের এই চিরন্তন পয়গামকে বুকে জড়িয়ে ধরলো, আর এই পয়গাম ফুঁকে দিল তাদের মধ্যে এক নতুন প্রাণচাঞ্চল্য। তারা চরম বর্বরতা ও মূর্খতার অন্ধকারে কাল কাটাচ্ছিলো, অকর্মণ্যতা ও অসারতার মধ্যে কুটে মরছিলো, এক মানুষ জন্য অন্য মানুষের উপর চাপিয়ে দিছিলো জুলুম নির্যাতনের পাহাড়, সবল দুর্বলকে গিলে ফেলার চেষ্টা করছিলো, মানবাধিকার পদদলিত হচ্ছিলো, আঘাতের পর আঘাত আসছিলো ইজ্জত-সম্মানের উপর, কামনা-বাসনা ও রিপুর তাড়নার পিছনে পাগলপারা হয়ে সবাই ছুটছিলো-এমতাবস্থায় তাদের দেহে সঞ্চারিত হলো এক নতুন প্রাণ-যার প্রভাবে সঞ্জীবিত ও ঝল্মলিয়ে উঠলো তাদের মনজগত। এবার তারা নতুন মানুষ, নতুন এক জাতি। তাদের ভূখন্ড সেই আগের ভূখণ্ডই থাকল, আবহাওয়া ও যেমনটি ছিল তেমনটিই রইলো। তাদের দৈহিক আকার-আকৃতি ও পূর্বের মতই থাকলো, অথচ তারা হয়ে গেল নতুন জাতি, এক নতুন মানবগোষ্ঠী।

দ্বিতীয় কথা হলো, আফগানী জাতি তাদের জীবন অতিবাহিত করছিল অত্যন্ত সীমিত ও বদ্ধ পরিসরে। সৃষ্টিজগত এবং মানবজগত সম্পর্কে তাদের ধ্যান-ধারণা ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। মানুষ কারা ? তাদের কাছে এর উত্তর ছিল, আফগানিরাই মানুষ-যারা এই অঞ্চলে বসবাস করে এখানকার ভাষায় কথা বলে, এই দেশের পোশাক পরে এবং এখানকারই গুণগান গায়। -এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও মনমানসিকতাই তাদেরকে বন্দী করে রেখেছিল এক সীমিত পরিবেশে ও সংকীর্ণ অংগনে।

জীবন কি ? তাদের কাছে এর উত্তর ছিল, 'পানাহার, আয়েশ-আরাম, আমোদ-ফূর্তি এবং নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব। তারা ঠিক সেভাবেই জীবন কাটাত যেভাবে মাছেরা বা ভেকেরা জীবন কাটায় পুকুরে জলাশয়ে। ইসলামপূর্ব যুগে আরব, তুর্কী, ইরানী সবারই ছিল এই একই অবস্থা। ইসলামই তাদের সবাইকে এই সংকীর্ণ অন্ধকার বন্দীখানা থেকে টেনে বের করেছে। যেমন একজন আরব দূত ইরানের শাহানশাহ্‌কে বলেছিল-

لنخرج من شاء الله من ضيق الدنيا الى سعة الدنيا و الاخرة

"যাকে আল্লাহ্ তাওফীক দেন, আমরা তাকে দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বের করে দুনিয়া-আখিরাতের প্রশস্ত আঙ্গিনায় পৌঁছিয়ে দিই।"

ভদ্রমণ্ডলী, আপনাদের পূর্বপুরুষেরা 'মানুষ সম্পর্কে অত্যন্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করতেন। তাদের মধ্যে ঔদার্য ছিল না, উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না, চিন্তার গভীরতা ছিল না। ইসলামই তাদেরকে উদার মনোবৃত্তির অধিকারী করেছে। ফলে তাদের দৃষ্টিতে সমগ্র মানুষ একটি মাত্র পরিবারে এবং সারা বিশ্ব একটি মাত্র কুটিরে পরিণত হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এই নির্দেশ তাদের আকীদা-বিশ্বাসের মূল বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

كلكم من ادم و ادم من تراب لا فضل لعربى على عجمى و لا لعجمى على عربى الا بالتقوى -

"তোমরা প্রত্যেকেই আদমের সন্তান এবং আদম মাটি থেকে তৈরী। 'তাক্‌ওয়া (আল্লাহ্ সম্পর্কে সতর্কতা) এর মাপকাঠি ভিন্ন না কোন অনারবের উপর কোন আরবের প্রকৃষ্টতা রয়েছে, আর না কোন আরবের উপর কোন অনারবের।

এরপর তাদের দৃষ্টিভঙ্গির এতই প্রশস্ত হয়ে গেল যে না তারা সমর্থন করত কোন ভৌগোলিক সীমারেখা, আর না মনগড়া ভাগবন্টন। যদি তারা এই উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী না হতেন তাহলে তারাও তাদের বাপদাদার মত শতাব্দীর পর শতাব্দী অন্ধকারের মধ্যেই ঘুরপাক খেতেন।

তৃতীয় উপাদান হলো মজবুত ও সুদৃঢ় আস্থা। যখন তারা এক আল্লাহর উপর ঈমান আনলেন, তার রাসূল এবং আখিরাতকে বিশ্বাস করলেন, ভাগ্যকে বিশ্বাস করলেন, উপলব্ধি করলেন যে, মৃত্যুর জন্য একটি সময়ই নির্ধারিত– এ থেকে তা এক মুহূর্তও এগোতে পারবে না, আবার পিছাতেও পারবে না, যখন আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ শুনলেন এবং মনেপ্রাণে তা বিশ্বাস করলেন–

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ –

অর্থ ঃ "তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমন কি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও। (৪ ঃ ৭৮)

إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُونَ ـ

অর্থ ঃ "যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্ব বা ত্বরা করতে পারবে না। (১০ ঃ ৪৯)

তখন তারা এক নব বলে বলীয়ান হয়ে উঠল। এই বিশ্বাস তাদেরকে আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল করে তুললো। তারা ভালভাবে বুঝে নিলেন যে মানুষের মৃত্যু একমাত্র তার নির্ধারিত সময়েই আসতে পারে–এক মুহূর্তে আগেও নয়, আবার এক মুহূর্ত পরেও নয়। তারা এও উপলব্ধি করলো যে, সব কিছুই আল্লাহ্‌র এখতিয়ারাধীন।

তারা কুরআনের সেই আসমানী বাণীও লাভ করলো, যাতে মানুষকে 'আল্লাহ্‌র বাহিনী এবং 'আল্লাহ্‌র দ্বীনের সাহায্যকারী আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ـ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ـ

অর্থ ঃ "অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে এবং আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী। (৩৭ ঃ ১৭২–৭৩)

أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ –

অর্থ ঃ "জেনে রেখ, আল্লাহ্‌র বাহিনী হবে সফলকাম।" (৫৮ ঃ ২২)

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ -

অর্থ ঃ 'নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করবো পার্থিব জীবনে ও যে দিন সাক্ষিগণ দণ্ডায়মান হবে। (৪০ ঃ ৫১)

وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُوْلِهٖ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ -

অর্থ ঃ "সম্মান তো আল্লাহ্, তার রাসূল ও বিশ্বাসীদেরই।-(৬৩ ঃ ৮)

وَ لَا تَهِنُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

অর্থ ঃ "তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিতও হয়ো না ; তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মু'মিন হও।-(৩ ঃ ১৩৯)

–কুরআনের এ ধরনের অন্যান্য আয়াতও যখন তারা শুনতে পান তখন তাদের ইয়াকীন ও বিশ্বাসের মধ্যে আরো দৃঢ়তা আসে।

এই সুযোগে আমি আপনাদেরকে একটি ঐতিহাসিক কাহিনী স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। মুসলিম সেনাপতি হযরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) যখন তার বাহিনী নিয়ে তরঙ্গ–মুখর দজলা নদীর তীরে পৌছলেন তখন এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালেন। দজলার তরঙ্গরাজি একটির পর অন্যটি আঁছড়ে পড়ছিল, প্রবাহিত হচ্ছিল প্রবল ঝড়বাত্যা। হযরত সাদ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে ডানে বায়ে দৃষ্টি ফিরালেন। এরপর হযরত সালমান ফারসীর দিকে মুখ করে তার পরামর্শ চাইলেন–অর্থাৎ তরঙ্গ সংকুল নদীতে ঝাপিয়ে পড়বো, না ফিরে গিয়ে এটা অতিক্রম করার জন্য পুল তৈরীর ব্যবস্থা করবো ? হযরত সালমান ফারসী সে জিজ্ঞাসার উত্তরে যে চিরস্মরণীয় বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন ইতিহাস তা সংরক্ষণ করেছে। তিনি বলেছিলেন,

"এই ধর্ম সতেজ এবং নতুন। আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস, আল্লাহ্ এই ধর্মকে জয়ী করবেনই। আর এটা পরিষ্কার কথা যে, এটা যে পর্যন্ত পৌছার কথা, সেখানে এখনো পৌছেনি এমতাবস্থায় আমি কি মনে করতে পারি যে, এই ধর্মের পয়গাম বহনকারীরা নদীতে ডুবে মারা যাবে?"

হযরত সালমান ফারসীর এই বাক্য ছিল গভীর অর্থবহ। যখন এই ধর্ম সতেজ এবং নতুন এটা নিশ্চয়ই নতুন বিশ্ব গঠন, বিশ্ববাসীর নেতৃত্বদান এবং মানবতার দিকে পথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তার যথাযোগ্য অবদান রাখবে। সুতরাং সেনাপতি হযরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন, 'নিজ নিজ ঘোড়া নিয়ে ঝাপিয়ে পড় এবং নদী পাড়ি দাও। ঐতিহাসিক তাবারীর বর্ণনা অনুযায়ী ইরানীরা যখন এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করলো তখন সমস্বরে চীৎকার দিয়ে উঠলো, 'মানুষ নয়, মানুষ নয়, এরা জ্বিন, এরা ভূত। এটাই ছিল ইয়াকীন, এটাই ছিল বিশ্বাস, যা তাদের অন্তরের গভীরে বাসা বেঁধেছিল এবং তাদেরকে রূপান্তরিত করেছিল নতুন মানুষে।

আফগানী যুবকবৃন্দ, বন্ধুরা আমার, এসো, নিজেদের ইতিহাসের প্রতি একবার তাকাও, লক্ষ্য করো, সুলতান মাহমূদ গযনভী কিভাবে বিরাট বিরাট দেশ জয় করে চলেছিলেন। ইতিহাস বলে, তিনি সতের বার ভারত আক্রমণ করেছিলেন। দুর্বার বেগে ঢুকে পড়েছিলেন এর অভ্যন্তরে, পৌছে গিয়েছিলেন সুদূর দক্ষিণ ও পূর্ব সীমান্তে। এমতাবস্থায় যে, না তার কাছে ছিল কোন রসদ সামগ্রী আর না আশা ছিল পিছন থেকে কোন সাহায্য সামগ্রী পৌছার। তার রাজধানী পড়ে রয়েছিল অনেক দূরে, মধ্যখানে আকাশচুম্বী পাহাড়, দুর্গম বন্ধুর রাস্তা, সংকীর্ণ সর্পিল গিরিপথ। এর প্রধান কারণ হলো, তাঁরা এই সমস্ত অভিযান এবং যুদ্ধ বিগ্রহকে ঠিক ততটুকুই গুরুত্ব দিতেন যতটুকু গুরুত্ব দিয়ে থাকেএকজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড় কোন প্রতিযোগিতামূলক খেলাকে। আল্লাহ্র উপর তাদের পরিপূর্ণ আস্থা ছিল। উপরন্তু তাঁরা মনে করতেন, জিহাদ একটি ইবাদত এবং এ পথে শাহাদত বরণ করার মৃত্যু নেই, সে অমর। এর উপর তাঁদের বিশ্বাস ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ়। তাঁরা নিজেদেরকে ইসলামের বার্তাবাহী বলে মনে করতেন এবং স্বেচ্ছাসেবী মনোবৃত্তি নিয়েই ভারতের প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের দাওয়াত পৌছানোর দায়িত্ব নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন।

বন্ধুগণ, আমি উপরে যে সমস্ত গুণাবলীর উল্লেখ করেছি তা শুধু ব্যক্তিগঠনের ক্ষেত্রে নয়, জাতি গঠনের ক্ষেত্রেও বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যক্তিগঠনের বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই মনোবিজ্ঞান এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়টিকে তাদের মূল আলোচ্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু আমি এখানে জাতিসমূহের কর্মকান্ড সম্পর্কেই

আলোচনা করছি। যা হোক ঐ গুণাবলী আফগান জাতিকে এমন উচ্চ সম্মান ও উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল যে, অন্যের পক্ষে তাদেরকে পরাজিত করা তো দূরের কথা, তাদের মুকাবিলা করাই ছিল অসম্ভব, এমন কি অকল্পনীয়। যখন কোন জাতির সংগঠকরা এই সমস্ত গুণ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে তখন সে জাতি পরাজয় ও বিফলতার সম্মুখীন হয়। আর আমার ভয় হচ্ছে, ইতিহাসের এই নাজুক মুহূর্তে আফগানী জাতি নিজেদের এই শক্তিশালী ও নেতৃত্বসুলভ বৈশিষ্ট্যাবলী থেকে না জানি বঞ্চিত হয়ে পড়ে এবং আল্লাহ্ না করুন, সে যুগ যেন আবার চলে না আসে যখন তারা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ এবং ইসলামী আহ্বান থেকে বঞ্চিত ছিলেন।

আমার যুবক বন্ধুদের বিশেষভাবে বলতে চাই, আপনারা জাতির মন-মস্তিষ্কে ঐ সমস্ত ধ্যান-ধারণা পুনরায় ঢুকিয়ে দিন, ঐ গুণাবলীকে প্রতিপালন করুন, সংরক্ষণ করুন, জাতিকে ঐ বৈশিষ্ট্যাবলীতে ভূষিত করে তুলুন। কেননা আপনাদের জাতি এখনো সেই প্রাচীনতম জাতি, সেই পর্বতশ্রেণী, বনরাজি, নীল আকাশ, সবুজ উপত্যকা পূর্বে যেমনটি ছিল তেমনটিই রয়ে গেছে, হাজার হাজার বছর পূর্বে কাবুল নদী যেমন বয়ে চলত এখনো তেমনি বয়ে চলেছে। এই ভূখণ্ডে আল্লাহ্র যে নিয়মাতরাজি পূর্বে ছিল এখনো তাই আছে, সেই মজাদার ফল, সেই মিঠা পানি, সেই অমূল্য অবদানরাজি এখনো হুবহু রয়ে গেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আসল বিষয় হলো, জাতিগঠনের উপাদানরাজি, জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী এবং আত্মবিশ্বাস ও কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টির নিদর্শনাবলী। এগুলোর মাধ্যমেই নির্ধারিত হবে জাতির ভাগ্য, খুঁজে পাওয়া যাবে যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রকাশের অনুকূল স্থান ও পরিবেশ, সন্ধান মিলবে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় আদর্শ নেতার। আল্লামা ইকবাল এই গূঢ় রহস্যেরই সন্ধানে ছিলেন। আল্লাহ্র দরবারে তিনি মুসলমানদের দৈন্য বিপর্যস্ত অবস্থা ও বিপদ-বাধার অভিযোগ উত্থাপন করলে জবাব আসে, 'এই সমস্ত লোক লক্ষ্যহীন জীবন অতিবাহিত করছে, তাদের সামনে এমন কোন প্রকৃষ্ট নমুনা বা আদর্শ-ব্যক্তিত্ব নেই যার প্রেমে নিজেদের অন্তর সিক্ত করবে, যার প্রশংসার গীত গাইবে এবং যার পদাংক অনুসরণ করে সার্থক করবে নিজেদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবন।

আফগান যুবকবৃন্দ, আপনাদের উপর আল্লাহ্র বিশেষ অবদান রয়েছে। তিনি কোন জিনিষেরই ঘাটতি রাখেননি আপনাদের মধ্যে। মনে রাখবেন–

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ·

অর্থ ঃ "আল্লাহ্র কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না ওরা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে।''–(১৩ ঃ ১১)

আল্লাহ্ তা'আলা এত মহান যে, তিনি কোন জাতিকে কিছু দান করার পর তা কখনো কেড়ে নেন না, যতক্ষণ না ঐ জাতি কৃতঘ্ন হয়ে পড়ে।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَّ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ·

অর্থ ঃ "তুমি কি ওদেরকে লক্ষ্য কর না যারা আল্লাহ্র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বদলে তা অস্বীকার করে এবং ওরা ওদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের ক্ষেত্রে।''–(১৪ ঃ ২৮)

এটা একেবারে ঐতিহাসিক সত্য কথা। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আসল বিষয় হলো, আত্মজ্ঞান ও আত্মজিজ্ঞাসা। নিজে- দের মূল্য, নিজেদের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হোন, নিজেকে জানার ও বুঝার চেষ্টা করুন।

আল্লামা ইকবাল কী সুন্দরই না বলেছেন

اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی

تو اگر میرا سین بنا نہ بن اپنا تو بن

"নিজের মধ্যে ডুব মেরে বের করে নাও জীবনের সন্ধান। তুমি আমার জন্য না হতে চাও নাই বা হলে, অন্তত: নিজের জন্য তো হও।

যে কোন জাতির জীবন 'ব্যক্তিত্ব ও 'পয়গাম (লক্ষ্যবস্তু)–এর কাছে দায়বদ্ধ

[এই বক্তৃতা ৯ই জুন, ইং ১৯৭৩ সনে সঊদী দূতাবাস আয়োজিত ও হোটেল কাবুলে অনুষ্ঠিত অভ্যর্থনা ও নৈশভোজ অনুষ্ঠানে প্রদত্ত]

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র এবং দরূদ ও সালাম তার রাসূলের উপর।

উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী,

আজকের এই সম্মিলনের সুযোগ গ্রহণ করে আমি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই। সর্বপ্রথমে আমি রাবিতা-ই-আলমে ইসলামীর পক্ষ থেকে এবং এই প্রিয় দেশ সফরকারী প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এই পবিত্র সমাবেশকে খোশ আমদেদ জানাই। আফগানিস্তান সরকার এবং আফগান জনসাধারণ আমাদেরকে যে আন্তরিক ও জাঁক-জমকপূর্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেছেন, আমাদের প্রতি যে সম্মান দেখিয়েছেন সেজন্য আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। অবশ্য এতে অবাক হওয়ারও কিছু নেই; কেননা ভদ্রতা, শিষ্টাচার এবং অতিথিপরায়ণতা এই জাতির এক একটি আদি ও অকৃত্রিম বৈশিষ্ট্য। একটি বিখ্যাত আরবী প্রবাদ হলো-

الشئی من معدنه لا یستغرب

"কোন বস্তুকে তার উৎসস্থলে বিস্ময়কর মনে হয় না।

সত্যি বলতে কি এই আদি গুণাবলী উদ্ভাসিত ছিল এই জাতির প্রতিটি গৌরবময় কর্মকাণ্ডে, বীরত্বে ও ত্যাগ স্বীকার, সামাজিক তথা প্রতিটি ক্ষেত্রে-একেবারে পরিপূর্ণ অর্থে। এই গুণাবলীই এদেরকে দেশের সীমিত গণ্ডী থেকে টেনে বের করেছিল এবং আকাশ চুম্বী পর্বতমালা ডিঙ্গাতে বাধ্য করেছিল। তারা ইসলামের মশাল, নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং সুশাসন ও সুব্যবস্থাপনার বিস্ময়কর দক্ষতা নিয়ে পাক-ভারতের সুদূর প্রান্ত পর্যন্ত গিয়েছিল। আমি এই জাতি এবং তাদের কৃতিত্বপূর্ণ অতীত কাহিনী অধ্যয়নে আমার জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় করেছি, আফগানিস্তানের নিকট প্রতিবেশী ভারতের নাগরিক হিসাবে অনেক আগেই আমার এদেশ সফর করার কথা, কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছায়ই এতদিন তা হয়ে উঠে নি। হয়ত এর মধ্যেও আল্লাহ্র কোন হিকমত ও রহস্য নিহিত রয়েছে।

সম্মানিত ভদ্রমণ্ডলী, প্রাচীন যুগে আরবরা এই দেশকে একটি দূর দূরান্তের দেশ বলেই মনে করত। তখন সফরের দূরত্ব এবং রাস্তার বন্ধুরতা বুঝবার জন্য দৃষ্টান্ত হিসাবে এই দেশেরই উল্লেখ করা হত। তখন এই গোটা এলাকাকে খুরাসান বলা হত। একজন আরবী কবির ভাষায়-

قالوا خراسان اقصى ما يراد بنا
ثم القفول فقد جئنا خراسان

''লোকেরা বললো, খুরাসানই আমাদের শেষ গন্তব্যস্থল, এরপর প্রত্যাবর্তন। তাহলে ধরে নাও আমরা খুরাসানে পৌছে গেছি।

হ্যাঁ, আমরাও খুরাসানে পৌছে গেছি, প্রবেশ করেছি আফগানিস্তনে, চোখ ভরে দেখেছি এর সবুজ শ্যামল ভূখণ্ড, আল্লাহ্ প্রদত্ত সৌন্দর্য, আস্বাদন করেছি এর স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া। কী সুন্দর করেই না গড়েছেন আল্লাহ্ তা'আলা আফগানিস্তানকে ! একজন আরবী কবি বলেন,

و لما نزلنا منزلا طله الندى + أينقا و بستانا من النور خاليا

اجد لنا طيب المكان و حسنه + منى فتمنينا فكنت الامانيا

"যখনই আমরা এমন কোন সুন্দর শোভনীয় স্থানে পৌছি, যে স্থানটিকে আর্দ্র করে রেখেছে কুজ্ঝটিকা, সুশোভিত করে রেখেছে ফুলের কলিসমূহ এবং স্থানটি জাগিয়ে দেয় আমার ঘুমন্ত বাসনাসমূহ তখন তুমিই পরিণত হও আমার বাসনার লক্ষ্যবস্তু।

এই দেশে প্রবেশ করার সময় আমাদের অবস্থাও হয়েছিল তাই। আমাদেরকে ধরেছিল ঐ একই নেশায়। কথায় কথা বাড়ে, এক জিনিষের পিছন ধরে অন্য জিনিষ এসে পড়ে। এই ভূখণ্ড এবং এতে প্রদত্ত আল্লাহ্ তা'আলার অপরিসীম সৌন্দর্যাবলী—আমার অন্তরে জীবন্ত করে তুলেছে সেই সত্তারই পুণ্যস্মৃতি, যিনি আমাদের জীবনের কায়া পাল্টে দিয়েছেন, পুরাতন জগত থেকে পৌছে দিয়েছেন এক নতুন জগতে এবং দিয়েছেন আমাদের জীবনালেখ্য।

মনে রাখবেন, সেই সত্তা হচ্ছেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে আমাদের দেহ ছিল, কিন্তু প্রাণ ছিল না, আমাদের নাম ছিল কিন্তু নামের কোন সার্থকতা ছিল না, আমাদের কায়া ছিল কিন্তু তাতে মায়া ছিল না। জাতি গোষ্ঠী ছিল কিন্তু তাদের জীবনের কোন লক্ষ্য ছিল না। তাদের কাছে মানব জাতির জন্য কোন পয়গাম ছিল না। এই

সত্তাই ঐ সমস্ত জাতি গোষ্ঠীর নতুন গুণে গুণান্বিত করেছেন, সুসজ্জিত করেছেন নতুন বৈশিষ্ট্যাবলীতে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন তাদের কাছে নতুন পয়গাম। জনৈক আরব মুসলমান এই পয়গাম নিয়ে শাহান-শাহ-ই-ইরানের দরবারে পৌঁছলে শাহানশাহ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ? সে উত্তরে বলেছিল-

" আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এ জন্য পাঠিয়েছেন, যাতে আমরা তারই মর্যী মত মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করি, এক আল্লাহ্র দরবারে তাদেরকে সিজদাবনত করিয়ে দিই, অন্যান্য ধর্মের জুলুম অত্যাচার থেকে তাদেরকে রক্ষা করি এবং আসলামের ন্যায় বিচারের ছায়াতলে তাদের স্থান করে দিই।

আপনারা যে জাতি ও যে দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন তা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথেই করছেন বলে আমি মনে করি। তবে আমার একান্ত কামনা, আপনারা যেন আমার ধারণার চাইতেও উৎকৃষ্টতর প্রমাণিত হন। সাথে সাথে আমি এটাও মনে করি যে, আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের একটি বাড়তি চাহিদা হচ্ছে, আপনারা যেন আপনাদের কর্মতৎপরতা গতানুগতিক রুটিনের গণ্ডীর মধ্যে সীমিত না রাখেন।

প্রাচ্য আপনাদের কাছে এই নাজুক মুহূর্তে অনেক কিছু দাবী করে। প্রাচ্য আজ উন্নত বিশ্বের অনেক পিছনে। পাশ্চাত্য আজ যে হুকুম জারী করে প্রাচ্য তা মেনে নিতে বাধ্য হয়, পাশ্চাত্য বলে আর প্রাচ্য শুনে, পাশ্চাত্য নেতৃত্ব দেয় আর প্রাচ্য তা অনুসরণ করে, পাশ্চাত্য উস্তাদ আর প্রাচ্য শাগরিদ, পাশ্চাত্য ভোজনবিলাসী আর প্রাচ্য তার উচ্ছিষ্টভোজী, প্রাচ্যবাসীদের আজ না আছে কোন ব্যক্তিত্ব, আর না আছে সভ্যতা এবং সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব এবং পয়গামকে আশ্রয় করেই জীবিত থাকে। অতএব আজ প্রাচ্যের জন্য ব্যক্তিত্ব ও পয়গামের প্রয়োজন-এমন ব্যক্তিত্ব যার মধ্যে ক্ষমতা থাকবে, আস্থা থাকবে-থাকবে দৃঢ়তা। আত্মবিশ্বাস, আত্মজ্ঞান, উদ্ভাবনী শক্তি ও নব নব আবিষ্কারের দক্ষতা, আর এমন পয়গাম, যার মধ্যে আন্তরিকতা, পবিত্রতা, দয়া, সহৃদয়তা, সাম্য, ন্যায় বিচার, শান্তি প্রিয়তা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ। একালে এবং সেকালের নিকুচি করার কোন প্রয়োজন আপনাদের নেই- পয়গাম

আপনাদের সামনেই রয়ে গেছে, আর তা হচ্ছে ইসলামের পয়গাম, যা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ধন্য করেছেন আপনাদেরকে। আমরা ইসলামেরই বার্তাবাহী। আমাদের আর কোন ধর্মের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু এই পয়গামের জন্য আবেগ ও অনুপ্রেরণার। মুসলমাদেরকে আত্মপরিচিতি লাভ করতে হবে এবং কর্মনিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতার মাধ্যমে তার প্রকাশও ঘটাতে হবে, যাতে দুর্দৈব ও দূরদৃষ্ট কেটে গিয়ে সেই অতীতের সোনালী ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে।

টীকা ঃ

১. হাযিরুল আলিমুল্ ইসলামী ঃ ২য় খন্ড ঃ পৃষ্ঠা-১৯৭

২. হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতেই সুলতান মাহমূদ গজনভী পাক-ভারতের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং এখানে ভিত্তি স্থাপন করেন ইসলামী রাষ্ট্রের।

৩. হিন্দ-আফগান বলতে পাক-ভারত বাংলাদেশ তথা গোটা মহাদেশকে বুঝায়। -অনুবাদক

৪. আল্লামা মুহাম্মদ আসলাম হিরাভী (মৃত্যু হিঃ ১০৬১ সন), তাঁর স্বনামধন্য পুত্র এবং 'মানতিক' (তর্কশাস্ত্র)-এর বিখ্যাত গ্রন্থ রিসালা-ই-মীর যাহিদ' এর গ্রন্থকার মীর যাহিদ (মৃত্যু হিঃ ১১০১) এবং পাক-ভারতে আগত অন্যান্য আফগানী আলিমদের জীবনালেখ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য মাওলানা আবদুল হাই হাসনী (রহ.) লিখিত গ্রন্থ 'নায্হাতুল খাওয়াতির' -বিশেষভাবে এর পঞ্চম ও ষষ্ঠখণ্ড দ্রষ্টব্য।

৫. এদের মধ্যে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী (মৃত্যু হিঃ ১১৭৬)-এর নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তিনি আফগান সরদার আহমদশাহ্ আবদালীকে বেশ কয়েকটি পত্র লিখেন, যার দ্বারা তার সূক্ষ্মবুদ্ধি ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য-শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ কে সিয়াসী খুতূতঃ প্রফেসর খালীক আহমদ নিযামী।

৬. আফগানিস্তানে এখনো (১৯৭৮ইং) সেই পরিবারই ক্ষমতাসীন রয়েছে। সাইয়িদ আহমদ শহীদের আহবান ও আন্দোলন সম্পর্কে জানতে হলে এই লেখকের 'সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ দ্রষ্টব্য।

৭. 'সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ', যার প্রথম সংস্কারণ ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয়। লেখক এতে পরিবর্ধন-প্রক্রিয়া বরাবর জারী রাখেন। সম্প্রতি দু'খন্ডে এর বর্ধিত সংস্করণ লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়েছে, যার প্রতিটি খণ্ড ৫০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত।

৮. আমীর শাকীর আরসালা তাঁর 'হাযিরুল আলমিল ইসলামী' গ্রন্থের মূল্যবান টীকায় আমীর আবদুর রহমানের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বৈশিষ্ট্যাবলীর উল্লেখ করার পর লিখেছেন, "তিনি পূর্বদিকে রাষ্ট্রের সীমা বৃদ্ধি করেন, ওয়াদীয়ে কুফরিস্তানকে পদানত করেন এবং তারই মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা সেখানকার অধিবাসীদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করেন। তিনি সে স্থানের নাম রাখেন নূরিস্তান। সংক্ষেপে বলতে গেলে, তাঁরই যুগে

আফগানী জাতি সুখ-সমৃদ্ধির সন্ধান পায় এবং ঐক্যের তাৎপর্যও অনুধাবন করে। তিনি দেশ পুনর্গঠনেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৩১৯ হিঃ, মুতাবিক ১৯০১ সন তিনি ইন্তিকাল করেন। সুষ্ঠু রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা এবং সংকল্পের দৃঢ়তার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠতম রাষ্ট্রনায়কদের অন্যতম। (হাযিরুল আলমিল ইসলামীঃ দ্বিতীয় খণ্ডঃ পৃষ্ঠা-২৭৯)।

৯. কাব্যানুবাদ ঃ মাও. কবি রূহুল আমীন খান

১০. তিনি ২৫ মুহাররামুল হারাম ১৩৭৬ হিঃ ইনতিকাল করেন। এই লেখক সৌভাগ্যক্রমে লাহোর এবং মক্কা মুয়ায্যামায় তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন।

১১. মাওলানা সাইফুর রহমান সীমান্ত প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তারপর হিন্দুস্তানের দিকে রওয়ানা হন। সেখানে মাওলানা লুতফুল্লাহ্ আলীগড়ীর কাছে বিজ্ঞান ও অংকশাস্ত্র এবং মাওলানা রাশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর কাছে হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বেশ কয়েক বছর টুংক রাজ্যের মাদ্রাসাই-নাসিরিয়ায় শিক্ষকতা করেন এবং সেখানে বসতিও স্থাপন করেন। কিছুদিন ফতেহপুরীতেও শিক্ষকতা করেন। শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান সাহেবের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং তিনি তাঁর জিহাদী আন্দোলনের বিশেষ সদস্যও ছিলেন। মাওলানা এই লক্ষ্য সামনে রেখেই হিন্দুস্তান থেকে হিজ্-রত করেন এবং সীমান্ত প্রদেশের বিখ্যাত মুজাহিদ হাজী তুরংগ্যায়ীর নেতৃত্বে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এই প্রচেষ্টায় বিফল হওয়ার পর তিনি হিজরত করে কাবুলে চলে যান এবং সেখানে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদেও অধিষ্ঠিত হন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি পেশাওয়ারে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ৭ জমাদি-উল-উলা ১৩৬৯ হিঃ আপন গ্রাম মিথুরানূতে ইন্তিকাল করেন। মিথারানূ পেশাওয়ারের উত্তরে অবস্থিত। মাওলানা অত্যন্ত সাহসী, উচ্চাকাংক্ষী, প্রতিভাধর ও ধী-সম্পন্ন আলিম ছিলেন। তিনি ছিলেন ইংরেজদের কট্টর শত্রু। পাক-ভারতে তার অনেক ছাত্র রয়েছে।

১২. হাকীম সানায়ীর নাম ছিল মাজদূদ এবং উপাধি ছিল আবুল মাজদ। তিনি বাহরাম শাহ গযনভীর যুগের লোক। মতান্তরে তিনি ৫২৫, ৫৪৬ হিঃ অথবা ৫৭৬ সনে ইনতিকাল করেন। তিনি একজন প্রথম সারির সূফী কবি ছিলেন। সর্ব প্রথম তিনিই সৎচরিত্র, শিষ্টাচার এবং মানবতার মাহাত্ম্যকে কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়ে পরিণত করেন এবং এর উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। আবেগ সৃষ্টি এবং প্রভাব বিস্তার ছিল তার ভাষার বৈশিষ্ট্য।

১৩. এই কবিতাটি ইকবালের কাব্যগ্রন্থ 'বালে জিবরীল'-এর প্রাথমিক কবিতাগুলোর অন্যতম। এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও সাধারণ ভাবার্থ 'ইকবাল গযনী মেঁ' শিরোনামে 'নুকূশে ইকবাল' গ্রন্থে রয়েছে।

১৪. উর্দূ অনবাদ 'শে' রুল আজম' থেকে গৃহীত। বাংলা কাব্যানুবাদ ঃ মাও. কবি রূহুল আমীন খান।

১৫. কাবুল থেকে চলে যাবার মাত্র পাঁচ সপ্তাহ পর যখন আমরা মক্কায় ছিলাম তখন কাবুলের আকস্মিক বিপ্লবের কথা জানতে পারি। শাহ্ এক সরকারী সফরে ইতালী গিয়েছিলেন। তার অনুপস্থিতিতেই সামরিক বাহিনী তাকে সিংহাসনচ্যুত করে। আমরা জানতে পেরেছি যে, এই বিপ্লবের মূল হোতা সরদার মুহাম্মদ দাউদ খানই ছিলেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম আফগানিস্তান সাধারণতন্ত্রের সদর বা সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৬. অভিজ্ঞ মহল থেকে জানা গেছে, আফগানিস্তান প্রথম প্রথম সাহায্যের জন্য আমেরিকার কাছে আবেদন জানায়। কিন্তু 'আফগানিস্তান সীমাতিরিক্ত অনগ্রসর'—এই অজুহাতে আমেরিকা তাকে সাহায্য প্রদানে অস্বীকার করে। রাশিয়া এই সুযোগে আফগানিস্তানের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ায়। এভাবে আমেরিকা আর একটি প্রাচ্য দেশকে রাশিয়ান ব্লকের অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য করে।

সুন্দরের দেশ

স্বপ্নের দেশ ইরান

২

ইরান সফরের বাসনা

বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার লালনক্ষেত্র, আরবী ভাষা ও সাহিত্যের স্বানমখ্যাত গ্রন্থকারদের জন্মস্থান, সুশীল চিন্তা, সুন্দর কল্পনা ও মিষ্টি মেজাজের দেশ এবং 'প্রাচ্যের গ্রীস' ইরান সফরের বাসনা আমার আজন্মকালের। এই স্বপ্ন, এই আশা বুকে নিয়ে জীবন কাটাচ্ছিলাম। ইরানের বাসন্তিক রূপশোভা আমার কল্পনা-চোখে ভেসে বেড়াচ্ছিলো। অন্তরচোখে নিরীক্ষণ করছিলাম ইরানের প্রাণোচ্ছল জীবন ধারা, সুরেলা প্রান্তর, রমনীয় পরিবেশ, প্রাণহরা মাতালকরা আচার ভংগিমা – যা যুগে যুগে থেমে থেমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে নিত্য নতুন চিন্তাধারণা, চিরন্তন ধর্ম ও দর্শন রূপে, যেখানে চর্চা হয়েছে এমন তাসাউফ ও আধ্যাত্মবাদের যা ছিল মর্মবাদী ও প্রেমাশক্তিতে ভরপুর, নিত্যনতুন চিন্তাভাবনা ও অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ।

শেষ পর্যন্ত আমার আশা পূরণ হলো তখন, যখন জীবনের অনেকগুলো স্তর অতিক্রম করে ফেলেছি, সুন্দর সুন্দর ভাবনা কল্পনায় অন্তরকে সিক্ত করার ফলে তাতে প্রকৃত সত্যের সন্ধান স্পৃহা প্রাধান্য লাভ করেছে। সম্ভবতঃ এটা ভালই হয়েছে।

সফরের উপলক্ষ

মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলমানদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য রাবিতায়ে আলমে ইসলামী একটি ব্যাপক কর্মসূচী তৈরী করেছিল। এই কর্মসূচীর মাধ্যমেই আফগানিস্তান ও ইরান স্বচক্ষে দেখার আমার বহু দিনের বাসনা পূরণ হলো। আর সত্যি কথা বলতে গেলে, রাবিতায়ে আলমে-ইসলামীর প্রতিনিধিদল ইরানের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাৎ; বিভিন্ন সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলী পরিদর্শন তথা ইরান সফরের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সার্থক, চরিতার্থ এবং অধিকতর উপকারী ও কল্যাণমুখী করে তোলার ব্যাপারে চেষ্টার কোনই একটি করেনি।

ইরানী আওকাফ মন্ত্রণালয়ের প্রেসিডেন্ট ও সহকারী প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনূচেহের আযমূন অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে প্রতিনিধিদলের পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং ইরান সফরকালীন তাদের যাবতীয় দায়দায়িত্ব আওকাফ মন্ত্রণালয়ের হাতে অর্পণ করেন। রাবেতার প্রতিনিধিদল ডঃ আযমূনের কাছে,

তাঁর এই অনুগ্রহ ও আন্তরিকতার জন্য বিশেষভাবে ঋণী এবং ইরানীদের কাছে তাদের ঐতিহ্যগত বদান্যতা ও অতিথি পরায়ণতার জন্য চিরকৃতজ্ঞ।

ইরানে অবস্থানকাল

আমাদের প্রতিনিধিদলকে আট দিনের মধ্যেই ইরানের ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি পরিদর্শন এবং সেখানকার ইসলামী আন্দোলনসমূহের কর্মতৎপরতা পর্যবেক্ষণের কাজ সমাপ্ত করতে হবে। কিন্তু আমরা যাদের অস্থিমজ্জায় ফারসী ভাষা ও সাহিত্য বাসা বেঁধে আছে তাদের কাছে, ইরানে এসে শায়খ সাদী ও খাজা হাফিজের শহর শিরাজ স্বচক্ষে না দেখে ফিরে যাওয়াটা একটা বড় বঞ্চনা ও বেরসিকতা ছাড়া কিছু নয়। কেননা শায়খ সাদী, খাজা হাফিজ এবং তাদের চিরস্মরণীয় গ্রন্থাদি পাক-ভারতের যে কোন অভিজাত পরিবারের সদস্যরা গত অর্ধশতাব্দী পূর্ব পর্যন্তও পুরোপুরি ওয়াকিফহাল এবং তাদের যাদুকরী কথাবার্তা দ্বারা যারপরনেই অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত ছিল। বিষয়টির দিকে ডঃ আযমূনের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারলাম না। তিনিও অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে আমাদের আবেদনে সাড়া দিলেন এবং শুধু শিরাজ শহর নয়, বরং সেই সাথে সাফাভিয়া বাদশাহ্দের রাজধানী এবং ইরানী ভাস্কর্য ও ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি-সমৃদ্ধ ইসপাহানকে আমাদের দর্শনীয় স্থানসমূহের অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন। এভাবে ইরানের দশ দিনব্যাপী এই স্মরণীয় সফর (যার সূচনা ১৩৯৩ সনের ৯ই জমাদিউল উলা সোমবার-মুতাবিক ১৯৭৩ সনের ১১ই জুন[১] ভালোয় ভালোয় ১৩৯৩ সালের ১৮ই জমাদিউল উলা বুধবার মুতাবিক ১৯৭৩ সনের ২০শে জুন শেষ হয়। যেহেতু এই সফরের শেষ মনযিল ছিল মক্কা মুকাররমা, তাই আমরা তেহরান থেকে ২১শে জুন বৈরুতে গিয়ে পৌঁছি। তেহরানের প্রসিদ্ধ পার্ক হোটেলে (Hotel Park) আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। আমরা ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি দেখা, বিশিষ্ট জ্ঞানী ও ধর্মীয় নেতাদের সাথে সাক্ষাৎকার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রচার কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন, তাদের কর্ম-তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং বিভিন্ন অভ্যর্থনা সম্বর্ধনা ও অনুষ্ঠানে যোগদানের মাধ্যমে আমাদের দশ দিনের এই স্মরণীয় সফর শেষ করি।

মন্ত্রীবর্গ ও আলিমদের সাথে সাক্ষাৎকার

আমরা ইরানের যে সমস্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাৎ করেছি তাদের মধ্যে ইরানী প্রধানমন্ত্রী আমীর আব্বাস হুভায়দা,[২] ইরানী উচ্চতর

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী উস্তাদ কাযিম যাদাহ্ এবং সহকারী প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনূচেহের আযমূনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত ব্যক্তির সাথে তেহরান অবস্থানকালে আমরা অনেকবার সাক্ষাৎ করি। প্রথম সাক্ষাৎকার খুব দীর্ঘ হয়েছিল। তাতে আমরা অবাধে ও উম্মুক্ত মনে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করি। শিক্ষাগত এবং ধর্মীয় বিষয়াবলী ও আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমাদের শেষ সাক্ষাৎকারও হয়েছিল অত্যন্ত অবাধ ও উদার। তাতেও শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা চলে। সফর শেষে ডঃ মনূচেহের আযমূন হিল্টন হোটেলে প্রতিনিধিদলের সম্মানে একটি জাঁকজমকপূর্ণ নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন।তাতে বেশ কয়েকজন মন্ত্রী ছাড়াও শহরের বিরাট সংখ্যক অভিজাত ও সম্মানিত ব্যক্তির্বগ উপস্থিত ছিলেন।

আমরা ইরানের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট আলিম এবং ধর্মীয় নেতার সাথে সাক্ষাৎ করি। তাঁদের সাথে শিক্ষাগত বিষয়াবলী সম্পর্কে মত-বিনিময় হয়। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, আয়াতুল্লাহ্ আল্ উযমা৩ সাইয়িদ মুহাম্মদ কাযিম শারীআত মাদারী, আয়াতুল্লাহ্ মির্যা মুহাম্মদ খলীল কামরাহ্য়ী, তেহ্রানের শাহী মসজিদের ইমাম আয়াতুল্লাহ্ সাইয়িদ হাসান ইমামী এবং বিখ্যাত ইরানী আলিম আয়াতুল্লাহ্ মুহাম্মদ তাকী-প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইরানী পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের মধ্যে আল্লামা ওয়াহীদ৪ এবং 'কুল্লিয়াতুল ইলাহিয়াত' এর প্রিন্সিপাল ডঃ মুহাম্মদ মুহাম্মদীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কুল্লিয়াতুল ইলাহিয়াত-এর ফিকহে শাফীর উস্তাদ অধ্যাপক শায়খুল ইসলাম, তেহ্রানের আরবী মাসিক 'আল ফিকর আল- ইসলামী'-এর অধ্যাপক ডঃ আব্বাস মুহাজিরানী, তেহরানের আর্যমেহের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার এবং বিশ্ববিখ্যাত ইরানী পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ ডঃ সাইয়িদ হুসায়ন নাস্র এবং 'কুম' -এর দারুত তাবলীগ আল-ইসলামী-এর কর্মচঞ্চল সদস্য ও 'আলহাদী' পত্রিকার সম্পাদক সাইয়িদ হাদী খসরুশাহীর সাথেও আমাদের সাক্ষ্য হয়। সময়ের স্বল্পতা, উপরন্তু গ্রীষ্মের ছুটি থাকায় ইরানী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এবং আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত পণ্ডিতদের সাথে আমরা ব্যাপকভাবে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারিনি।

ইরানের ধর্মীয় ঐতিহাসিক স্থানসমূহ

আমরা ইরানের যে সব বিখ্যাত ঐতিহাসিক শহর দেখার সুযোগ পেয়েছি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, তেহরান, কুম, ইসপাহান, মাশহাদী এবং শিরাজ। তেহরান হচ্ছে ইরানের রাজধানী এবং সবচেয়ে সুন্দর শহর। শিক্ষাগত ও ধর্মীয় কর্মচাঞ্চল্যের জন্য কুম বিখ্যাত। মাশহাদ হচ্ছে একটি আধ্যাত্মিক কেন্দ্র। ইসপাহান দীর্ঘকাল পর্যন্ত সাফাভিয়া রাজবংশের রাজধানী এবং সভ্যতা সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। আর শিরাজ হচ্ছে ফারসী কাব্য ও সাহিত্যের যেন একটি জীবন্ত প্রতিমূর্তি।

ইতিহাসের একজন মুসলমান ছাত্র, প্রাচীন নিদর্শনাদির প্রতি আগ্রহ প্রদর্শনকারী একজন ঐতিহাসিক এবং বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন শহর সফরকারী এবং সেখানকার যাবতীয় অবস্থা পর্যবেক্ষণকারী এক-জন পর্যটকের জন্য গভীর অধ্যয়ন ও চিন্তা-ভাবনার যাবতীয় উপাদান মওজুদ রয়েছে ইরানের ঐতিহাসিক স্থানসমূহে। আমরা সেখানে ঐ সমস্ত ঐতিহাসিক নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছি। সেগুলো স্থাপত্য শিল্প, হস্ত শিল্প ও কারিগরী শিল্পের এক একটি শ্রেষ্ঠ নমুনা ও সাফাভিয়া রাজবংশের উন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতির এক একটি অতুলনীয় কীর্তি। আমরা ইরানের আধুনিক শিল্পজাত সামগ্রী এবং ঐ সমস্ত জিনিষও দেখেছি যেগুলো উপঢৌকনস্বরূপ বাইরে পাঠানো হয়। এগুলোর মাধ্যমেই ইরানের খ্যাতি আজ বিশ্বজোড়া।

ইরান যুগ যুগ ধরে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির একটি বিরাট কেন্দ্র। সেখানে অসংখ্য মসজিদ রয়েছে। কোন কোন মসজিদ যেন স্থাপত্য শিল্পের এক একটি অতুলনীয় নমুনা। ইমাম আলী রেযা ইবনে মূসা কাযিমের বোন সাইয়িদা মাসূমার নামে একটি মসজিদ রয়েছে। সেখানে রাতদিন ইরানী দর্শক ও পর্যটকদের ভিড় লেগেই থাকে। মসজিদের সন্নিকটে সাইয়িদার সমাধিও রয়েছে। সেখানকার মসজিদে সিপাহ্‌সালারের নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মসজিদকে স্থাপত্য, কারিগরী ও হস্তশিল্পের শ্রেষ্ঠতম নমুনা বলে মনে করা হয়। এ দু'টি মসজিদ ছাড়াও আরো অনেক নামকরা মসজিদ রয়েছে। এর মধ্যে শাহী মসজিদ (তেহরান), জামি মসজিদ, মসজিদে গাওহার (মাশহাদ), মসজিদে শাহ আব্বাস সাফাভী, মসজিদে শেখ লুতফুল্লাহ, জামি' মসজিদ, চাহারবাগ (ইসপাহান) এবং মসজিদে ওয়াকীল (শিরাজ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যের দাবী রাখে। ইমাম আল-রেজার মাযার

ইরানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমাধিসমূহের অন্যতম। এই সমাধি দেখার জন্য দর্শনার্থীরা রাতদিন মিছিল সহকারে আসতে থাকে।

আমরা ইরানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় কেন্দ্র দেখার সুযোগ লাভ করি। এগুলোর মধ্যে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের কুল্লিয়াতুল ইলাহিয়াত ও উলূমে ইসলামিয়া, মারাকাবুত্ তাকরীব বায়নাল মাযাহিবিল ইসলামিয়া এবং কুম শহরের শিক্ষাকেন্দ্র দারুত তাবলীগিল ইসলামী–এর সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আলোচনা সভা ও অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান

এই দশ দিনের সফরে আমরা অনেক অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান ও সভা সমিতিতে যোগদান করার সুযোগ পাই। সেগুলোতে রাবিতার প্রতিনিধিদলের প্রতি সবিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হয়। ঐ সমস্ত সভায় স্বাগত ভাষণও প্রদান করা হয় এবং প্রতিনিধিদলের সদস্যরাও সুযোগমত তাদের বক্তব্য পেশ করেন। এ প্রসঙ্গে চারটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম অভ্যর্থনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয় আল্লামা শারীআত মাদারীর বাস ভবনে, দ্বিতীয়টি কুম–এর দারুত তাবলীগিল ইসলামিয়ায়। এ সভায় বেশ কয়েকটি বক্তৃতা পেশ করা হয় এবং কাসীদা (কবিতা)ও পড়া হয়। তৃতীয় অভ্যর্থনা সভার আয়োজন করেন। মির্যা মুহাম্মদ খলীল কামরাহ্য়ী তার নিজস্ব বাসভবনে। প্রতিনিধিদলের সম্মানে আল্লামা হাবীবুল্লাহ্ মায়জদানীও তাঁর বাসভবনে একটি সংক্ষিপ্ত অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। দারুত্ তাবলীগিল ইসলামী এবং আল্লামা হাবীবুল্লাহ্ মায়লানীর বাসভবনে অনুষ্ঠিত অভ্যর্থনা সভায় স্বাগত ভাষণ পেশ করা হয় এবং প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে তার জবাবও প্রদান করা হয়। মীর্যা মুহাম্মদ খলীলের বাসভবনে অনুষ্ঠিত অভ্যর্থনা সভাটি বিশেষভাবে আকর্ষণীয় ছিল এজন্য যে, তাতে আল্লামা ইকবালের বিশ্ববিখ্যাত তারানা (গীতি কবিতা) পঠিত হয়।

چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا

مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا

মোদের আরব, চীন, আমাদের দেশ হিন্দুস্তান
আমরা মুসলিম জাতি সারা বিশ্ব মোদের ওয়াতান।

আরবী ভাষা বিশারদ কবি সাভী শা'লান আরবীতে তারানাটির সুন্দর কাব্যানুবাদ করেছেন। যখন আরবী ভাষায় তারানাটি পঠিত হয় তখন ফারসী ভাষায় অনূদিত কাব্যানুবাদটিও পড়ে শুনানো হয়। স্বাগত ভাষণের জবাবে প্রতিনিধিদলের সদস্য উস্তাদ মুহাম্মদ জামাল এবং এই লেখক তাদের বক্তব্য পেশ করেন।

তেহরানে একটি সংস্থা আছে যার লক্ষ্য হলো, বিভিন্ন ইসলামী মত ও পথের লোককে একই কেন্দ্রে জড় করা। আমরা ঐ সংস্থাটিও দেখতে গিয়ে ছিলাম। সেখানে শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট আলিম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হয়। এই সংস্থায় আয়োজিত অভ্যর্থনা সভায় আয়াতুল্লাহ্ মুহাম্মদ তাকী আল কুমী বক্তৃতা দেন এবং তার উত্তরে আমিও আমার বক্তব্য পেশ করি।

কৃতি সন্তানদের লালনকেন্দ্র তূস

ইরানের মাহাত্ম্যকে চিরস্মরণীয় করা, ফারসী ভাষা ও সাহিত্যকে নবজন্ম দান এবং জাতীয় আত্মসম্মানবোধ পুনর্জাগরিত করার ক্ষেত্রে কবি ফিরদাউসীর 'শাহনামা'-এর বিরাট অবদান রয়েছে। কোন যুগেই ইরানী শাহনামার প্রতি আসক্ত লোকের অভাব হয়নি। ইরান সরকার ফিরদাউসীর একটি বিরাট স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করে ইরানী জাতি ও ফারসী ভাষার প্রতি তার বিরাট ঋণের যথার্থ স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ইরানের বিখ্যাত শহর তূস' অনেক মহান ব্যক্তির জন্মস্থান এবং অনেক অবিস্মরণীয় পুরাকীর্তির সৃতিকাগার হওয়ার কারণে ইসলামী ইতিহাসে এর একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। এই শহরই হিঃ পঞ্চম শতাব্দীর বিখ্যাত মুজাদ্দিদ হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী, সেলজুকী রাজ্যের সুযোগ্য উযীর নিযামুল মূলক তূসী, বিশ্ববিখ্যাত কবি ফিরদাউসী এবং স্বনামধন্য পণ্ডিত নাসিরুদ্দীন তূসীর মত স্মরণীয় বরণীয় ব্যক্তিদের জন্ম দিয়েছে।

ইমাম গাযালীর সমাধিস্থলে

তূসে অবতরণ করতেই মনের পর্দায় ভেসে উঠল ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনাগুলো। একদিন এই তূসে ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎসভূমি। এখান থেকেই শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করে মুসলমানরা ছড়িয়ে পড়ত বিশ্বের প্রান্তে

প্রান্তে। তূসের ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি দেখার সাথে সাথে আমাদের মন চলে গেল বহু শতাব্দী ও বহুপুরুষের উপর যাদুকরী প্রভাব বিস্তারকারী ইমাম গাযালী এবং তার কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাবলীর দিকে। তিনি তাঁর গ্রন্থাদির মাধ্যমে যে খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন তা মুসলিম বিশ্বের বিখ্যাত চার মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতাগণ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির ভাগ্যে বহু কমই জুটেছে। আমরা যখন আমাদের গাইড (পথ প্রদর্শনকারী)–কে ইমাম গাযালীর বাসস্থান, তার জ্ঞানগত নিদর্শনাদি এবং শেষ বিশ্রামস্থল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম তখন তার পক্ষ থেকে খুব একটা উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গেল না। গাইড প্রাচীন জরাজীর্ণ ঘরবাড়ী অতিক্রম করে এগিয়ে চললো এবং শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে একটি প্রাচীন দালানের সামনে নিয়ে দাঁড় করালো। দালানটি যেন উপেক্ষা ও চক্ষুলজ্জাহীনতার এক জীবন্ত স্বাক্ষর। আমরা যে দালানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম সে দালান সম্পর্কে আমাদেরকে বলা হল যে, এখানেই হারুন–অর–রশীদ তার বিরুদ্ধাচারীদেরকে বন্দী করে রাখতেন। এর মধ্যে প্রবেশ করার পর বন্দীরা আর কোন দিন সূর্যের আলো দেখতো না। দালানটির নাম 'হারুনিয়াহ্'।

ইমাম গাযালীর সমাধি সম্পর্কে অনেক অমূলক কাহিনী প্রচলিত আছে। তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ ঈসা সিদ্দীক লিখিত 'আরাম–গাহ্–ই–গাযালী' (গাযালীর বিশ্রামস্থল) শীর্ষক গ্রন্থটি আমার হস্তগত হয়েছে। তিনি ঐ সমস্ত কাহিনী নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন এবং ইউরোপীয় পর্যবেক্ষক ডঃ যুয়েমার (DR. ZWEMER) ও মার্কিন প্রাচ্যবিদ প্রফেসর পোপ (PROF. POPE)-এর বরাতে এবং পূর্ববর্তীকালের প্রাচীন গ্রন্থকার তাজুদ্দীন সুবকী ও পরবর্তীকালের আকায়ে আলী আসগর হিকমত–এর গবেষণা সূত্রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ইমাম গাযালীর সমাধি এই পুরাতন দালান হারুনিয়ার পাশেই রয়েছে।

ঐতিহাসিক কৌতূহল এবং ইমাম গাযালী ও তার গ্রন্থাদির প্রতি আগ্রহ আসক্তি আমাদেরকে যেন টেনে হেঁচড়ে তার সমাধিস্থল পর্যন্ত নিয়ে গেল। অনুমিত হলো, যেন অতি সম্প্রতি একটি সমাধি ঠিকঠাক করা হয়েছে। আমরা যে দালানে গিয়ে উঠলাম তার পাশেই ইমাম গাযালীর সমাধি। কিন্তু তাতে এরূপ কোন নামফলক নেই যার দ্বারা কিছু বুঝা যেতে পারে। গার্ড আমাদেরকে বললো যে, দালানের ভিতরে একটি লিখিত ফলক রয়েছে। বেশ

কষ্টেসৃষ্টে কিছু শব্দ পড়া গেল। আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য, তার অভাবশূন্যতা ও পরমুখাপেক্ষীহীনতার শান গরিমা যেন চোখের সামনে ভেসে উঠলো। আল্লাহই অবিনশ্বর, চির বিদ্যমান আর বাকি সবকিছু নশ্বর, ধ্বংসশীল।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّ يَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ

অর্থ "ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর; অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিময়, মহানুভব।"-(৫৫ ঃ ২৬-২৭)

নাদির শাহ

নাদির শাহের সমাধি হচ্ছে তূসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নিদর্শন। নাদির শাহের কথা কে না জানে ? তিনি ১১৫১হিঃ সনে মুতাবিক ১৭৩৯ইং সনে ভারত আক্রমণ করেন এবং রাজধানী দিল্লীকে তীক্ষ্ণধার তরবারির শিকারে পরিণত করেন। সেই তরবারি কেবল তখনি কোষবদ্ধ করা হয় যখন দিল্লীর রাজপথ দিয়ে রক্তের বন্যা বয়ে গেছে।[৬] নাদির শাহ মুঘল বাদশাহ্ মুহাম্মদ শাহকে পরাজিত করে ভারত থেকে সেই জগদ্বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন উঠিয়ে নিয়ে যান যেটাকে শাহজাহান অমূল্য হিরামোতি দিয়ে সুসজ্জিত করেছিলেন।

নাদির শাহ ছিলেন ঐ যুগে ইরানের সর্বশ্রেষ্ঠ জননায়ক ও সমরনায়ক। তিনি মাশহাদকে তার রাজধানী এবং ভারত আক্রমণের সামরিক ঘাঁটি করেছিলেন। ইরান সরকার 'কাখে গুলিস্তানে' নাদির শাহের স্মরণীয় নিদর্শনাদি অত্যন্ত যত্নের সাথে একটি যাদুঘরে সংরক্ষণ করেছেন। ছবি ও চিত্রকর্মের সাহায্যে তাঁর সামরিক কীর্তিসমূহ এবং বীরত্ব ও দৃঢ় সংকল্পের ঘটনাবলী তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। নাদির শাহের আনীত ময়ূর সিংহাসন এখন আর সেই প্রকৃত অবয়বে নেই। অবশ্য তেহরান যাদুঘরে ইরান সরকার মোটামুটি সেই অবয়বেরই একটি সিংহাসন তৈরী করে রেখেছেন। আসল হিরা জাওয়াহিরাত ব্যাংকের লকারসমূহে এবং যাদুঘরে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

খলীফা হারূন-অর রশীদের স্মৃতি

আব্বাসী খলীফা হারূন-অর রশীদের মত এত বিরাট ও খ্যাতি সম্পন্ন একটি সাম্রাজ্যের কর্ণধার হওয়ার গৌরব কোন মুসলিম শাসক, এমন কি

প্রাচ্যের কোন বাদশাহের ভাগ্যেও জুটে নি। হারূনের সাম্রাজ্যের বিরাট, তাঁর একটি ঐতিহাসিক বাক্য থেকে অনায়াসে অনুমান 'করা যায়। তিনি একবার এক খণ্ড মেঘকে সম্বোধন করে বলেছিলেন-

امطری حیث شئت فسیأتینی خراجك

অর্থ ঃ "হে মেঘখণ্ড, তুমি যেখানে ইচ্ছা বারিপাত করো, তোমার খাজনা অবশ্যই আমার কাছে আসবে।"

ঐতিহাসিক দিক দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, হারুন-অর রশীদের সমাধি তূসে অবস্থিত। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়কর বরং শিক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, হারূন-অর রশীদের কবরের চিহ্ন কোথাও পাওয়া যায় নি। সম্ভবতঃ তার সমাধি ইমাম আলী রেযার সমাধিপার্শ্বে অবস্থিত, তবে শেষোক্ত জনের ধর্মীয় গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যের সামনে বাদশাহ্ হারূনের বাদশাহী মর্যাদা ম্লান হয়ে গেছে।৭

ইসপাহান

আমরা ঐ সফরকালে বিখ্যাত শহর ইসপাহানও ঘুরে আসি। বিখ্যাত গ্রন্থ 'হুলইয়াতুল আওলিয়া'-এর গ্রন্থকার আবূ নাঈম ইসপাহানী (মৃত্যু ৪৩০হিঃ সন), 'মুফরাদাতে গারীবিল কুরআন'-এর সংকলক ইমাম রাগিব ইসপাহানী (মৃত্যু- ৫৭২হিঃ সন), আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গ্রন্থ 'রিওয়াতুল আগানী'-এর গ্রন্থকার আবুল ফারজ ইসপাহানী (মৃত্যু ৪৬৮হিঃ) একটি পৃথক ফিক্হী মাযহাবের প্রবর্তক ইমাম আবূ দাঊদ যাহিবী (মৃত্যু ২৭০হিঃ সন) বিখ্যাত তর্কশাস্ত্রবিদ ও উসূল বিশেষজ্ঞ মুহাম্মদ বিন ফূরক (মৃত্যু ৪০৬হিঃ) প্রমুখের লালন ও বিচরণ ক্ষেত্র ছিল এই ইসপাহান।

ইসলামী ইতিহাসের সূচনাকালে বিশেষ করে আব্বাসী যুগে ইসপাহান ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র। সাফাভী যুগে এটা অবিশ্বাস্য রকমের উন্নতি লাভ করে এবং ইরানের প্রথম সারির একটি শহরে পরিণত হয়। সাফাভী বংশের শাসক ও প্রতিষ্ঠাতা ইসমাঈল সাফাভী তাবরীযেই রাজমুকুট ধারণ এবং সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই বাদশাহ্ই সর্বপ্রথম শিয়া মাযহাবের ঘোষণা দেন এবং এটাই সরকারী মাযহাবে পরিণত হয়। তিনি কাযভীনকে তার রাজধানী বলেও ঘোষণা করেন। শাহ্ ইসমাঈল

সাফাভীর উত্তরাধিকারী শাহ্ আব্বাস সাফাভী (মৃত্যু ১৬০২ইং সন) সাফাভী রাজবংশের সবচাইতে বিখ্যাত ও পরাক্রমশালী শাসক ছিলেন। তাঁর যুগেই রাজধানী, কাযভীন থেকে ইসপাহানে স্থানান্তরিত করা হয়। ইসপাহানের আধুনিক দালান-কোঠা, ঐশ্বর্যমন্ডিত সংস্কৃতি, অসাধারণ শোভা-সৌন্দর্য সবই শাহ্ আব্বাস সাফাভীর অবদান। সেখানকার পরিকল্পিত পদ্ধতিতে নির্মিত ঘরবাড়ী, হাটবাজার শাহ আব্বাস সাফাভীর উন্নত ও পরিচ্ছন্ন রুচির পরিচয় বহন করছে। ইসপাহানে আমরা 'মেহমান সারায়ে শাহ আব্বাস সাফাভী' নামক এমন এক হোটেলে অবস্থান করি যাকে হোটেল বা গেষ্ট হাউসের পরিবর্তে শাহী প্রাসাদ বলেই মনে হয়। শহরের সর্বত্রই ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি, উদ্যানরাজি ও সমাধিসৌধ রয়েছে। সময়ের অভাবে আমরা সব কিছু দেখে আসার সুযোগ পাইনি।

সাফাভীরা আনুমানিক দু'শতাব্দী পর্যন্ত অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে রাজ্য শাসন করে। কিন্তু দুনিয়ার অন্যান্য রাজবংশের মত সাফাভী রাজবংশও শেষ পর্যন্ত পতন থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে নি। বেশ কিছুদিন দেশব্যাপী অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা চলার পর তুর্কী বংশোদ্ভূত কাচারীর - তাদের হাত থেকে শাসনক্ষমতা কেড়ে নেয়। আগা মুহাম্মদ শাহ (মৃত্যু ১৭৭৯ইং সন)-এর শাসনামলে রাজধানী, ইসপাহান থেকে তেহরানে স্থানান্তরিত করা হয়। ঐ যুগে তেহরান কোন উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল না। উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়েই তা সমৃদ্ধশালী ও জাঁকালো হয়ে উঠে।

لِلّٰهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ

অর্থ ঃ "অগ্র ও পশ্চাতের সিদ্ধান্ত আল্লাহ্র হাতেই।" -(৩০ ঃ ৪)

শিরাজ

পাক-ভারতীয় সাহিত্য, কাব্য ও প্রবাদ বাক্যের সাথে শিরাজের নাম এমনভাবে মিশে গেছে যে, একটি থেকে অন্যটিকে পৃথক করা খুবই মুশকিল। সাদীর ছন্দবদ্ধ মিষ্টিকথা এবং হাফিজের রসালো কাব্য গাঁথাই আমাকে শিরাজ আসার জন্য পাগলপারা করে তুলেছিল। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, প্রেম ও তত্ত্বজ্ঞানের শীর্ষস্থানীয় মুখপাত্র শায়খ সাদী (মৃত্যু ৬৯১হিঃ সন) ও খাজা হাফিজ (মৃত্যু ৭৯৩ হিঃ সন) এই মাটির নীচেই চির শয্যায় শায়িত। শায়খ সাদী তাঁর

বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'গুলিস্তা ও বুসতা' -এর জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। শায়খের সমাধিস্থলকে 'সাদিয়াহ্' বলা হয়। সেখানে দাঁড়িয়ে ফাতিহা পাঠ করার সময় তার কাব্যগাঁথার বেশ অনেকগুলো পংক্তি আমার হৃদয়-সায়রে ভাসতে থাকে।

দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন খাজা হাফিজ শিরাজী। ইশ্‌ক্, প্রেম ও তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ তার কবিতারাজি 'তরজুমানুল গায়ব' (অদৃশ্যবাণী) উপাধিতে ভূষিত হয়েছিল। তাঁর সমাধিস্থলকে 'হাফিযিয়া' বলা হয়।

আধুনিক শিরাজে জনবসতি গড়ে তোলা, এর সৌন্দর্যবর্ধন ও মসজিদ নির্মাণের মূলে 'যিন্দ' বংশের শাসক করীম খানের বিরাট অবদান রয়েছে। সাফাভীয়া বংশের পর যিন্দ বংশ ক্ষমতাসীন হয় এবং শিরাজে তাদের রাজধানী স্থাপন করে।

শিরাজ হচ্ছে অনেক বিখ্যাত পুরুষের জন্মস্থান। এই মাটি থেকেই আবির্ভূত হয়েছেন জামিআহ্ নিযামিয়াহ্, বাগদাদের প্রধান উস্তাদ আল্লামা আবূ ইসহাক শিরাজী (মৃত্যু ৪৭৬হিঃ সন) নাহ্ভ্ (ব্যায়াকরণ) শাস্ত্রের ইমাম আলী ইবনে ঈসা আবুল হাসান আর রাবয়ী' (মৃত্যু ৪২০হিঃ সন) প্রমুখ বিখ্যাত মনীষীবৃন্দ। শেষ যুগের বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে আল্লামা সাদরুদ্দীন শিরাজী (মৃত্যু ১০৫৯হিঃ সন)-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর দু'টি গ্রন্থ 'আল আসফারুল আরবাআহ ও 'শারহে হিদায়াতুল হিক্‌মাত' (সাদরা' নামে খ্যাত) আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন। আমীর গায়াসুদ্দীন মানসূরও হচ্ছেন শিরাজের অতি বিখ্যাত ব্যক্তিদের অন্যতম।

আমরা ইরানের সর্ব প্রাচীন ও ইতিহাস বিখ্যাত 'তাখ্‌তে জামশীদ'; দেখেছি। বাদশাহ প্রথম দারা এটাকে তার রাজধানী করেছিলেন। আজ হতে আড়াই হাজার বছর পূর্বে এটা ছিল সভ্যতা-সংস্কৃতির একটি বিরাট কেন্দ্র। ঐ যুগের বিস্ময়কর স্থাগত্য-নৈপুণ্য দেখে এযুগে স্থপতিরাও'থ' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। অসাধারণ উচ্চতা, বিরাট বিরাট শিলাখণ্ড উপরে উঠিয়ে অত্যন্ত কৌশলের সাথে খাঁজ কেটে একটির সাথে অন্যটিকে জুড়ে দেওয়া স্থপতিদের ইত্যাকার শিলা নৈপুণ্য মিসরের পিরামিডের কথা স্বরণ করিয়ে দেয়। এগুলো দেখে যে কোন পর্যটক মুগ্ধ না হয়ে পারে না। ইরান সরকার ১৯৭১ইং সনের অক্টোবর মাসে এখানেই 'রাজকীয় আড়াই হাযার বর্ষপূতি উৎসব' অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে পালন করেছিলেন। ঐ উৎসবে সমগ্র বিশ্বের রাষ্ট্র

প্রধান, প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রদূতেরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঐ উৎসবে উপলক্ষে যে অপরিসীম অর্থ ব্যয় হয়েছিল তার বিবরণ শুনলে সেটাকে 'আলফে লায়লার (আরব্য উপন্যাসের সহস্র রজনী উপাখ্যান) বলে মনে হবে। 'আখ্তে জামশীদ' শিরাজ থেকে মাত্র ৬০ কিলোমিটর দূরে অবস্থিত।

এই সমস্ত দালান কোঠা ও ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখে আমি অবাক বিস্ময়ে ভাবতে লাগলাম, কী করে পশুপালক আরব বেদুঈনরা এরূপ উন্নত সভ্যতা সংস্কৃতি ও জ্ঞানেগুণে সমৃদ্ধ ভূখণ্ডের উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলো? কী করে তারা জয়ী হলো এমন একটি জাতির উপর, যারা হাজার হাজার বছর ধরে বংশ-পরম্পরায় জনগণকে নেতৃত্বদান এবং বিরাট সাম্রাজ্য শাসন করে আসছিল? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আবার আমার অন্তরেই খুঁজে পেলাম। এটা ছিল তাদের ঈমানেরই ক্ষমতা এবং ইসলামী শিক্ষার প্রভাব। অন্য যে আর একটি কারণ এর পিছনে কাজ করছিলো তা হলো, ঐ উষ্ট্র চালক আরবরা ছিল অপসংস্কৃতির কুপ্রভাব ও আলস্যভরা আয়েশ আরামের বেড়াজাল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

শিরাজে আমরা সাইরাস হোটেলে অবস্থান করি। সাইরাস ছিলেন ইরানের একজন প্রখ্যাত শাহানশাহ্। তাকে ইরানের উন্নতি সমৃদ্ধি এবং শান-শওকতের প্রতীক বলে মনে করা হয়। কুরআন মজীদের সূরা কাহ্ফে 'যুলকারনায়ন' নামে যে ব্যক্তির উল্লেখ করা হয়েছে, কোন কোন পর্যালোচকের মতে তিনিই হচ্ছেন ইরানের মহান সাইরাস। ইয়াহুদীরা মহান সাইরাসকে তাদের মুক্তিদাতা বলে মনে করে। কেননা তিনি বুখ্তে নাস্র-এর পাঞ্জা থেকে ইয়াহুদীদেরকে মুক্ত করে ফিলিস্তিন ভূখণ্ড তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এই মহান সাইরাসের স্মরণেই ইরান সরকার আড়াই হাজার বর্ষপূর্তি উৎসব অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে পালন করেছেন। সাইরাস হোটেল ইরানের ঐ সমস্ত বড় বড় হোটেলের অন্যতম যেগুলোর সাজসজ্জা, পানাহার সামগ্রী, কর্মচারীদের লেবাস-পোশাক, চালচলন প্রভৃতিতে ইরানের প্রাচীন ঐতিহ্যের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়। আমরা 'সারায়ে মাশীরে' মধ্যাহ্ন ভোজন সারি। এই হোটেলটি যেন শিরাজের প্রাচীন সংস্কৃতির একটি জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। এর কর্মচারীরা সেই লেবাস পরে আছে যা সাফাভীদের যুগে, কিংবা প্রাচীন ইরানে শাহী খাদিমরা পরত।

শিরাজের অধিবাসীরা স্বভাবতই হাসিখুশী ও সংগীত প্রিয়। রাতের বেলা

যখন সমগ্র শহর গীত-লহরী ও রং বেরংয়ের আলোয় ভাসছিল তখন আমি হোটেলের ব্যালকনীতে বসে ছিলাম। না, বসে ছিলাম না বরং ডুবে গিয়েছিলাম স্মৃতিকাহিনীর অতল সমুদ্রে এবং অতীতের ইতিহাস ও কালচক্রের আবর্তন বিবর্তনের গভীরে। আমাদের চোখের সামনে অভিনীত হচ্ছিলো এমন এক নাটক যার অভিনেতা অভিনেত্রীরা অনবরতঃ পট পরিবর্তন করছিলো- একজনের স্থান দখল করে নিচ্ছিল অন্যজন। তখন কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো বার বার আমার স্মৃতিতে ভাসছিলো-

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلاَّ لَهْوٌ وَّلَعِبٌ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ٠

অর্থ ঃ "এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া কৌতুক ছাড়া কিছু নয়। পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন যদি তারা জানত।"-(২৯ ঃ ৬৪)।

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوْا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَا اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ٠

অর্থ ঃ ওরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? এবং দেখে না ওদের পূর্ববতীদের পরিণাম কি হয়েছে? শক্তিতে তারা ছিল ওদের অপেক্ষা প্রবল, তারা জমি চাষ করত; তারা তা আবাদ করত ওদের অপেক্ষা অধিক। তাদের নিকট এসেছিল তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ। বস্তুতঃ ওদের প্রতি জুলুম করা আল্লাহ্‌র কাজ ছিল না, ওরা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল।" - (৩০ ঃ ৯)

ইরানের এই সফর প্রভাব, বৈশিষ্ট্য ও ফলাফলের দিক দিয়ে আমাদের জন্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইরানের সভা-সমিতি ও বৈঠক-মজলিসে এ নিয়ে খুব আলাপ-আলোচনা হয় এবং রেডিও- টেলিভিশনে এর বিবরণাদি ফলাও করে প্রচার করা হয়। আমার বিশ্বাস, এই আলোচনা-পর্যালোচনা দ্বারা দর্শক ও পর্যবেক্ষকরা আমাদের সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পেরেছেন এবং এর শিক্ষাগত, সামাজিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বও মোটামুটি উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

একটি পর্যালোচনা

এবার এ সফর সম্পর্কে আমি আমার ব্যক্তিগত মতামত অতি সংক্ষেপে পেশ করছি। এই সফরের গুরুত্ব ও মর্যাদা শুধু এই নয় যে, এটা ছিল কয়েকজন মুসলমানের, তাদের গ্রাম দেশীয় মুসলমান ভাইদের দেশে একটি শুভেচ্ছা সফর, বরং প্রভাব প্রতিপত্তি ও ফলাফলের দিক দিয়ে এই সফর ছিল প্রাচীন নিদর্শন প্রত্যক্ষকরণ কিংবা শুভেচ্ছা-প্রদর্শনমূলক যে কোন সফরের চাইতে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও ফলদায়ক, আমরা প্রথমে এই সফরের উপভোগ্য ও উল্লেখযোগ্য দিকগুলোর প্রতি ইংগিত প্রদান করা জরুরী মনে করছি। কেননা এগুলোর মধ্যেই মুসলিম জাতির নতুন কর্মক্ষেত্র এবং তাদের আশার নতুন আলো পরিলক্ষিত হচ্ছে। আর এটাকেই মনে করা যেতে পারে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পূর্ব লক্ষণ। আমি ঐসমস্ত দিকগুলোর প্রতিও ইংগিত করবো·যেগুলো অবশ্যই বিস্ময়ের কারণ হবে তবে এক্ষেত্রে কিছুটা উদার দৃষ্টি ও প্রশস্ত মনোবৃত্তির প্রয়োজন; সাথে সাথে প্রয়োজন কথকের উপর আস্থা স্থাপনেরও। আমাদের ইরানী ভাইরা অত্যন্ত মহানুভব এবং ভদ্র মানসিকতার অধিকারী। তাই আমারও দৃঢ় আশা, ইরান অবস্থানকালে আমরা যা অনুভব করেছি, যে সমস্ত অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি তা সোজাসুজি প্রকাশ করার মধ্যে তারা আমাদের সৎমনোবৃত্তির দিকটি বিশেষভাবে বিবেচনা করে আমাদের এ বক্তব্যকে স্বাগত জানাবেন।

১. ইরান সফরে আমরা যে জিনিষটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি এবং যা আমাদেরকে যারপরনাই আনন্দিত ও উৎসাহিত করেছে তা হলো, ইরানীদের ঐকান্তিক ভ্রাতৃত্ব প্রেরণা এবং বিশ্বজনীন ইসলামী ঐক্য ও পরস্পর সহযোগিতার প্রতি আন্তরিক আগ্রহ-উদ্দীপনা। তারা ইসলামের মূলনীতির উপর ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ আগ্রহ উদ্দীপনাকে বাস্তব রূপ দিতে চান। আমি পরিষ্কার ভাষায় স্বীকার করছি যে, এখানে আসার পূর্বে ইরানীদের ঐক্য ও সহযোগিতার এই আগ্রহ-উদ্দীপনা, বিশ্বের সমগ্র মুসলমানের সাথে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং তাদেরকে আপন করে নেওয়ায় তাদের এই মনোবৃত্তির কথা আমার প্রায় অজানাই ছিল। আমি ভাবতে পারিনি যে, আমাদের ভাইরা বর্তমানে বিশ্বব্যাপৃত ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে এভাবে সারিবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। আজ এই ধর্মহীনতা বিশ্বের সমগ্র ধর্ম ও সমগ্র চারিত্রিক নীতিমালার বিরুদ্ধে বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ব্যাপারে

শিয়া', সুন্নী, হানাফী, শাফী', মুকাল্লিদ, মুজতাহিদ-সবাই একই সমতলে। ইরানে আমাদের প্রত্যেকটি বৈঠকের এই একটি মাত্র বিষয়বস্তু ছিল। এ দিয়ে যেমন আলোচনার সূচনা হত তেমন পরিসমাপ্তিও ঘটত। এটা নিঃসন্দেহে একটা উৎসাহ ব্যঞ্জক ও প্রসংশনীয় উদ্দীপনা। ইসলামী বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব সুদৃঢ় করণে যারা আগ্রহী তারা আমাদের ইরানী ভাইদের এই উৎসাহ উদ্দীপনা থেকে অনুপ্রাণিত হতে পারেন এবং তাদের এই মহান মনোবৃত্তিকে ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করতে পারেন। কেননা বিচ্ছিন্নতা ও বাড়াবাড়ি মুসলমান জাতিকে বারবার ক্ষতিগ্রস্থ করেছে, অন্যের কাছে পরাজিত ও পর্যুদুস্ত করেছে। হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে এই অনৈক্য ও পরস্পর বিচ্ছিন্নতাই মুসলিম ইতিহাসের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা 'বাগদাদ পতন' এর জন্ম দিয়েছে।৮ এই অনৈক্য ও বাড়াবাড়ি মুসলমানদের ইউরোপ জয় এবং শেষ সীমান্ত পর্যন্ত ইসলামী পতাকা উড্ডীন করার দুর্লংঘ্য বাধার সৃষ্টি করেছে। এ কারণেই ভারতের মুসলিম সাম্রাজ্য চিরতরে বিলীন হয়ে গেছে।

২. ইরানের অপর যে জিনিষটি আমাদের মোহিত করেছে তা হলো, ইসলামী ঐতিহাসিক দিকদর্শনাদির প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন, আরবী ভাষার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা, ইসলামী গ্রন্থাদি প্রকাশ, উলামাদের অতীত কীর্তিসমূহ পুর্নজীবিত করণ এবং কুরআনের উৎকৃষ্টতম লিখন ও মুদ্রণের প্রতি তাদের আগ্রহ-আসক্তি। আমরা ইরানে দুস্প্রাপ্য ধরনের কুরআনী হস্তাক্ষর সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব আরোপের নমুনা এবং কুরআন মুদ্রণের প্রতি ঐকান্তিকতা ও আগ্রহ দেখে, ইরানীরা কুরআনকে যে অত্যাধিক সম্মান ও মর্যাদা দেয় তা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি। সেখানে বিভিন্ন সভাসমিতি ও বৈঠকে কুরআন তিলাওয়াত করা হয় বিশেষভাবে মিসরী কারীদের তিলাওয়াতকৃত আয়াতসমূহ টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে শুনানো ব্যবস্থা করা হয়।

৩. আমরা ইরানীদের ধর্মীয় আত্মসম্মানবোধ ও আত্ম-সচেতনতা লক্ষ্য করেও আনন্দিত হয়েছি। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে সংগঠিত ষড়যন্ত্রমূলক আন্দোলন সম্পর্কে বেশ সজাগ ও সতর্ক। বাহাই মত,৯ যা ইরানেই আবির্ভূত হয়েছে, সেখানে আইনতঃ নিষিদ্ধ। বাহাই-মত এবং সেই সাথে কাদিয়ানিয়াতকেও সেখানে ইসলাম বহির্ভূত মত বলে মনে করা হয়। ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা এই দুই মতকে খুবই ঘৃণার চোখে দেখে। কমিউনিজম ও

নাস্তিকতাবাদের বিরুদ্ধে ইরানে যে ইসলাম-প্রিয়তা ও ইসলামের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ পরিলক্ষিত হয় তা মুসলিম দেশসমূহ-বিশেষ করে পাকিস্তানের জন্য শিক্ষণীয় ও অনুসরণযোগ্য। কেননা ইরানের সাথে পাকিস্তানের অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক রয়েছে।

৪. সুন্দর অনুপম আচরণ, মিষ্টি কথা, আতিথেয়তা, বিনয়, নম্রতা-এগুলো হচ্ছে ইরানীদের এমন সব স্বভাবগুণ, যা ইরান সফরকারী যে কোন মুসলিম পর্যটকের নজরে পড়বে। সে অনুভব করবে, যেন সে আপন সহোদরদের সাথে আপন মাতৃভূমিতেই রয়েছে। আমরা যে শহরেই গিয়েছি সেখানকার দয়িত্বশীল সরকারী কর্মকর্তা, অভিজাত ও সম্মানিত নাগরিক-বৃন্দকে আমাদের জন্য প্রতীক্ষারত দেখতে পেয়েছি। আমরা যদিও মটরগাড়ীর মাধ্যমে 'কুম' যাচ্ছিলাম, কিন্তু সেখানে পৌছতে আমাদের বেশ বিলম্ব ঘটে, অথচ আমরা দেখতে পাই যে, দায়িত্বশীল সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ উলামা ও সম্মানিত ব্যক্তিবৃন্দ রাস্তার উভয় দিকে প্রখর রৌদ্রে দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। এই সংক্ষিপ্ত সফরে আমরা বার বার এ ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

শেষ পর্যন্ত আমি আমার ইরানী ভ্রাতৃবৃন্দ ও উলামা সমাজ ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করছি।

১. মানুষ এবং সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির মূল লক্ষ্য এবং আম্বিয়া (আ.)-এর আবির্ভাব এবং আসমানী গ্রন্থসমূহ নাযিলের আসল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এই দুনিয়ায় আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত উপাসনা করা হবে এবং একমাত্র তাকেই উপাস্য বলে মনে করা হবে। আনুগত্য, বিশ্বস্ততা, বিষয় এবং আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতা এবং তার উপাসনার অনুভূতি হচ্ছে এমন সব গুণাবলী যা বান্দার মধ্যে তখনই সৃষ্টি হয় যখন সে আল্লাহ্কে এক এবং শরীক বিহীন মনে করে। আম্বিয়া (আ.)-এর আবির্ভাবের লক্ষ্যও এই ছিল যে, তারা সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে সম্পৃক্ত করে দেবেন, মানব জাতিকে দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে তাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি আকৃষ্ট করবেন-ঝুঁকিয়ে দেবেন তাদের মাথা তাদের প্রতিপালকের সামনে। এই ছিল আম্বিয়া (আ.)-এর জীবনের লক্ষ্য, মনের ঐকান্তিক বাসনা এবং যাবতীয় কর্ম প্রচেষ্টার প্রতিফলন। এর দ্বারাই তাদের আত্মার শান্তি ও হৃদয়ের তৃপ্তি লাভ হত। তারা এজন্য দুনিয়ায় আসেননি যে, স্রষ্টাও সৃষ্টির মধ্যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবেন, কিংবা মানুষকে কোন বিশেষ

পরিবারের সাথে সম্পর্কে কিংবা কোন বিশেষ বংশের বাধ্য-অনুগত কিংবা কোন বিশেষ খান্দানের সাথে চির দিনের জন্য সম্পর্কিত করে দিয়ে যাবেন।

রক্তের পবিত্রতা, বংশের গৌরব এবং পুত্র-পৌত্রদের জন্য মানব সমাজে আগাম গদী (আসন) প্রতিষ্ঠা করে যাওয়া, তাদের বড় বড় সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন, বংশ পরম্পরাগতভাবে যাতে তাদের নেতৃত্বে-কর্তৃত্ব বহাল থাকে সেজন্য আগেভাগে ব্যবস্থা অবলম্বন, এমনভাবে তাদের অর্থনৈতিক সুরাহার ব্যবস্থা করা, যাতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা প্রাচুর্যের মধ্যে কাল কাটাতে পারে-সর্বোপরি তাদের সম্পর্কে এমন কিছু আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত করে যাওয়া, যাতে তারা চিরকাল সর্ব ব্যাপারে সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে-(এগুলো) এমন মনোবৃত্তি যা শুধুমাত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী অতি উৎসাহী রাষ্ট্রনায়ক এবং পার্থিব সম্পদ লিপ্ত জড়বাদীরাই পোষণ করতে পারে। এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে বিভিন্ন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী প্রাচীন রাজ পরিবারসমূহের ইতিহাসে। আম্বিয়া (আ.) ছিলেন এসব বাতিল প্রবণতা থেকে একবারে মুক্ত, এসব ময়লা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শরীফে আম্বিয়া (আ.)-এর এইসব বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয় ভাষায় সর্ব সমক্ষে তুলে ধরেছেন।

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبَّانِيِّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ۔ وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ۔ اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۔

অর্থ ঃ "কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ কিতাব, হিকমত ও নবূয়াত দান করার পর সে মানুষকে বলবে যে, আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হয়ে যাও, এটা তার জন্য শোভন নয়, বরং সে বলতে 'তোমরা রাব্বানী (আল্লাহ্ওয়ালা) হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর। ফেরেশতাদেরকে ও নবীদেরকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করতে সে তোমাদেরকে নির্দেশ দেবে না। তোমাদের মুসলমান হওয়ার পর সে কি তোমাদেরকে কাফির হতে বলবে? -(৩ ঃ ৭৯-৮০)

একারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এমন সব কাজকর্ম ও আচার-আচরণ থেকে সদাসতর্ক থাকতেন যার মধ্যে গায়রুল্লাহ্ ('আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যে কোন বা

বস্তু)-এর জন্য কোন আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও সম্মান-সমীহ্ সৃষ্টির সন্দেহ-পর্যন্ত দেখা দিতে পারে কিংবা কেউ বান্দা ও তার উপাস্যের মধ্যে মাধ্যম হওয়ার সুযোগ খুঁজতে পারে। গায়রুল্লাহ্‌র জন্য এই সম্মান ও পবিত্রতার রেশটুকু সৃষ্টি হোক- চাই তা সম্পর্কিত হোক তাদের নিজেদের সত্তার সাথে কিংবা কোন ঐতিহাসিক নিদর্শন, কোন উপাসনালয়, অথবা সমাধির সাথে-তারা তাও অনুমোদন করতেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "হে আল্লাহ্, তুমি আমার কবরকে এমন মূর্তি বানিয়ো না যার পূজা করা হয়। ঐ সব লোকের উপর আল্লাহ্‌র গযব যারা নিজেদের নবীদের কবরকে সিজদাস্থলে পরিণত করেছে।[৯] এরপর তিনি বলেছেন, ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ, কেননা তারা তাদের নবীদের কবরকে সিজদাস্থলে পরিণত করেছে।[১০] অপর এক হাদীসে আছে "لا تجعلوا قبري عيدا" আমার কবরকে উৎসবস্থলে (মেলায়) পরিণত করো না।[১১] এই মর্মের আরো অনেক হাদীস আছে।

অতীত জাতিসমূহের ইতিহাস ও আচার-আচরণ থেকে একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যে জাতি বা জনগোষ্ঠী তাদের দর্শনীয় স্থান ও সমাধিসমূহকে উৎসবস্থলে পরিণত করতে শুরু করেছে তারা শেষ পর্যন্ত হরমে মুকাদ্দাস এবং মসজিদ (উপাসনালয়) থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছে, জামাআতবদ্ধ হয়ে নামায আদায় করার গুরুত্ব ভুলে বসেছে এবং প্রত্যেকটি বিপদ-আপদের সময় আল্লাহ্‌র সামনে যে নত হয়, তার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হয় এবং তার ইবাদত-উপাসনায় মনপ্রাণ ঢেলে দিতে হয় সে বিশ্বাসও (তারা) হারিয়ে বসেছে।[১২]

ইরান অবস্থানকালে আমরা মসজিদসমূহের অনুপাতে সমাধি সমূহকেই অধিক সজ্জিত, জাঁকজমকপূর্ণ ও জনাকীর্ণ দেখতে পেয়েছি। এতে অনুমিত হয়েছে যে, এই সমস্ত সমাধির সাথে জনসাধারণের বিস্ময়কর ধরনের আন্তরিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। যখন একজন পর্যটক সাইয়িদিনা ইমাম আলী রেযার সমাধিতে হাযির হয় তখন মনে হয়, যেন সে কোন সমাধিপার্শ্বে নয় বরং হাজীতে পরিপূর্ণ হরম শরীফে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে সব দিক থেকে কান্নার রোল ভেসে আসছে, স্ত্রী-পুরুষ-আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে লোকে লোকারণ্য, নানা ধরনের সাজসজ্জা, ও জাঁকজমক, ধনাঢ্য,

প্রতিপত্তিশালী তথা সর্বশ্রেণীর দর্শনার্থীদের স্তূপীকৃত নযর নিয়ায ও উপহার উপঢৌকন এবং আরো কত কিছু। হরমে মক্কী ও হরমে মাদানী এবং এই মাযারের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই বললেই চলে। কিঞ্চিৎ পার্থক্যসহ কুমে অবস্থিত সাইয়িদা মাসূমার সমাধির অবস্থাও তাই।

ইরানে বিরাট বিরাট মসজিদ রয়েছে। স্থাপত্য শিল্পের দিক দিয়ে কোন মসজিদ একেবারে অতুলনীয়। কিন্তু সমাধি ও মাযারসমূহের অনুপাতে সমস্ত মসজিদের অবস্থা খুবই করুণ। এগুলোতে মানুষের কোন ভীড় নেই। এগুলোর প্রতি জনসাধারণের কোন আবেগ-উচ্ছ্বাস্ বা আন্তরিক সম্পর্কে আছে বলেও মনে হয় না। যাদেরকে মাযারে দেখা যায় তাদেরকে মসজিদে দেখা যায় না বললেই চলে। আমরা ইস্না আশারী মাযহাবের ইবাদতের বিশেষ বিশেষ মাসায়েল, 'জামাআ' বায়নাস্ সালাতায়ন (দু' ওয়াক্ত নামায এক সাথে পড়া) এবং ইমামতের নাযুক শর্তাদি সম্পর্কে অনবহিত নই। আমরা অবশ্য জানি যে, ফিক্হে জাফরীর মধ্যে এমন অনেক সুযোগ রয়েছে যা আহ্লে সুন্নাতের মাযহাবসমূহে নেই। এতদসত্ত্বেও আমরা মনে করি, এটা পুরাপুরি সম্ভব ছিল যে, মসজিদসমূহে নামাযীদের, এর চাইতেও অধিক ভীড় হত এবং সমাধিস্থল ও মাযারসমূহের অনুপাতে মসজিদেই অধিক আহাজারি ও কান্নার রোল শোনা যেত। আশাকরি, ইরানের উলামা এবং যারা ধর্মীয় আত্মসম্মানবোধ রাখেন (এবং এদের সংখ্যা মোটেই কম নয়) তারা এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেবেন। যাতে বাইরে থেকে আগত লোকেরা অন্ততঃ মসজিদ ও মাশহাদ (সমাধিস্থল)-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে।[১৩]

আহ্লে বাইতকে সম্মান ও ভালবাসার ক্ষেত্রে অত্যাধিক বাড়াবড়ির ফলেই হযরত আলী (রা.) এবং আহ্লে বাইতের ইমামদের প্রতিকৃতিসমূহ ঘরে মসজিদে সর্বত্রই ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। হুযূর আকরাম (সা.)-এর প্রতিকৃতি যেখানে সেখানে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। বিশেষ করে তেহরানস্থ মসজিদে সিপাহ্সালারে যেরূপ আকর্ষণীয় ভংগিতে বিভিন্ন ছবি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে তাকে দর্শকমাত্রেই মূর্তিপূজা ও শিরকের দিকেই ঝুঁকে পড়ার অনুপ্রেরণা পাবে। অতীতের জাতিসমূহ তাদের পুণ্যবান পুরুষদের প্রতিকৃতি ও প্রতিমূর্তি নির্মাণের মাধ্যমে মূর্তিপূজার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিম জাতিকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করুন, দূরে রাখুন তাদেরকে যাবতীয় মুশরিকানা রসূম ও রিওয়াজ থেকে।[১৪]

১. আহলে বাইতের ইমামগণ চিরকালই মূর্খতার অন্ধকারে আলো বিতরণ এবং পথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বদান করে আসছেন। কোন দৃঢ় বিশ্বাসী মুসলমানেরই এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার অনুভূতি এই যে, ইমামদের প্রতি শিয়া বন্ধুদের প্রেমাসক্তি বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌছে যাওয়ার দরুন তাদের ভাবোচ্ছাস তাদের সুস্থ বুদ্ধি-বিবেচনাকে পরাভূত করে ফেলেছে। আর আমার ধারণা, তাদের এই প্রেমাসক্তি ও একদেশদর্শিতা ঐ সম্পর্কে ও আকর্ষণকে বেশ খানিকটা দুর্বল ও বিক্ষত করে দিয়েছে যা নবূয়াতে মুহাম্মদী ও যাতে মুহাম্মদী -এর সাথে প্রতিটি মুসলমানের থাকা উচিত। এটা তো আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, মুহাম্মদ (সা.) আনীত নবূয়াত এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র সত্তার কারণেই আহলে বাইত এরূপ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন। শুধুমাত্র ঐ কারণই আমারা তাদেরকে ভালবাসি, সম্মান করি, সমীহ করি।

সুতরাং লক্ষ্য করা যায় যে, ইরানে শেষ যুগে যে সমস্ত 'নাতীয়া (রাসূলুল্লাহ্-এর প্রসংশায় রচিত কাব্যগীতি) রচনা করা হয়েছে (এর পরিমান খুব বেশী নয়) সেগুলোর মধ্যে ঐ জোশ-উচ্ছাস ও মনের আকুতি লক্ষ্য করা যায় না, যা লক্ষ্য করা যায় 'আহলে বাইত-এর প্রশংসায় রচিত গীতিকাব্যে কিংবা তাহাদের শাহাদতের উপর রচিত বিলাপ গাঁথায়-বিশেষ করে সাইয়িদিনা হযরত আলী মুরতাযা এবং হযরত হুসায়নের প্রশংসা, গুণাবলী অথবা আহলে বাইতের বিপদাপদের ফিরিস্তি বর্ণনামূলক ছন্দ কবিতায়। শিয়া বন্ধুদের এখানে সর্বত্রই নাতে রাসূল এবং আহলে বাইতের প্রশংসা গীতির মধ্যেই এই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উর্দূভাষায় আনীস ও দবীরের মর্সীয়া (বিলাপ গাঁথা) পড়ুন এবং এর সাথে স্বয়ং তাঁদের এবং ঐসব কবিদের নাতিয়া কালামের তুলনা করুন যারা তাদের স্বপক্ষীয় বা স্বমাযহাবী, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জিনিষের মধ্যকার পার্থক্য অনায়াসে বুঝে নিতে পারবেন। কমবেশী এই পার্থক্য সীরাতে নববী এবং মানাকিবে (প্রশংসাগাঁথা) আহলে বাইত-এর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এই জিনিষটি আমরা ইরানেও দেখেছি সেখানে মাশাহাদ ও কবরসমূহের প্রতি যে আসক্তি ও আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়, মসজিদসমূহের প্রতি তা হয় না। সেখানে নাজাফ ও কারবালা এবং 'উতাবাতে আলী সফরের যে আগ্রহ দেখা যায় হারমায়ন শারীফায়ন-এর যিয়ারত কিংবা হজ্জের সফরের প্রতি তা দেখা যায় না।[১৫]

আহ্লে বাইত-এর প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা, আসক্তি এবং সম্মান প্রদর্শনের যে চক্ররেখা ঐ আধ্যাত্মিক কেন্দ্রের চারদিক ঘিরে আঁকা হয়েছে এবং তাদের প্রশংসা ও গুণ বর্ণনায় যেভাবে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে তাতে আশংকা হয়, না জানি এটা আবার ইমামতকে নবুয়াতের প্রতিদ্বন্দ্বী করে না ছাড়ে। যদি এমনটিই হয় তাহলে এই পুরো জীবন ধারাটাই এমন খাতে প্রবাহিত হবে যা 'শ্রেষ্ঠ নবী ও শেষ নবী-এর অনুকরণ করে নয় বরং তাঁর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে করতে এগিয়ে যাবে।

এই ধ্যান-ধারণার প্রভাব ও ফলশ্রুতি কাব্যে, সাহিত্যে এবং চিন্তাধারায় প্রকাশিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। আমি এর বিস্তারিত বর্ণনায় যেতে চাই না, তবে আমার সুবিবেচক ইরানী ভাইরা যদি তাদের অন্তরের স্পন্দন অনুভব করার চেষ্টা করেন তাহলে বুঝতে পারবেন-চাই তাদের শতকরা শতজন এই সমস্ত কথার সাথে একমত হোন অথবা না হোন- এগুলো তাদের প্রতি, মূল বিষয়টিকে আপাদমস্তক ভেবে দেখার আহবান জানাচ্ছি। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আহ্লে বাইতের ইমামগণ ধর্ম ও বিশুদ্ধ তাওহীদের আহবান জানানোর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঠিক উত্তরাধিকারী ছিলেন। তারা এমন সব জিনিষেরই শত্রু ছিলেন, যা সৃষ্টিকে স্রষ্টা থেকে দূরে ঠেলে দেয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যে ধর্ম নিয়ে দুনিয়ায় এসেছিলেন, আহ্লে বায়তের ইমামরা ছিলেন সে সম্পর্কে অত্যন্ত সংরক্ষণশীল। তারা এমন কোন জিনিষকে কখনো সহ্য করতেন না যা স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ককে দুর্বল করে দেয় কিংবা এক সৃষ্টিকে অন্য সৃষ্টির মধ্যে মগ্ন করে ফেলে। তাদের আহবান ও প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল সৃষ্টির পরিবর্তে স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপন, দুনিয়ার বাহ্যিক দিকের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন, সাধনা ও তাওয়াক্কুলের জীবন অবলম্বন এবং উপকারী ও কল্যাণকর জ্ঞান প্রচারে আত্মনিয়োগ।

মুসলমাদের দল-উপদল ও ফিরকাসমূহকে একই প্লাটফরমে নিয়ে আসতে হলে-বিশেষ করে শিয়া-সুন্নীদের মধ্যে ব্যবধানের যে দুস্তর পারাবার সৃষ্টি হয়েছে তার বিস্তৃতি কমাতে হলে, সম্পর্কের এই বিদ্যুৎসংযোগ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর রিসালাতের সাথে স্থাপন করতে হবে। কেননা তার সত্তাই হচ্ছে মুসলমানদের ধ্যান-ধারণার কেন্দ্র এবং তার নবূয়াত হচ্ছে তাদের মঙ্গল ও শান্তির উৎস। তিনিই হচ্ছেন সেই উজ্জ্বল প্রদীপ

যে সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করেছে। এটি হচ্ছে এমন একটি বিরাট সংস্কারমূলক কাজ যার জন্য অত্যন্ত দৃঢ় সংকল্প ও বিদ্যোৎসাহী সংস্কারক ও চিন্তাবিদের প্রয়োজন। যখনই এই কাজ সম্পন্ন হবে তখন ইসলামের চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক অতুলনীয় ও বিপ্লবাত্মক অধ্যায়ের সূচনা হবে। শুধুমাত্র এই নিখুঁত ও শক্ত ভিত্তির উপরই সত্যিকার ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এ ছাড়া যত পথ আছে সবই কৃত্রিমও মন গড়া।

২. যদি ইসনা আশারী বন্ধুগণ আন্তরিকভাবে চান যে, মুসলমানদের বিভিন্ন ফিরকা–একটি অন্যটির নিকটবর্তী হোক এবং তারা পরিষ্কার মন নিয়ে একটি মাত্র কেন্দ্রে একত্রিত হোক, তাহলে সাহাবায়ে কিরাম এবং রাসূলুল্লাহ্‌র সহধর্মিণিগণ সম্পর্কিত তাদের চিন্তাধারার মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে। কেননা ব্যাষ্টি ও গোষ্ঠীর প্রিয়ও সম্মানিত ব্যক্তিত্বের প্রতি যতক্ষণ পর্যন্ত সম্মান দেখানো না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত একদেশ দর্শিতামূলক কোন প্রচেষ্টাই কামিয়াব হবে না, হতে পারে না। আমি বুঝতে পারি না, এটা কি করে সম্ভব যে, দু'জন লোক একই লক্ষ্যের জন্য উৎসাহ–উদ্দীপনা আন্তরিকতা ও পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে পরস্পরের সাথে মিলে মিশে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে, অথচ এক সংগী অন্য সংগীর মাননীয়, বরণীয় এবং আস্থা ও বিশ্বাসের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অবাঞ্ছিত মন্তব্য করবে এবং তাকে বিভিন্ন ভিত্তিহীন অভিযোগে অভিযুক্ত করবে, এমন কি, ব্যঙ্গ–বিদ্রূপ করেও বিশ্বাস করবে যে, এটাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের পথ। আমাদের সকলেরই এ অভিজ্ঞতা আছে যে, আমাদের পিতা–পিতামহ, উস্তাদ শায়খ, এমন কি আত্মীয়–স্বজনের ক্ষেত্রে, এ ধরনের আচরণ কেউ করুক, তা আমরা সহ্য করতে পারি না, তাহলে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আমি, আপনি বা সে এ ধরনের আচরণ কী করে সহ্য করবে যারা আমাদের পিতা–পিতামহ, উস্তাদ শায়খ কিংবা যে কোন আত্মীয়–স্বজনের চাইতে অধিক প্রিয় ও সম্মানিত, যাদের জন্য আমাদের প্রাণ উৎসর্গীকৃত, যাদেরকে আমরা ধর্মের সত্যিকার সেবক এবং আঁ হযরত (সা.)–এর জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ বলে বিশ্বাস করি ?

উপরোক্ত প্রেক্ষাপট ছাড়া এই বিষয়ের প্রচারমূলক বিরাট গুরুত্বও রয়েছে এবং জ্ঞানগত মূল্য মর্যাদাও রয়েছে। কেননা মানুষ সাধারণভাবে যে কোন দাওয়াতের সত্যতা ও যে কোন মাযহাবের কল্যাণকামিতার সিদ্ধান্ত নেয় এই

দেখে যে, এই দাওয়াতের চারিত্রিক নমুনা কিরূপ, বাস্তব দৃষ্টান্ত কি, এই দাওয়াত তার প্রাথমিক যুগ থেকে কি ধরনের মানুষ তৈরী করে আসছে এবং এ ক্ষেত্রে কি কৃতিত্ব দেখিয়েছে সর্বোপরি এই দাওয়াত দমনকারীরা কি পরিমাণ সাফল্য লাভ করেছে? এটাই হচ্ছে শিক্ষক, সংস্কারক, নেতা, বিষয় বিশেষজ্ঞ, শিল্পী, বিজ্ঞানী সকলেরই সাফল্য ও প্রভাব বিস্তারের মাপকাঠি। যদি তারা তাদের প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এমন লোক তৈরী করেন যাদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কৃতিত্ব প্রকাশিত হয় তাহলে তাদের শ্রম যেমন সার্থক হয় তেমনি বিনা বাক্য ব্যয়ে তাদেরকে ঐ বিষয়ের ইমাম বা নেতা বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। আর যদি তাদের চেষ্টার ফলাফল সীমিত বা নামে মাত্র হয়, তাদের অনুগামীদের ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বৃথা যায়, শিষ্যরা গুরুদের চোখ বন্ধ করার সাথে সাথে তাদের যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে বিফল প্রমাণিত করে তাহলে এই উস্তাদ ও গুরুজনদেরকে যথাক্রমে তাদের শিক্ষাদান ও শিক্ষগ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যর্থ বলেই মনে করা হয়।

এ ক্ষেত্রে ঐ প্রশ্নকারীকে সত্যাশ্রয়ীই বলতে হবে, যে এই প্রশ্ন উথাপন করে যে, যখন এই দাওয়াত (আহবান) এর উন্নতি ও সুফল তার সর্বশ্রেষ্ঠ উথাপনকারীর হাতেই বেশী দিন টিকে থাকতে পারেনি, (অর্থাৎ তা মানব মনে কোন রেখাপাত করতে পারেনি), এই দাওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীরা তাদের আন্দোলনের সূচনাকালেই ইসলামের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারেনি, আর যখন তাদের বহু কম লোকই সে পথে সুদৃঢ় থাকতে পেরেছে, যার উপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবায়ে কিরামকে রেখে গিয়েছিলেন তখন আমরা কী করে মেনে নিতে পারি যে, এর মধ্যে মানুষের অন্তর পবিত্র করার যোগ্যতা রয়েছে এবং তা মানুষকে পশুত্বের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে মনুষ্যত্বের শীর্ষস্থানে নিয়ে যাবে?

দাওয়াত ও তাবলীগের গুরুত্ব এবং সেই সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্তা, তাঁর চরিত্র ও জীবনেতিহাসের মাহাত্ম্য প্রমাণের জন্য এটা জরুরী যে, আমরা সাহাবায়ে কিরামের গুণাবলীকে স্বীকার করব, তাদের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব এবং তাদের বিশ্বস্ততা, পরস্পর প্রেম-ভালবাসা, সত্যের জন্য পরস্পর সহযোগিতা-ইত্যকার গুণাবলীকে উপরে তুলে ধরব এবং তাদের কৃতিত্বপূর্ণ ইতিহাসের সোনালী অধ্যায় থেকে উপদেশ ও অনুপ্রেরণা গ্রহণ করব-উপরন্তু আমরা এ রহস্যটিও অনুধাবন করব যে, তাদের কৃতিত্বপূর্ণ উজ্জ্বল ইতিহাসের

মধ্যে তাদের মানবিক দুর্বলতাগুলোর যেন এক একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কৃষ্ণবিন্দু ছাড়া আর কিছু নয়। সত্যিকার যুক্তি, প্রজ্ঞা ও বিবেকবুদ্ধি ও এ কথাই বলে। কুরআন মজীদ এবং বিশ্বস্ত ইতিহাস একথাকে সমর্থন করে। প্রথম যুগের মুসলমান এবং মুত্তাকী পুণ্যবানদের এই আচার-আচরণের প্রশংসা করে কুরআন বলছে-

وَ الَّذِيْنَ جَاؤُا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۔

অর্থ ঃ যাঁরা ওদের পরে এসেছে তারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদের এবং বিশ্বাসে অগ্রণী আমার ভাইদেরকে ক্ষমা কর এবং বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমার রব, তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। -(৫৯ ঃ ১০)

অতীত জাতিসমূহও ঐ বিশ্বাস পোষণ করত যে, তাদের নবীদের সহচর ও সাথীরা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লোক। তাঁরা সকলেই নিজেদের নবীদের বন্ধু ও সাহায্যকারীদের প্রতি অপরিসীম ভক্তি পোষণ করতেন। অতএব আমাদেরও কর্তব্য, সাহাবায়ে কিরামকে অন্তর দিয়ে ভালবাসা এবং ভক্তি করা। কেননা তারাই তো ছিলেন সেই নবীর সাথী ও সাহায্যকারী-যিনি বিশ্বের উপর সব চাইতে গভীর এবং চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে গেছেন। কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন-

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ ۔

অর্থ ঃ 'তিনি নিরক্ষরদের একজনকে পাঠিয়েছেন রাসূলরূপে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তার আয়াত, তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত, ইতিপূর্বে তো এরা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে। -(৬২ ঃ ২)

هُوَالَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۔

অর্থ ঃ ''তিনি তার রাসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন,

অপর সমস্ত দীনের উপর একে জয়যুক্ত করার জন্য। সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। –(৪৮ ঃ ২৮)

যদি আমরা বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকদেরকে পরস্পর নিকটতর করতে চাই তাহলে আমাদেরকে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে, আর সে প্রচেষ্টা হবে অবশ্যই বাস্তবভিত্তিক। এই মানসিকতা এবং এই স্বাভাবিক পথ ছাড়া যে পথই আমরা ধরবো তা হবে অস্বাভাবিক এবং লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ। আমি একবার আল্লামা তাকী আল্‌কুমী (যিনি এই লক্ষ্য হাসিলের জন্য ত্রিশ বছর যাবৎ কাজ করেছেন)–এর মজলিসে নিবেদন করেছিলাম, 'আমাদের এখানে (পাক–ভারতে) একটি কথা প্রচলিত আছে যে, এক হাতে তালি বাজে না, আমি এর সাথে আরো একটি যোগ করে বলতে চাই, 'শুধু দু'টি হাতও যথেষ্ট নয়, এ জন্য আন্তরিকতা, সংকল্প এবং স্থিরতারও প্রয়োজন। কেননা, যদি এক হাতে শৈথিল্য ও দুর্বলতা থাকে তাহলেও তালি বাজবে না। আমি এও বলেছিলাম, 'বিভিন্ন মাযহাবী লোককে পরস্পর নিকটতর করা কোন যান্ত্রিক কাজ নয়, মুখের চাইতে অন্তরের সাথে এবং বাহ্যিক বিষয়ের চাইতে আন্তারিক বিষয়ের সাথেই এর সম্পর্ক অধিক। এখনো এমন কোন গঁদ আবিষ্কৃত হয়নি যার দ্বারা কাগজের মত অন্তরকেও অন্য কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। এই প্রচেষ্টার মধ্যে অবশ্যই এমন আকর্ষণ থাকতে হবে, যাতে অন্তরসমূহ–এর শক্তি ও উষ্ণতার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। এজন্য পরস্পর বুঝাবুঝির প্রয়োজন। অবস্থাভেদে কিছু কিছু জিনিষের দাবী ছাড়তে হবে এবং কোন কোন ব্যাপারে ঔদার্যের পরিচয় দিতে হবে। একবার যখন দু'পক্ষের অন্তর এটাকে গ্রহণ করার জন্য তৈরী হয়ে যাবে তখন পরস্পর ভালবাসা ও আস্থার প্রবল স্রোতে ভুল বুঝাবুঝির সব জঞ্জাল আপনা আপনি ভেসে যাবে। কেননা পরস্পর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা সব অসম্ভবকেই সম্ভব করতে পারে।

৩. অবশেষে আমি একটি বিষয়ের প্রতি আমার ইরানী ধর্মপরায়ণ ও জ্ঞানীগুণী ভাইদের সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের ইরানী ভাইরা কুরআনকে অত্যন্ত সম্মান করেন, ভালবাসেন। কুরআনের সাথে তারা সম্পর্কহীন নন। কুরআনের স্বর্ণালী হস্তাক্ষর ও চিত্রলিপির ক্ষেত্রে তারা প্রাচীন যুগ থেকেই সকলের অগ্রগামী। তারা কুরআনকে তাদের পাঠাগার এবং যাদুঘরসমূহে বিশেষ যত্নের সাথে রাখেন

এবং এর উপর গর্ববোধও করেন। শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর পদ্ধতিতে ও সুনিপুণভাবে মুদ্রণের ক্ষেত্রে এখনো তারা কোন দেশের পিছনে নন। ইরানের প্রাচীন ও নবীন উলামা কুরআন মজীদের উচ্চমানের অনেক তাফসীর লিখেছেন, যার কয়েকটি পাক-ভারতেও বিখ্যাত ও বহুলভাবে পঠিত।

কিন্তু আমি মনে করি কুরআনের সাথে ইরানীদের সম্পর্ক আরো গভীর হওয়া উচিত। কুরআনের স্বাদ তাদের সর্বপ্রকার স্বাদের উপর জয়ী হোক, কুরআনের সজীবতা তাদের দেহমনে ছড়িয়ে পড়ুক, কুরআন তাদের দ্বারা বহুলভাবে পঠিত হোক, তাদের দেশে হাফিজে-কুরআনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাক, তারা সব কিছুর উপর কুরআনকে স্থান দিক, যে কোন বিষয় গ্রহণ অথবা বর্জনে, যে কোন জিনিষকে খারাপ অথবা ভাল বলার ক্ষেত্রে কুরআনকেই তারা একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করুক-আমি মনেপ্রাণে এ কামনাই করি। প্রকৃতপক্ষে এটাই আমাদের জ্ঞান, সাহিত্য, আকীদা, আমল, চরিত্র, আচার-আচরণ সব কিছুই একান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের ইরানী চিন্তাবিদ ও গুণীজনেরা উপরে বর্ণিত কিছু কিছু অবস্থাকে অন্তর দিয়ে অনুভব করেন এবং এগুলোর প্রচার প্রচলনের আবশ্যকতাও স্বীকার করেন। প্রকৃতপক্ষে এটা হচ্ছে একটি বিরাট সংস্কারমূলক কাজ এবং এ দায়িত্ব সেই ব্যক্তিরাই করতে পারেন যারা তাদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, সম্মান ও খ্যাতিকে চ্যালেঞ্জের মুখে, এমন কি নিজেদের জীবনকেও বিপদের মুখে ঠেলে দিতে দ্বিধাবোধ করেন না। এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, এই প্রচেষ্টার সাফল্য যে আনন্দ বয়ে নিয়ে আসবে তার চাইতে বড় আনন্দ আর কিছুই হতে পারে না। এই সাফল্যের কারণেই ইতিহাস তাদেরকে এমন সম্মান দান করবে যে সম্মানের চাইতে বড় সম্মান আর কিছুই হতে পারে না। ইসলামের উজ্জ্বল ললাটে এবং তার অবয়বে ধুলোবালির যে আস্তরণ পড়েছে, তারা প্রজ্জ্বোলে মুখশ্রীতে যে ঘনঘটা ছেয়ে গেছে তা দূর করা এবং প্রাথমিক যুগে ইসলামের যে অবস্থা ছিল সে অবস্থা পুনরায় সৃষ্টি করা কোন সহজ বা মামুলী ব্যাপার নয়, বরং এটা হচ্ছে একটা বিরাট সংগ্রাম, একটা গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক আন্দোলন। বিশুদ্ধ তাওহীদ এবং হাকীকতে দ্বীনকে আপন করে নেওয়ার জন্য কুরআনের দাওয়াত শুধু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে নয় বরং এই উম্মতের প্রত্যেকটি দল-উপদলের কাছেও পৌঁছতে হবে-এই কাজ কোন যুগ, কোন স্থান বা কোন কালের সাথে সম্পর্কিত নয়।

تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا
وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ

অর্থঃ "এ সো, সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারো ইবাদত করি না, কোন কিছুকেই তার শরীক করি না এবং আমাদের কেউ আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করে না।"-(৩ ঃ ৬৪)।

আমার ইরানী ভাইদের কাছে পুনরায় বিনীত নিবেদন, আমার উপরোক্ত কথাগুলো শুধুমাত্র আন্তরিকতা, শুভেচ্ছা এবং ইসলামী ঐক্যের প্রবল বাসনা এবং এক্ষেত্রে কিছুটা দায়িত্ব পালনের অনুভূতি থেকেই উৎসারিত হয়েছে। যদি আপনারা এগুলোর মধ্যে এমন কোন জিনিষ পান যার সাথে আপনারা একমত নন, কিংবা সত্যপ্রকাশে, ঘটনা বর্ণনায় অথবা নিছক শব্দ প্রয়োগ আমার পক্ষ থেকে কোন বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমি সেজন্য ক্ষমাপ্রার্থী। মানুষ মূলতঃ ভুলের প্রতিমূর্তি। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই যাবতীয় ভুলভ্রান্তি ও দোষত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

একটি জিজ্ঞাসা

ইরানী ভাইদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বে তাদের প্রতি আমার- আর শুধু আমার কেন, আরো অনেকেরই এই জিজ্ঞাসা যে, ইরানের মত একটি উর্বর দেশ এবং অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের লালনভূমি, যা এই সেদিনও জ্ঞান বিজ্ঞান তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে এমন সব প্রতিভার জন্ম দিয়েছে যারা তাদের জনসাধারণ মেধা ও যোগ্যতার কারণে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, এমন কি ইরানের ইতিহাসেও ইরান চরিত অধ্যয়নকারীদের কাছে অনুভূত হয়, যেন ইরান প্রতিভাশালী ছাড়া কোন মানুষের জন্মই দেয় নি। কিন্তু ইরানের শেষ অধ্যায়ের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপকারী যে কোন ব্যক্তি বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে প্রশ্ন করতে বাধ্য হবে, এই মহান দেশ মহান ব্যক্তিদের জন্মদান কেন বন্ধ করে দিল, ইসলামী জ্ঞান শিক্ষার সেই প্রতিভা , যোগ্যতা, ধীশক্তি, পর্যালোচনা শক্তি, এমন কি কাব্য ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইরান আজ কেন এরূপ পশ্চাৎমুখিতা ও পতনের শিকারে পরিণত হলো ? শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হল, বংশের পর বংশ চলে গেল, কিন্তু কেন এখানে এমন

একজন পণ্ডিত, সাহিত্যিক, কবি, গ্রন্থকার, পর্যালোচক, ভূগোলবিদ, চিকিৎসক বা বিজ্ঞানীরও আবির্ভাব হলো না, যিনি তার কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য সমগ্র বিশ্ববাসীর দৃষ্টি নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন? সত্যি বলতে কি, সেই হিজরী দশম শতাব্দীর পর থেকেই শূন্যতা বিকট আকারে ধারণ করেছে। তাই আল্লামা ইকবালের মত ইরানী কাব্য সাহিত্যের একান্ত ভক্ত ও ইরানী ইতিহাসের সত্যিকার ছাত্রও অভিযোগ করতে বাধ্য হয়েছেন–

نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے
وہی آب و گل ایراں، وہی تبریز ہے ساقی

'ইরানী গুলবাগে রুমী এলনা আর কেন সাকী !
হেথা তো সেই ফুল পাখি নীর সেই তাবরীয আজো বাকী ।

আমি ইরানী উলামা ও বিজ্ঞজনের কাছেও এই প্রশ্ন রেখেছি এবং এ সম্পর্কে তাদের সাথে মত-বিনিময় করেছি, কিন্তু কোন সদুত্তর আমি পাই নি। এই প্রশ্ন আমাদের অন্তরে বার বার উঠানামা করছে, তাহলে কি সে তাসাউফ (আধ্যাত্মবাদ) যা চিন্তাধারাকে উন্নীতকরণ, উৎসাহ-অনুপ্রেরণাকে বৃদ্ধিকরণ, জড়বাদের বিরোধিতা, সত্যের সন্ধান ও আত্মার উৎস উদ্‌গীরনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও মৌলিক ভূমিকা পালন করত তার পরিসমাপ্তিই ইরানীদের এই অধঃপতনের মূল কারণ? না কি এর কারণ হচ্ছে ধনসম্পদের প্রাচুর্য, জীবিকার সহজ প্রাপ্তি ও সাধারণ স্বচ্ছলতা, যার মধ্যে ইরানীদের দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের জীবন অতিবাহিত করছে ? এই প্রাচুর্যের কারণেই কি তাদের মধ্যে অধঃপতনের চিহ্নাদি যেমন, আরাম প্রিয়তা, সংকল্পে শিথিলতা ইত্যাদি ফুটে উঠেছে ? কিংবা এই অধঃপতন ও পশ্চাৎপদতার কারণ কি এই যে, ইরান জ্ঞান চর্চা ও মত প্রকাশের পথটি দীর্ঘদিন থেকে সীমিত ও সংকুচিত করে রেখেছে এবং অন্য যে কোন মত, পথ ও ব্যবস্থাকে দেশ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে আসছে ? প্রকৃত ঘটনা এই যে, সাফাভী যুগের পর থেকে ইরানীরা এমন একটি বদ্ধ অংগনে (চিন্তার ক্ষেত্রে) কাল কাটাচ্ছে, যেখানে বহি-র্জগতের জ্ঞান-দর্শনের ঢেউ, যা তাদের চিন্তা শক্তিকে চাঙ্গা করে তুলতে পারত এবং তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতে সাড়া জাগাতে পারত-এসে পৌছতে পারছে না।

দর্শন, ইতিহাস এবং বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের সাথে এই প্রশ্নের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সত্যকে অনুধাবন এবং জ্ঞানগত আলোচনা-পর্যালোচনার জন্য এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর বের করা খুবই জরুরী। আমরা ইরানীদের কাছ থেকেই এই প্রশ্নের উত্তর কামনা করি, যারা তাদের শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক যোগ্যতা এবং প্রতিভা ও ধীশক্তি দ্বারা দীর্ঘ কয়েক যুগ পর্যন্ত বিশ্ববাসীকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করে রেখেছিলেন। ইরানীদেরকেই এই গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে এবং নিজেদের গৌরবময় অতীতের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে। এর মধ্যেই ইরান, মুসলিম বিশ্ব তথা সমগ্র বিশ্বের মঙ্গল নিহিত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নবুয়াতই ঘুমন্ত ইরানকে জাগিয়ে তুলেছিল

[এটা হচ্ছে সেই আরবী ভাষণের অনুবাদ যা ১৩৯৩হিঃ সনের ১৩ জমাদিউল উলা মুতাবিক ১৯৭৩ইং সনের ১৫ জুন একটি অভ্যর্থনা সভায় পেশ করা হয়। সভাটি আয়াতুল্লাহ্ আল উযমা মির্যা মুহাম্মদ খলীল কামরাহ্য়ী-এর তেহরানস্থ যেরীনাল-এর বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভাষণটি আরবী থেকে উর্দূতে অনুবাদ করেছেন মওলভী আজমল ইসলাহী নাদভী।]

বন্ধুগণ,

ক্বারী সাহেব এখনই আপনাদের সামনে সূরা আলে-ইমরানের নিম্নের বিখ্যাত আয়াতটি তিলাওয়াত করেছেন।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ٠

অর্থঃ ''এবং তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র রশি দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ স্মরণ কর ঃ তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হলে। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তা হতে রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তার নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে সৎপথ পেতে পার। -(৩ ঃ ১০৩)

আমার সুবিজ্ঞ বন্ধু উস্তাদ আহমদ মুহাম্মদ জামাল উপরোক্ত আয়াতের প্রথম অংশ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আমি এর দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ -

وَ كُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ.

অর্থঃ ''তোমরা অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তা হতে রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তার নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার।-(৩ ঃ ১০৩)

-সম্পর্কে কিছু বলবো এবং উপস্থিত সবাইকে এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার জন্য আহবান জানাবো।

বন্ধুগণ, এই আয়াতটি সর্বদা আমাদের চোখের সামনে এবং আমাদের মনের মণিকোঠায় থাকা চাই। এই আয়াতের মধ্যে সেই মহান নিয়ামত (অনুগ্রহ)-এর উল্লেখ রয়েছে যার দ্বারা আল্লাহ্ মুসলমান জাতিকে ধন্য ও অনুগৃহীত করেছেন। আর হে ইরানবাসী, শুধু আপনারাই এই নিয়ামাতের অধিকারী নন, বরং আমরা পাক-ভারত উপমহাদেশের অধিবাসীরা-সত্যিকথা বলতে গেলে, এই বিশ্বের অধিবাসী সমগ্র মুসলমানরা এবং আরব উপদ্বীপেরও অধিবাসীরা-যাদের দেশ থেকে ইসলামের কিরণচ্ছটা প্রদীপ্ত হয়ে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে-এতে সমভাবে অংশীদার।

আমরা সবাই মূর্খতার অন্ধকারে ঘুরপাক খাচ্ছিলাম, না ছিলাম তাওহীদ ও নবূয়াত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, না খবর রাখতাম হাশর ও নশরের (পুনরুত্থান দিবসের), আর না ছিলাম চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত, বরং আমরা ছিলাম ভিত্তিহীন ধারণাকল্পনার মধ্যে বন্দী, পতিত হয়েছিলাম অত্যাচারী শাসনের যাতাকলে, চতুর্দিকে লাঞ্ছিত ও পদদলিত হচ্ছিলো মানবতা।

একদিকে স্বেচ্ছাচারী শাসক, আর অন্যদিকে জ্ঞান ও ধর্মের ইজাদার আলিম (পণ্ডিত) সমাজ মানুষের প্রভু হয়ে বসেছিল। আর সাধারণ মানুষ পূজা-অর্চনা ও অন্ধ অনুকরণে ছিল লিপ্ত । যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ۔

অর্থঃ 'তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতদেরকে ও সংসার বিরাগীদেরকে তাদের প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করেছে। (৯ ঃ ৩১)

ইসলাম এলো, ভূ-পৃষ্ঠের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়লো তার কিরণচ্ছটা। ইসলামের নিয়মাতের দরজা ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত। ইসলাম ছিল ঐ বৃষ্টির মত যা সাদাকালো ও দাস-প্রভুর মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। তা ছিল এমন

মেঘমালা যা সিক্ত করেছিল নিম্নভূমি, উচ্চভূমি, উদ্যান, প্রান্তর সব কিছু। এই নিয়ামতের চাইতে বড় নিয়ামাত আর নেই, এমন কি, এটা হচ্ছে জীবনের যাবতীয় স্বাদ-আহ্লাদ এবং শান্তি ও মঙ্গলের উৎস। ইসলাম যদি বিশুদ্ধ তাওহীদ এবং ঈমানরূপী নিয়ামত না হত তাহলে এটাও হত একটা কঠিন শাস্তি, হত জাহান্নামে নিয়ে যাবার একটা সেতু।

আল্লাহ্ ইসলাম দ্বারা আমাদের ধন্য করেছেন। এজন্য তার লাখ লাখ শোকর। এই নিয়ামত লাভ করার পথে আমরা নবী করীম (সা.)-এর সত্তা, তাঁর আবির্ভাব, তার রিসালত, তাঁর জিহাদ ও সংগ্রামের কাছে যারপর নাই ঋণী।

একথা বলা মোটেই অসঙ্গত নয় যে, যদি নবী করীম (সা.) না হতেন, তাঁর আসহাব এবং আহলে বাইত না হতেন, প্রাথমিক যুগের ইসলামের সেই দাওয়াত বহনকারীরা না হতেন, ইসলামের দাওয়াত প্রচারে ও প্রসারের কাজে আত্মনিবেদনকারী মুজাহিদরা না হতেন তাহলে আজ না ইসলাম ইরানে কোন অস্তিত্ব থাকত, আর না অস্তিত্ব থাকত ইসলামী হিন্দ, ইসলামী মিসর, ইসলামী সিরিয়া অথবা ইসলামী অন্য কোন দেশের। এমন কি যে আরব উপদ্বীপ আজ আমাদের ভক্তি ভালবাসার কেন্দ্র, যেদিকে মুখ করে আমরা নামায পড়ি তারও কোন অস্তিত্ব থাকত না-সর্বোপরি থাকত না আপনাদের এবং আমাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক। আমরা দূর প্রাচ্যের বাসিন্দা, আর আপনারা ইরানের। শুধু আমাদেরকেও ও আপনাদেরকেই নয়, হুযূর (সা.) বিশ্বের সব দেশ ও সব জাতির মধ্যে এমন এক বন্ধনের সৃষ্টি করে গেছেন যার ফলে বিভিন্ন হৃদয় ও বিভিন্ন মস্তিষ্ক পরস্পরের সাথে লেনদেন ও সংযোগ সাধনের সুযোগ পেয়েছে, একের ধ্যান-ধারণার সাথে অন্যের ধ্যান-ধারণা মিলিত মিশ্রিত হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে জন্ম নিয়েছে নতুন নতুন জ্ঞান ও দর্শন। বিদ্যার একটি ঝরনা ভারতে প্রবাহিত হচ্ছিল, অন্যটি ইরানে। দু'দেশের মধ্যে কত দূরত্ব। এভাবে আরো কত ঝরনা কত জায়গায় প্রবাহিত হচ্ছিল তার হিসাব কে রাখে? হাজার হাজার বছর পূর্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে সব ঝরনা আপন আপন সংকীর্ণ পথে ঝির ঝির করে প্রবাহিত হচ্ছিলো, ইসলাম এসে সেগুলোর বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত স্রোতধারাসমূহকে একটি বিরাট স্বচ্ছ প্রবল ধারায় রূপান্তিত করেছে এবং সেটাকে একটি মহান ও সার্বজনীন লক্ষ্যে ব্যবহার করেছে। ফলে তা মানবতার জন্য অত্যন্ত

কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে। ইসলামেরই মাধ্যমে ভারতীয়, ইরানী, আরবী ও আজমী চিন্তাধারা একত্রিত হয়ে এমন ব্যাপকভাবে মানুষের শান্তি ও মংগলের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে যে, মানবজাতির সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। ইরানীদের সৌন্দর্য প্রিয়তা, চিন্তাধারার উদারতা, সূক্ষ্ম অনুভূতি শক্তি, আরবদের স্বভাবের দৃঢ়তা ; বিদ্যোৎসাহিতা, চিন্তার বাস্তবতা এবং সেই সাথে ইসলামী আকায়েদ ও আমলের পরস্পর মিলন যে বিরাট শক্তির রূপ নিয়েছিল এবং তার যে ব্যাপক ও বিস্ময়কর ফলশ্রুতি দেখা গিয়েছিল তার দৃষ্টান্ত মানবেতিহাস ইতিপূর্বে আর কখনো প্রত্যক্ষ করেনি।

যখন ইরান তার গভীর নিদ্রা থেকে জেগে উঠল, তার যোগ্যতা প্রস্ফুটিত হল, তার স্তিমিত অগ্নিস্ফুলিংগ পুনরায় জ্বলে উঠল তখন মনে হল যেন অসাধারণ প্রতিভাশালী ও ইতিহাস বিখ্যাত লোকদের জন্মদানের জন্যই এই ভূখণ্ডকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যেন জ্ঞান ও সাহিত্য এর অস্থিমজ্জায় মিশে আছে, যেন সৌন্দর্য প্রিয়তা ছড়িয়ে আছে এর জলবায়ুতে এবং তা এমনভাবে যে, জ্ঞানী, সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী, সূফী, শিক্ষক ও গ্রন্থকার ছাড়া অন্য কারো জন্মাবার কোন পরিবেশই যেন এ ভূখণ্ডে আর বাকি নেই। ফিকাহ-হাদীস, কাব্য সাহিত্য ও রচনা গ্রন্থকার ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সংখ্যাও ইরানে অপরিসীম। আল্লাহ্ই জানেন, পাক-ভারতের মত আর কত দেশ ইরানের এই অতুলনীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি, এই অপরিসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকে নিজেদের তৃষ্ণা মিটিয়েছে, আস্বাদন করেছে এই মজাদার কাব্য সাহিত্য, গ্রহণ করেছে ইরানীদের শিষ্যত্ব এবং এদের অনুসরণ ও অনুকরণেকে গর্বের বিষয় বলে মনে করেছে। কিন্তু এই সব অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব, যাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং কাব্য সাহিত্য সমগ্র বিশ্বকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করেছিল তারা ইসলাম ও দাওয়াতে ইসলামেরই ফসল। সেই সত্য সনাতন ধর্মই তাদের জন্ম দিয়েছে, যে ধর্ম নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)।

আমি এটাকে আমার সৌভাগ্যই মনে করি যে, ইসলাম ও উখুওয়াতে ইসলাম (ইসলামী ভ্রাতৃত্ব)-এরই ছত্রছায়ায়ই আমি আপনাদের সাথে এখানে মিলিত হয়েছি। আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমগ্র মুসলমান এই ইসলামী বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের জন্য আজ পাগলপারা ! কিন্তু একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, দুনিয়া আখিরাতের যাবতীয়

সৌভাগ্যের উৎস হচ্ছে ইসলাম এবং সেই সাথে মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্রসত্তা, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে পথভ্রষ্টতার পর পথের দিশা, লাঞ্ছনার পর সম্মান এবং অসচ্ছলতার পর সচ্ছলতা দান করেছেন এবং অনৈক্য ও অশান্তির পর আমাদের ধন্য করেছেন ঐক্য, শান্তি ও মংগল দ্বারা।

ইসলামী সভ্যতা ছাড়া আমাদের কোন সভ্যতা নেই, ইসলামী ইতিহাস ছাড়া আমাদের কোন ইতিহাস নেই, ইসলাম প্রদত্ত সম্মান ও মর্যাদা ছাড়া আমাদের কোন সম্মান ও মর্যাদা নেই। আমরা সবাই মুহাম্মদ (সা.)-এর তুফায়েলেই জীবিত আছি। তাঁর নবুয়াত একটি নবযুগের সূচনা করেছিল। আদম সন্তানদের মধ্যে যিনিই সৌভাগ্য ও মংগলের কিছু ছোঁয়াচ পেয়েছেন- চাই তিনি আলী বিন আবী তালিব (রা.)-এরই মর্যাদাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি হোন না কেন-তিনি তা পেয়েছেন সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্রই মাধ্যমে। তিনি না হলে না কেউ ধর্মের ব্যাপারে কোন প্রাকৃষ্টতা অর্জন করতে পারত, না ঈমান ও ইয়াকীনের কোন অংশ কারো ভাগ্যে জুটত। আর না সামনে আসত এই বিস্ময়কর মুক্তি আন্দোলন যা ইতিহাসের একটি গর্বের বিষয় এবং যেজন্য মুসলমানরাও গৌরবান্বিত। বন্ধুগণ, চতুর্দিকেই বিপদ বাধা। সব রাস্তাই বন্ধ। শুধুমাত্র একটি রাস্তা আছে যা আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা.)-এর মাধ্যমে উন্মুক্ত রেখেছেন। কুরআন বলে,

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ ٠

অর্থঃ " ইসলাম আল্লাহ্র নিকট একমাত্র দ্বীন। -(৩ ঃ ১৯)

আল্লাহ্ তা'আলার শুকর যে, আমরা আরব-অনারব সবাই সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ (সা.)-এর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি এবং আমাদের জ্ঞানগত, বুদ্ধিগত, চিন্তা ও বিশ্বাসগত এবং সভ্যতা ও সাংস্কৃতিগত সম্বন্ধ তাঁর সাথেই স্থাপন করি। আমাদের প্রত্যেক লোক তাঁরই হিদায়েতের আলো থেকে আলোকিত এবং তাঁরই প্রজ্ঞা থেকে উপকৃত।

ইসলামী উম্মতের মধ্যে যতক্ষণ এই বাস্তবতার জ্ঞান থাকার এবং যতক্ষণ তারা এই আদর্শকে শক্ত করে ধরে রাখবে ততক্ষণ না তরা-পথভ্রষ্ট হবে, আর না পরিণতি হবে বিপদ-বাধার শিকারে।

শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রতি আপনাদের আন্তরিকতাপূর্ণ আদর আপ্যায়ন ও ভ্রাতৃত্বসুলভ মধুর ব্যবহারের জন্য কায়মনে শুকরিয়া আদায় করছি এবং পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা জানাচ্ছি, যেন তিনি আমাদের ঈমানের পরিপূর্ণতা দান করেন, আমরা যেন ঈমান নিয়ে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারি এবং আমাদের নাম যেন ঐ সমস্ত ভাগ্যবান লোকদের তালিকাভুক্ত হয় যাদের চেহারা হবে কিয়ামতের দিন আনন্দে উজ্জ্বল, খুশীতে উদ্ভাসিত।

এখন প্রশ্ন শুধু ধর্ম ও ধর্মহীনতার

[ইরানের বিখ্যাত আলিম আল্লামা শারীআত মাদারী তাঁর বাসভবনে রাবিতার প্রতিনিধিদলের সম্মানে একটি অভ্যার্থনা সভার আয়োজন করেন। তাঁর ইশারা ও ইংগিতে সে সভায় শায়খ সাঈদ আল্–নুমানী প্রতিনিধিদলকে অভ্যর্থনা জানিয়ে একটি বক্তৃতা দেন। তাতে তিনি একতা ও ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, "যদি আমরা এখনো অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার কৃষ্ণ পাতাগুলো গুটিয়ে না নিই তাহলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না। আমাদের যাত্রা পুনরায় ঠিক সেভাবে শুরু করতে হবে যেভাবে করেছিলেন আমার পূর্ববর্তী মহান ব্যক্তিরা। এ পথে আমাদেরকে অসাধারণ দৃঢ়তা, অসামান্য ত্যাগ ও কুরবানীর পরিচয় দিতে হবে। কেননা আমাদেরকে এমন সব শত্রুর মুকাবিলা করতে হবে যারা মত–পথ বা শিয়া–সুন্নীর মধ্যে কোন পার্থক্য করবে না।
শায়খ সাঈদের বক্তৃতার পর এই লেখক যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন এটা হচ্ছে তারই সংক্ষিপ্ত সার। মূল আরবী থেকে এটা উর্দূতে অনুবাদ করেছেন মওলভী নজরুল হাফীজ নদভী।]

বন্ধুগণ, এখনই একজন বিজ্ঞ বক্তা তাঁর মূল্যবান বক্তৃতায় যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও সর্বজন সমর্থিত। এতে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। আর সত্যি কথা বলতে গেলে, অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা ও মতপার্থক্যের অবসান ঘটাতে হলে এটা অপরিহার্য যে, আমাদেরকে মূল উৎস ও মূল কেন্দ্রের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। কেননা বকরীপাল যখন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন তাদেরকে রক্ষা করতে হলে কেন্দ্রের দিকেই হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে হবে। হাদীসে আছে, চিতা সেই বকরীকে আপন গ্রাসে পরিণত করে, যে আপন পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। জংগলে বিক্ষিপ্ত বকরীরা চিতাদের আক্রমণ থেকে যদি নিজেদের বাঁচাতে চায় তাহলে আপন

রাখাল ও রক্ষকের দিকে তাদেরকে ফিরে যেতে হবে এবং তারই তত্ত্বাবধানে নিজেদের সংরক্ষিত ও শক্তিশালী করে তুলতে হবে।

বন্ধুগণ, আমরা একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত, আমাদের নবী এক, কিতাব এক এবং কিবলাও এক। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন তার সমকালীন বাদশাহ্দের কাছে দাওয়াতীপত্র লিখতেন তখন তাতে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতটি লিখে দিতেন।

قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اَ لاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَ لاَ نُشْرِكَ بِــهٖ شَيْئًا وَّ لاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَــوَلَّوْا فَقُوْلُوْا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ٠

অর্থঃ তুমি বলো, 'হে কিতাবিগণ, এসো সে কাথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই, আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারো ইবাদত করি না, কোন কিছুই তার শরীক করিনা এবং আমাদের কেউ আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করে না। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলো, 'আমরা আত্মসমর্পণকারী, তোমরা সাক্ষী থাক।–(৩ ঃ ৬৪)।

অনৈক্য ও অশান্তি, মতবিরোধ ও দুর্বলতা এবং অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে একতা ও ঐক্য, শক্তি ও পরাক্রম এবং সম্মান ও প্রতিপত্তির পথ বাত্লে দিয়েছেন এবং এটাকে নবী-রাসূল এবং তাদের প্রতিনিধি উলামাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছেন। নিম্নের আয়াতে সেদিকেই ইংগিত প্রদান করা হয়েছে।

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَــهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُـوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُـوْا رَبّٰـنِيّٖـنَ بِمَا كُنْـتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ٠ وَلاَ يَاْ مُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰئِكَةَ وَ النَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا اَيَاْمُـرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْـتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ٠

অর্থঃ ''কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ কিতাব, হিকমত ও নবুয়াত দান করার

পর সে মানুষকে বলবে যে, 'আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হয়ে যাও,' এটা তার জন্য শোভন নয়, বরং সে বলবে 'তোমরা রাব্বানী (আল্লাহ্র আশ্রিত) হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর। ফেরেশতাগণকে ও নবীগণকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করতে সে তোমাদেরকে নির্দেশ দেবে না। তোমাদের মুসলমান হওয়ার পর সে কি তোমাদেরকে কাফির হতে বলবে ?
–(৩ ঃ ৭৯–৮০)

আমি একথা পুরোপুরি সমর্থন করি যে, 'শত্রু কোন ধর্মও মাযহাব এবং জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য করবে না। তবে আমি এই সাথে আর একটি কথা নিবেদন করতে চাই। আর তা হলো, 'আজ মায্হাবের সাথে মাযহাবের নয়, বরং ধর্মের সাথে ধর্মহীনতার সংঘর্ষ চলছে। এখন আসল কথা হলো, হয় মানুষ আল্লাহ্, রাসূল, আখিরাত, অদৃশ্য বিষয়াবলীর হাকীকত ও রাসূলের নিয়ে আসা পয়গামের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং নাজাত ও মুক্তিকে সেই ধর্মের উপর নির্ভরশীল মনে করবে, যা আল্লাহ্র কাছে সত্য ও সমর্থনযোগ্য, নয়ত সমগ্র অদৃম্য বিষয়াবলীর হাকীকতকে একদম অস্বীকার করবে এবং সকল দীন ও মাযহাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে।

বন্ধুগণ, এখন প্রশ্ন শুধু ধর্ম ও ধর্মহীনতার। আপনারা চাইলে এটাকেই (ধর্মহীনতাকেই) কমিউনিজম নাম দিতে পারবে, অবশ্য 'ধর্মহীনতা কমিউনিজমের চাইতেও ব্যাপক অর্থ বহন করে। ধর্মহীনতার পক্ষাবলম্বীরা আজ সকল ধর্ম, মাযহাব অদৃশ্য বিষয়াবলী, নবীদের শিক্ষা এবং সকল ধর্মীয় ও চারিত্রিক মাপকাঠির অস্বীকারকারী ও বিরুদ্ধাচরণকারী এবং এগুলোর মুকাবিলায় একই সারিতে দণ্ডায়মান। অপর পক্ষে রয়েছেন আম্বিয়া ও তাদের প্রতিনিধিরা। আর আমরা হচ্ছি তাদের নগণ্য খাদিম ও স্বেচ্ছাসেবক। আল্লাহ্ তার অসীম করুণাবলে আমাদেরকে এই খিদমতে নিয়োজিত রেখেছেন। এর কোন যোগ্যতা আমাদের মধ্যে নেই। আমাদের কর্তব্য, যে মুহাম্মদী পাতাকা আমাদের হাতে আছে তা সর্বদা উঁচু করে রাখা এবং পরস্পর একতাবদ্ধ হয়ে এই ধর্মকে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে প্রচার করা এবং শিক্ষা ও আদর্শকে সমুন্নত রাখার জন্য আমাদের যাবতীয় যোগ্যতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগানো।

টীকা ঃ

১. ইরানী দিনপঞ্জী অনুযায়ী ২১ খারদাদ, ১৩৫২ সন।

২. আমীর আব্বাস হুভায়দা তাঁর প্রাথমিক শিক্ষাজীবন বৈরুতে অতিবাহিত করেন এবং সেখানকার আমেরিকান ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রী লাভ করেন। তাই তিনি আরবী ভাষাভাষী লোকদের মতই আরবী ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। তিনি প্রায় দশ বছর থেকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

৩. ইরানী আলিম ও পন্ডিতগণ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। গভীর জ্ঞান ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিদেরকে আয়াতুল্লাহ্ আল -উযমা এবং উপরোক্ত ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যক্তিদেরকে 'আয়াতুল্লাহ্' বলা হয়।

৪. তেহরানের মসজিদে সিপাহ্সালারের নাযিম (ব্যবস্থাপক)।

৫. বিখ্যাত ঐতিহাসিক বাগদাদী তূসের উল্লেখ করতে গিয়ে আপন পুস্তক 'মারাসিদুল ইত্তেলা'-তে লিখেছেন, নিশাপুর হতে তূসের দূরত্ব দশ ফারসাখ্ (আনুমানিক ৮০ কিলোমিটার) তাবরান এবং নূকান হচ্ছে তূসের দু'টি বিখ্যাত জনবসতি। দুটি জনবসতিতে মোটামুটি এক হাজার পরিবারের বাস। আব্বাসী খলীফা হারূন-অর রশীদ এবং ইমাম আলী বিন মূসা রেযার সমাধি এখানকার একটি উদ্যানে রয়েছে।

৬. দিল্লীর ঐ গণহত্যার কারণ এই ছিল যে, নাদির শাহের সেনাবাহিনী যখন শহরের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করছিলো তখন শহরের অধিবাসীরা সুযোগ পেলেই তাদের উপর হামলা করে ধনসম্পদ লুটে নিয়ে যেত এবং সৈন্যদেরকেও হত্যা করত। নাদির শাহ্ শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে গণহত্যার নির্দেশ দেন। তিন দিন পর্যন্ত এই হত্যাকান্ড চলে। এই গণহত্যায় এক লাখেরও বেশী লোক নিহত হয়। তিন দিন পর অবশ্য শান্তিও নিরাপত্তার ঘোষণা দেওয়া হয়। (তারীখে হিন্দুস্তান দ্রষ্টব্য)

৭. হারূন-অর রশীদ ১৯৩ হিঃ সনে তূসে মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। এর কয়েক বছর পর ২০৩ হিঃ সনে তূসেই ইমাম আলী রেযার ইন্তিকাল হয়। ইবনে খাল্লিকান 'ওয়াফ্ফিয়াতুল আইয়ান' শীর্ষক গ্রন্থে ইমাম আলী রেযার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, 'তাঁর জানাযার নামায স্বয়ং মামূন-অর রশীদ পড়িয়েছিলেন এবং তাঁকে আপন পিতার সমাধি পার্শ্বেই সমাধিস্থ করেছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে, ইমাম আলী রেযা স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুবরণ করেন। অবশ্য কেউ কেউ বিষ প্রয়োগই তাঁর মৃত্যুর কারণ বলে

মনে করেন। তাদের মতে, যেহেতু মামূন-অর রশীদ আলী রেযার হাতেই খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করতে চেয়েছিলেন তাই বনু অব্বাসের লোকেরা তার উপর বিষ প্রয়োগ করে। ইমাম আলী সমাধিস্থ হওয়ার কারণেই জায়গাটি 'মাশহাদ' (শাহদতের স্থান) নামে বিখ্যাত হয়ে পড়েছে। এখন কেউ আর এটাকে তূস নামে চেনে না। এই পরিবর্তন ঘটে খুব সম্ভবতঃ সাফাভী শাসনামলে। ঐ যুগে এই পুরো অঞ্চলটিকেই খুরাসান বলা হত। এখনো তাই বলা হয়।

মাশহাদ্‌ থেকে কিছু দূরে নিশাপুরের প্রাচীন শহর অবস্থিত। এখানেই জন্মগ্রহণ করেন খাজা ফরীদুদ্দীন আত্তারের মত তত্ত্বজ্ঞানী এবং উমর খাইয়ামের মত কবি। আক্ষেপের বিষয় যে, সময়ের অভাবে আমরা ঐ স্থানটি দেখে আসতে পারি নি।

৮. শায়খ সা'দী শিরাজী মুসলমানদের এই দুঃখজনক পরিণতির উপর যে কাব্যগাঁথা রচনা করেছেন তা পাঠ করলে মুসলমান মাত্রেই ব্যথিত না হয়ে পারে না।

৯. আমরা আমাদের এই সফরকালীন সময়ে একথা জেনে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছি যে, বাহাইদের প্রভাব ইরানে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদ বর্তমানে তাদেরই হাতে। কোন কোন উচ্চপর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাকে বাহাই বলে সন্দেহ করা হয়।

১০. মুয়াত্তা ২. বুখারী-মুসলিম ৩. আবূ দাউদ। আহলে বাইতের লোকেরাই এই হাদীসের বর্ণনাকারী।

১১. রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) সম্পর্কে এই মর্মে অনেক হাদীস রয়েছে যে, যখনই কোন আপদ আসত, সংগে সংগে তিনি নামাযে মগ্ন হয়ে যেতেন। -(আবূ দাউদ)

১২. এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কবর পূজা, কবর যিয়ারতের জন্য দূর দূরান্তের সফর, বার্ষিক উরস ও মেলা অনুষ্ঠান এবং এ ধরনের আরো অনেক মুশরিকানা কার্যকলাপ পাক-ভারত উপমহাদেশ এবং মিসরের আহলে সুন্নাতদের মধ্যেও বহুলভাবে প্রচলিত। কিন্তু এই সাথে একথা স্বীকার করতে হবে যে, প্রত্যেক যুগেই পূর্ববর্তী থেকে শুরু থেকে পরবর্তী পর্যন্ত প্রত্যেক স্তরে ন্যায় ও সত্যের পতাকাবাহী এমন অনেক উলামার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যারা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে খোলাখুলিভাবে ঐ সমস্ত বিদাআত ও মুশরিকানা আচার-আচরণের বিরোধিতা করেছেন এবং সেগুলোর মূলোৎপাটনে ব্যাপৃত রয়েছেন। এ জন্য তাঁদেরকে জাহিল ও বর্বরদের জুলুম অত্যাচার ও রোষানলের শিকারে পরিণত হতে হয়েছে। তবু তারা নিজেদের দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকেননি। সব রকম বাধাবিপত্তি ও জুলুম অত্যাচার মাথায় নিয়ে তারা বিলুপ্ত তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে চলেছেন। এই মুজাহিদ, মুজাদ্দিদ ও সংস্কারকদের থেকে ইসলামী ইতিহাসের কোন অধ্যায়ই খালি ছিল না।

মাযহাব চতুষ্টয় (হানাফী, শাফিয়ী, মালিকী ও হানবালী)-এর গ্রন্থসমূহ কবর পূজা এবং মুশরিকানা বিদআত ও রুসূম-রিওয়াজের নিন্দায় ভরপুর। ইস্‌না আশারী তাবীদের সংস্কার ও তাজদীদের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। আমরা জানি না, শিয়া মতাবলম্বীদের মধ্যে এমন কোন আহবায়ক ও সংস্কারকের আবির্ভাব হয়েছে কি না, যারা কবর পূজা, ও মুশরিকানা রুসূম-রিওয়াজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করেছেন।

১৩. সহীহ্ বুখারীতে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে এমন একটি গীর্জার উল্লেখ করেন, যা তিনি (হিজরতকালীন সময়ে) আবিসিনিয়ায় দেখেছিলেন। তিনি হযরত ঈসা ও মারয়ামের ঐ সমস্ত ছবির কথাও উল্লেখ করেন যেগুলো সেখানে রাখা হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, ঐ সমস্ত লোকের এই নিয়ম ছিল যে, যখন তাদের কোন পুণ্যবান ব্যক্তির মৃত্যু হত তখন তারা কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করত এবং ঐ মসজিদে তার প্রতিকৃতি ঝুলিয়ে রাখত। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এরা হচ্ছে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।

সীরাতে ইবনে হিশামের একটি রিওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, মক্কা বিজয়কালে হযূর (সা.) যখন কা'বা শরীফে প্রবেশ করেন এবং সেখানে বিভিন্ন ফেরেশতা, ইবরাহীম (আ.) এবং অন্যান্যদের প্রতিকৃতি দেখেন তখন নির্দেশ দেন, যেন এই সব প্রতিকৃতি নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়। (ইবনে হিশাম ঃ ৪র্থ খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৪১৩)

১৪. কয়েক বছর থেকে ইরানীদের মধ্যে হজ্জ সফরের প্রতি বেশ আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ইরান সরকার এবং সেখানকার আওকাফ বিভাগ তাদের হজ্জযাত্রী ও দর্শনার্থীদের আরাম আয়েশের যে ব্যবস্থা করেছেন তা কেবল প্রশংসনীয় নয় বরং অনুকরণীয়ও।

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলনক্ষেত্র

লেবানন

৩

ইসলামের প্রাথমিক যুগের আহবায়কদের পদাঙ্ক অনুসরণে

আফগানিস্তান ও ইরান সফর শেষে আমরা পাঁচ সপ্তাহ বায়তুল্লাহ্ ও মসজিদে নববীর ছত্রছায়ায় কাটাই। এই দিনগুলোতে সেই অনস্বীকার্য সত্যের উপর নতুনভাবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, একমাত্র ইসলামই জাতি গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করণ, তাদের অন্তরকে একসূত্রে গ্রথিত করণ এবং তাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান তথা সঠিক নেতৃত্বদানের প্রকৃত যোগ্যতা রাখে। প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল আমাদের নতুন সফরের পাথেয়, শীঘ্রই যে সফরের সূচনা হচ্ছে ইসলামের লালনক্ষেত্র ও ইসলামী দাওয়াতের প্রাণকেন্দ্র থেকে। এই সফরের ক্ষেত্র হচ্ছে ঐ সমস্ত ইসলামী দেশ যা প্রথম ধাপেই ইসলামের আলোয় ঝলমলিয়ে উঠেছিল অর্থাৎ খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগেই ইসলামের ছত্রছায়ায় এসে গিয়েছিল এবং হিজরী সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামী খিলাফতের অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হত। এই সমস্ত দেশ থেকেই ইসলামের স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়ে উত্তর পশ্চিমে আটলাস পর্বত ও স্পেন এবং দক্ষিণ পূর্বে হিন্দুকুশ পর্বত ও সিন্দুনদ উপত্যকা পর্যন্ত প্লাবিত করে দিয়েছিল। এই সমস্ত দেশ থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার লাভ ঘটেছিল। এই সমস্ত দেশ বলতে 'শাম' (বর্তমান সিরিয়া, ফিলিস্তিন, লেবানন ও পূর্ব জর্দান) ও ইরাককে বুঝাচ্ছি। এটি ছিল একটি প্রাকৃতিক ক্ষেত্র, আরব উপদ্বীপ থেকে বের হওয়ার পর ইসলাম প্রচারকরা যে দিকে আপনা-আপনি ছুটে গিয়েছিলেন।

আমরাও ঐ মহান প্রচারকদের পদাংক অনুসরণ করছিলাম। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যদি তারা মুবাল্লিগ (ইসলাম-প্রচারক) ও সংগ্রামী না হতেন, যদি না থাকত তাঁদের ঈমানের বিশুদ্ধতা ও দৃঢ়তা, না থাকত তাঁদের সত্যতা, বিশ্বস্ততা, উচ্চ সাহসিকতা ও দৃঢ় প্রত্যয় তাহলে এই অঞ্চলে সেই ধর্মের প্রসার ঘটত না, যে ধর্মের মাধ্যমে আমরা একত্রে গ্রথিত, অস্তিত্ব থাকত না সেই ইসলামী ভ্রাতৃত্বের যার অপরিসীম বরকত ও মঙ্গললাভে আমরা আজ ধন্য, সেই কুরআনী আরবী ভাষারও আবির্ভাব ঘটত না যা আজ আরব ও অনারব দেশসমূহের পরস্পর মত-বিনিময়ের মাধ্যমে হিসাবে স্বীকৃত এবং যাকে বংশগত ও আঞ্চলিক ভাষাসমূহের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়, না এই সমস্ত দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা সংস্কৃতি এবং ধ্যান-ধারণার মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসত যা ব্যতীত মানবতার

ইতিহাস অসম্পূর্ণই থেকে যেত, না ইতিহাসে দামেশ্‌ক্‌ ও বাগদাদ বলে কোন স্থান থাকত, না থাকত অলীদ, হারূন, আবু তামাম, মুতানাববী, সীরওয়ায়হ্‌, কিসাঈ, আবূ হানীফা,১ আওযায়ী, আবূ ইয়াযীদ বুস্তামী,২ আবদুল কাদীর জীলানী৩ বলে কেউ, আর না ইতিহাসে কোন পরিচিত থাকত, কূফা বাসরা, কারখ্‌, মুস্‌তানসারিয়া ও নূরিয়ারও।

নতুন প্রতিনিধিদল গঠন

রাবিতার যে প্রতিনিধিদল আফগানিস্তান ও ইরান সফর করেছিল, লেবানন, পূর্ব জর্দান, সিরিয়া এবং ইরাক ও তাদেরই সফর করার কথা। প্রাক্তন দু'জন সংগী, এই লেখক এবং আহমদ মুহাম্মদ জামালকে নিয়ে প্রতিনিধিদল গঠিত হয়েছিল। ডঃ আবদুল্লাহ্‌ আব্বাস নদভী এই প্রতিনিধিদলের সেক্রেটারী মনোনীত হয়েছিলেন। কিন্তু বিশেষ কারণবশতঃ তাঁর মক্কায় অবস্থান প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ায় রাবিতার সাধারণ সচিবালয়ের ইসলামী তান্‌যীমসমূহের সেক্রেটারী উস্তাদ আবদুল্লাহ্‌ বাহ্‌বরীকে প্রতিনিধিদলের সেক্রেটারী মনোনীত করা হয়। উস্তাদ বাহ্‌বরী হচ্ছেন একজন সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও খোশমেযাজী যুবা পুরুষ। অতি সম্প্রতি তিনি উত্তর আফ্রিকা সফর করে এসেছেন। ঐ সফরে তাঁর সংগী ছিলেন মিসরের সাবেক মুফতী শায়খ হাসনায়ন মুহাম্মদ মাখলূফ, শায়খ মুহাম্মদ মাহমূদ আস্‌ –সাওয়াফ্‌ এবং শায়খ আবদুল্লাহ্‌ আনসারী। যাহোক ঐ সফর থেকে ফিরেই এবং কোনরূপ বিশ্রাম না নিয়েই তিনি আনন্দ চিত্তে পুনরায় আমাদের সাথে আর সফরে বেরিয়ে পড়েন। আরাম প্রিয়তার চাইতে যেন ব্যস্ততাই তার কাছে অধিক প্রিয়। তিনি অত্যন্ত আগ্রহ উদ্দীপনা, কর্মচাঞ্চল্য ও দক্ষতার সাথে আমাদের প্রতিনিধিদলের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন।

শারীরিক অসুস্থতা ও অন্যান্য অসুবিধা হেতু এই দীর্ঘ সফরে আমার এমন একজন সাথীর প্রয়োজন ছিল যিনি আমার মন–মেজাজ ও প্রয়োজনাদি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এই প্রেক্ষিতে রাবিতা আমার ব্যক্তিগত সাহায্যকারী হিসাবে আমাদের দলে নতুন একজন সদস্য যোগ করেন। তিনি ছিলেন দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার আরবী সাহিত্যের উস্তাদ, পাক্ষিক 'আররায়িদ'–এর সম্পাদক মওলভী মুহাম্মদ রাবী হাসান নদভী। তাঁর প্রয়োজন তখনই দেখা দেয় যখন ডঃ আবদুল্লাহ্‌ আব্বাস নদভীকে অনিবার্য

কারণে মক্কায় থেকে যেতে হয়, কিন্তু বিভিন্ন অসুবিধার কারণে সাউদী আরব পৌছতে তাঁর বেশ বিলম্ব ঘটে। শেষ পর্যন্ত জামাদিউস সানীর শেষের দিকে তিনি সেখানে গিয়ে পৌছেন।

বৈরুতে

জমাদিউস সানীর শেষ তারিখ রোববার (২৯ জুলাই, ১৯৭৩ ইং) আসরের সময় ভারতীয় সময় অপরাহ্ণ ৪ টায় আমি সাউদীয়া বিমানে আরোহণ করি। আমাদেরকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্য রাবিতার সহকারী জেনারেল সেক্রেটারী উস্তাদ সাইয়্যিদ মুহাম্মদ সাফূতে সাক্কা, আমিনী, রাবিতার জেদ্দাস্থ অফিসের ভারপ্রাপ্ত উস্তাদ খলীল এনানী, ডঃ আবদুল্লাহ্ আব্বাস নদভী প্রমুখ বন্ধু ও হিতাকাংক্ষীরা বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন। সূর্যাস্তের দু' ঘন্টা পূর্বে আমরা বৈরুত পৌছে যাই।

বিমান বন্দরে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানান লেবাননের 'দারুল ইফ্‌তা' –এর নাযিমে উমূমী (সাধারণ সম্পাদক) সাইয়িদ হুমায়ূন কুওয়াতিলী এবং লেবানন সাধারণতন্ত্রের মুফতী শায়খ হাসান খালিদ–এর স্থলাভিষিক্ত শায়খ মুহাম্মদ আলী জুয ও মুফতী জাবাল লেবনান। তাদের সাথে ছিলেন সাউদী দূতাবাসের (ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত) আবদুল মুহসিন সামান, লেবাননী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি, এবং রাবিতা আলমে ইসলামী, লেবানন–এর সদস্য শায়খ সাদী ইয়াসীন। বিমান বন্দরে বৈরুতস্থ রাবিতা–প্রতিনিধি উস্তাদ আবদুল হাকীম আবিদীনের সাথে আমাদের সাক্ষাত হয়।[৫]

বিমান বন্দরে জানতে পারলাম যে, মুফতীয়ে লেবানন শায়খ হাসান খালিদ পূর্বাহ্ণেই জবলে বাহ্‌মাদূনে অবস্থিত একটি বিরাট হোটেলে এবং বৈরুতস্থ অন্য একটি হোটেলে কয়েকটি কক্ষ রিজার্ভ করে রেখেছেন। আমরা ইচ্ছা করলে জবলে (পাহাড়ে) অবস্থান করতে পারি অথবা বৈরুতের সমতল ভূমিতেও থাকতে পারি। মওসুমী আবহাওয়ার দিকে লক্ষ্য করে আমরা পাহাড়ে অবস্থান করাকেই অগ্রাধিকার দিই। উপরোক্ত ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষিতে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, আমরা মুফতীয়ে লেবাননেরই অতিথি। এজন্য আমরা তার শুকরিয়া আদায় করলাম এবং সংগে সংগেই জবলে বাহ্‌মাদূনের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলাম– যেখানে হোটেলে শেপার্ড (SHEPERD)– আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বৈরুতের ইসলামী সংস্থাসমূহ দর্শন ও বিভিন্ন অঞ্চল সফর

পরদিন ১ রজব, ১৩৫৭ হিঃ, মুতাবিক ৩১ জুলাই ১৯৭৩ ইঃ সোমবার আমরা লেবাননের মুফতী শায়খ হাসান খালিদের সাথে তাঁর অফিসে দেখা করি। সেখানে ইফ্‌তা এর নাজিমে উমূমী (সাধারণ সম্পাদক) সাইয়িদ হুসায়ন কুওয়াতিলী উপস্থিত ছিলেন। লেবাননের মুসলমানের অবস্থা, সেখানকার ইসলামী সংস্থাসমূহের জন্য আর্থিক ও নৈতিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা এবং লেবাননের মুসলমানরা বর্তমানে যে সমস্ত বিপদে নিমজ্জিত রয়েছে সে সম্পর্কে মুফতী সাহেব আনুমানিক দেড় ঘন্টা পর্যন্ত প্রতিনিধিদলের সাথে অত্যন্ত খোলাখুলি আলোচনা করেন। এরপর প্রতিনিধিদল মুফতী সাহেবের সাথে একটি পর্যবেক্ষণ সফরে বের হয়। প্রথমে আমরা উপস্থিত হই বৈরুতের ধর্মীয় শিক্ষায়তনে, যাকে 'আযহারে লেবনান" বলা হয়। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা উক্ত প্রতিষ্ঠানের পাঠাগার এবং বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে ঘুরে দেখেন। তখন গ্রীষ্মের ছুটি চলছিলো। পাঠাগার হলে কিছু সংখ্যক রিসার্চ স্কলার অধ্যয়ন ও গবেষণায় মগ্ন ছিলেন। প্রতিনিধিদলের সাথে 'আযহারে লেবনান'–এর নাজিম শায়খ খলীলও ছিলেন। এরপর প্রতিনিধিদল বৈরুতের ইসলামী ইয়াতীমখানা অভিমুখে রওয়ানা হয়। সেখানে ইয়াতীমখানার নাজিম উস্তাদ মুহাম্মদ বারাকাত প্রতিনিধিদলকে অভ্যর্থনা জানান। তিনি আমাদেরকে ইয়াতীমখানার সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখান এবং এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর ব্যাখ্যা দেন। প্রত্যেকটি জিনিষকে বেশ পরিচ্ছন্ন ও সুরুচি সম্মত দেখাচ্ছিলো। ইয়াতীম শিশুদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন এবং তাদেরকে হীনমন্যতা থেকে রক্ষা করার সম্ভাব্য সব রকম মানসিক পন্থাই সেখানে অবলম্বন করা হয়েছে।

শহরের বিভিন্ন এলাকায় আমরা গিয়েছি। ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সাম্যের মাপকাঠিতে প্রায় ক্ষেত্রে দু'টি এলাকার মধ্যে দারুন বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়েছে। সমুদ্রতীর ধরে যখন আমরা ঐ মহল্লার দিকে যাচ্ছিলাম, যেখানে ইমাম আওযায়ী সমাধিস্থ হয়েছেন এবং তাঁর নামেই যে-মহল্লাটির নামকরণ করা হয়েছে পথিমধ্যে ফিদাঈনদের সেই কেন্দ্রটি দেখলাম যেখানে লেবাননী বাহিনী এবং ফিদাঈনদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কিভাবে ধর্মীয় উচ্ছ্বাস ও রাজনৈতিক মতলব ঐ যুদ্ধে ইন্ধন যুগিয়েছিল, দেশের দৈনন্দিন নাগরিক জীবন ও নাগরিকদের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ঐ যুদ্ধ কিরূপ

প্রভাব ফেলেছিল এবং ঘরবাড়ী ও মানুষের অন্তরে গোলাগুলি ও বোমাবাজির প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল সেখানে আমরা তা বাস্তব দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করলাম। ফিলিস্তিন এবং ফিলিস্তিনী শরণার্থীদের সমস্যা কিরূপ জটিলতা ও পরস্পর বৈপরিত্যের শিকার, ঐ সমস্ত ঘটনাবলী তা আমাদেরকে হাতে কলমে যেন বুঝিয়ে দিল।

আমরা ঐ সমস্ত এলাকাও অতিক্রম করলাম যেখানে শরণার্থীরা বসবাস করছে। সেখানে দারিদ্র, দুর্গন্ধ, নৈরাশ্য, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা এবং বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে দুশ্চিন্ত সর্বত্রই পরিলক্ষিত হলো। এই সমস্ত জিনিষ শুধু ঐ দেশের জন্য নয় বরং সমগ্র আরব দুনিয়ার জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। এই অবস্থা চিরদিন থাকতে পারে না চাই এর সমাধান করতে যত সময়ই লাগুক কিংবা এটাকে ঢাকার জন্য যত অপপ্রয়াসই চালানো হোক। এই এলাকা ছাড়া অন্য কোন এলাকায়ই দারিদ্র বা ও অসচ্ছলতা নেই। সর্বত্রই প্রাচুর্য আর জাঁকজমক।

এক নযরে বৈরুত

লেবাননের বিখ্যাত শহরসমূহ ও ইসলামী কেন্দ্রসমূহ ত্রিপলী, সায়দা প্রভৃতি সম্পর্কে কিছু বলার আগে আমি বৈরুতের উপর একবার নযর বুলিয়ে নিতে চাই। বৈরুত হচ্ছে পূর্ব আরবের অধিবাসীদের প্রিয় শহর ও বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র। তারা এখানে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করে এবং এখানেই তরঙ্গায়িত হয় তাদের প্রাচুর্যের সমুদ্র।

বিখ্যাত আরবী কবি আবু তামাম ত্বায়ীর কবিতার নিম্নোক্ত দু'টি লাইন বৈরুতের ব্যাপারে একান্তভাবে প্রযোজ্য।

د نيا معاش للفتى حتى اذا

حل الربيع فانما هى منظر

"দুনিয়া মানুষের জীবিকা অর্জনের জায়গা, কিন্তু যখন বসন্ত ঋতু আসে তখন তা চিত্ত বিনোদন কেন্দ্র ছাড়া কিছু নয়।"

বৈরুত হচ্ছে একটি বিরাট বাণিজ্য কেন্দ্র। কিন্তু গ্রীষ্ম ঋতুতে তা একটি চিত্ত বিনোদন কেন্দ্র ছাড়া কিছু নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জড়বাদী দর্শন কিভাবে আরবদের মাথা ঘুলিয়ে দিয়েছে, আরবরা কি পরিমাণ আরামপ্রিয়

হয়ে পড়েছে, কিভাবে তারা ধর্ম, শরীআত, প্রচলিত রীতিনীতি ও মানবিক মূল্যবোধের যাবতীয় বাধ্যবাধকতা ডিঙিয়ে স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে এবং আরব রাজধানীসমূহে বেচাকেনা ও অর্থ প্রাচুর্যের কিরূপ বন্যা বয়ে যাচ্ছে তা যদি কেউ প্রত্যক্ষ করতে চায় তাহলে গ্রীষ্মঋতুতে অবশ্যই তার বৈরুতে কিছুদিন অতিবাহিত করা উচিত। ঘটনাচক্রে আমাদের সফর গ্রীষ্মঋতুর এমন এক সময়ে ছিল যখন বৈরুত ছিল জাঁকজমক ও মনোহারিত্বের শীর্ষে। এর আগেও আমি গ্রীষ্ম, শীত উভয় মওসুমেই একাধিকবার বৈরুত যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু এক একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে সেখানে যাওয়ার দরুন প্রচার ও প্রকাশনা কেন্দ্রসমূহ, গ্রন্থাগারসমূহ এবং কিছু সংখ্যক ইসলামী সংস্থা ছাড়া অন্য কিছু দেখার সুযোগ আমি পাইনি, কিন্তু শেষবারের এই সফরে বৈরুত শহরের যাবতীয় অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যাদি অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণের ভাল সুযোগ পাই।

বিখ্যাত লেবাননী সাহিত্যিক আমীনুর রায়হানী তার এক রচনায় বৈরুতের নকশা অতি সুন্দরভাবে এঁকেছেন।৬

"বৈরুত তমদ্দুনের যেমন একটি আশীর্বাদ তেমন একটি অভিশাপও। বৈরুত প্রাচ্যের এমন একটি মোতি যা প্রতীচ্যের তাম্র পাত্রে রক্ষিত, যা ভোরবেলা প্রাচ্যরাণীর পায়ের খাড়ুয়া এবং সন্ধ্যাবেলা প্রতীচ্যরাণীর হাতের বালায় পরিণত হয়। বৈরুত কাদায়পড়া এমন একটি দুর্লভ স্বর্ণমুদ্রা যার ঔজ্জ্বল্য দেখে বিজলী বাতিও লজ্জায় নত হয়। বৈরুত এমন একটি মারজান (পলা) যা এমন একটি উপকূলে পড়ে আছে যার স্বর্ণভাগ বালুর মধ্যে এবং রৌপ্যভাগ কাদার সাথে মিশে আছে।"

বৈরুত প্যারিসের একটি দাসী। বৈরুত এমন একটি চাঁদ যার উপর প্রতীচ্যের আলো প্রতিবিম্বিত হয়ে তা প্রাচ্যকে আলোকিত করে, আবার প্রতীচ্যের অন্ধকার তার উপর পতিত হয়ে তা প্রাচ্যের অন্ধকারকে আরো বাড়িয়ে তোলে। বৈরুত জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎসস্থল, আবার অকর্মকু- কর্মেরও আখড়া।"৭

স্মরণ রাখা উচিত যে, উপরোক্ত কথাগুলো বলা হয়েছে আজ থেকে ৬২ বছর পূর্বে, যখন গোটা সিরিয়া উসমানিয়া সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। আর এটাও জেনে রাখা ভাল যে, লেবানন ও তার রাজধানী বৈরুতের উপর ফ্রান্স এক সিকি শতাব্দী পর্যন্ত তার শাসন চালিয়েছে। ইউরোপীয় দেশসমূহের

মধ্যে ফ্রান্স হচ্ছে সবচাইতে সভ্য উন্নত দেশ। আর ফরাসী সমাজনীতি হচ্ছে সব চাইতে আকর্ষণীয় ও বন্দনমুক্ত। এরপর যখন দেশ স্বাধীন হওয়ার পালা আসল তখন মানুষের মধ্যে বেপরোয়াভাব আরো বৃদ্ধি পেল। ঐ সমস্ত কারণেই পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ ও অনুসরণে বৈরুত আজ প্রাচ্যের দেশসমূহের শীর্ষে অবস্থান করছে।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আমেরিকা প্রথম থেকে এই শহরের উপর নিজের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালিয়ে আসছে। কেননা বৈরুত হচ্চে প্রাচ্যের দ্বার, আরব বিশ্বের প্রাকৃতিক উৎস এবং প্রাচ্যের একমাত্র শহর যা খ্রীস্টানদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। কাজেই আমেরিকা বৈরুতে বিরাট প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে, সাংঘাতিক সাংঘাতিক প্রকল্প তৈরী করেছে এবং সেগুলো বাস্তবায়িতও করেছ। বৈরুতের আমেরিকান ইউনিভার্সিটি (আল-জামিআ'তুল আমিরীকিয়াহ)-কে আজো আরব প্রাচ্যের সর্ববৃহৎ ইউনিভার্সিটি মনে করা হয়। এই ইউনিভার্সিটি আরবী চিন্তাধারা ও আরবী সাহিত্যের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। আরবের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ইউনিভার্সিটির শিক্ষকদের একটি বিশেষ সম্মান ও সমাদর রয়েছে।

বৈরুত পূর্ব আরবের সর্ববৃহৎ পর্যটন শহর। পর্যটনই হচ্ছে এর আয়ের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য মাধ্যম, যার উপর এর অর্থনীতি অনেকটা নির্ভরশীল। পর্যটন শহরসমূহের একটি বিশেষ জীবনধারা থাকে। এই সমস্ত শহরে চিত্ত বিনোদনও আয়াশ-আরামের ঢালাও ব্যবস্থা থাকে এবং এমন কিছু কার্জকর্ম ও আচার-আচরণকে আপত্তিকর মনে করা হয় না, যেগুলো বেশীর ভাগ সমাজে মানবতা ও সৌজন্যের দৃষ্টিতে শুধু আপত্তিকর নয় বরং দোষনীয়ও। তাই দেখা যায়, যখন আরবের রাজধানীসমূহে গরম লু'হাওয়ার দাপট চলতে থাকে তখন বৈরুত ভাসতে থাকে ঐশ্বর্য, জাঁকজমক ও মজা লুটার প্রশান্ত অনাবিল সাগরে।

বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রে সামরিক অভ্যুত্থান ও রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার ফলে সেখানকার অনেক নেতা ও সংস্কারকের উপর যখন ভূ-পৃষ্ঠ সংকুচিত হয়ে এসেছিল তখন তারা লেবাননেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই দিক দিয়ে লেবাননকে আরব বিশ্বের সুইজারল্যান্ড বলা যেতে পারে, যেখানে সব সময়ই রাজনৈতিক শরণার্থীদের ভিড় পরিলক্ষিত হয়। তারা সেখানে শুধু

আশ্রয়ই নেন না-গ্রন্থনা, রচনা এবং নিজেদের ধ্যান-ধারণা প্রচার ও প্রকাশের যাবতীয় সুযোগ সুবিধাও ভোগ করে থাকেন। এই সুযোগ সুবিধা আরব দেশসমূহের লোকেরা অন্য কোন দেশে, এমন কি নিজেদের দেশেও পায় না। উপরোক্ত কারণে শরণার্থীরা নিজেদের বিষয়-সম্পদও বৈরুতে স্থানান্তরিত করেছেন এবং তা ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োগ করেছেন। নিজেরা শিক্ষিত হওয়ার কারণে প্রচার ও প্রকাশনার ক্ষেত্র ছিল তাদের জন্য সব চাইতে বেশী অনুকূল তাই তারা প্রধানতঃ এক্ষেত্রেই তাদের পুঁজি নিয়োগ করেছেন। নিজেরা শিক্ষিত হওয়ার কারণে প্রচার ও প্রকাশনার ক্ষেত্র ছিল তাদের জন্য সব চাইতে বেশী অনুকূল। তাই তারা প্রধানতঃ এক্ষেত্রেই তাদের পুঁজি নিয়োগ করেছেন। বৈরুতে পূর্ব থেকেই যে অসংখ্য প্রেস ছিল এই সমস্ত শরণার্থীদের দ্বারা তা যারপর নাই উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে এবং সেখানে গ্রন্থনা ও প্রকাশনা শিল্পে এক নব যুগের সূচনা হয়েছে। বৈরুতে অসংখ্য লাইব্রেরী ও পুস্তকালয় রয়েছে। গ্রন্থকাররা চতুর্দিক থেকে সেখানে গিয়ে জড়ো হয়েছেন। বিশেষ করে যখন কায়রোর গ্রন্থনা ও প্রকাশনার উপর কঠোর আইন প্রয়োগ করা হল তখন বৈরুত হয়ে উঠল আরবের সর্ববৃহৎ প্রকাশনা কেন্দ্র।

ত্রিপলীতে

২রা রজব ১৩৯৩ হিঃ, মুতাবিক ৩১শে জুলাই ১৯৭৩ ইং রোজ সোমবার আমরা ত্রিপলী অভিমুখে রওয়ানা হই। ত্রিপলী হচ্ছে একটি সুন্দর মানোরম ইস্লামী শহর। বৈরুত থেকে এর দূরত্ব ৮৩ কিলোমিটার ইতিপূর্বে (শাবান, ১৩৭৫ হিঃ, মুতাবিক এপ্রিল ১৯৫৬) আরেকবার আমি ত্রিপলীতে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম এবং জায়গাটি আমার খুবই পসন্দ হয়েছিল। তখন থেকে মনের মধ্যে আশা পোষণ করে আসছিলাম পুনরায় ত্রিপলীতে যাওয়ার এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থান করার। আল্লাহুর শুক্র ১৭ বছর পর পুনরায় সে সুযোগ হাতে এল। আমরা সোমবার দিন ভোর বেলা উস্তাদ হুসায়ন কুওয়াতিলীর সাহচর্যে ত্রিপলীর দিকে রওয়ানা হই। আমরা সমুদ্রের তীর ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার মতে, এটা হচ্ছে প্রাচ্যের সুন্দরতম রাস্তা। রোম সাগর প্রবাহিত হচ্ছিল আমাদের নিকট দিয়েই। রাস্তা এবং সমুদ্রের মধ্যকার দূরত্ব ছিল খুবই কম। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মনোরম জনবসতি

এবং সুন্দর চিত্তাকর্ষক দৃশ্যাবলী একের পর এক অতিক্রম করে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম। যখন ত্রিপলীতে উপনীত হলাম তখন শহরের উলামার একটি বিরাট দল এবং বিচারও ইফ্তা বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তারা আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। সর্ব প্রথমে আমরা আওকাফ বিভাগের প্রধান কার্যালয়ে যাই এবং সেই বিরাট মসজিদ পরিদর্শন করি যার নির্মাণ কাজ এখনো চলছে। এরপর আমরা ইসলামী ইয়াতীম খানা ও ইসলামী দাতব্য চিকিৎসালয় দেখতে যাই। চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রেসিডেন্ট শায়খ আদনান আল-জাস্র আমাদেরকে চিকিৎসালয়ের সুবৃহৎ দালান ঘুরে ঘুরে দেখান, যেখানে চিকিৎসার সব ধরনেরর আধুনিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। প্রতিনিধিদল প্রেসিডেন্টর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, এই চিকিৎসালয়ের সেবিকাদের পোশাক ও চাল-চলনে ইসলামী রং থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়, যাতে করে এরা সমগ্র ইসলামী- চিকিৎসালয়সমূহের নমুনা ও আদর্শে পরিণত হয়। অবশ্য অন্যান্য দিক যেমন সুরুচি, নিয়মানুবর্তিতা, ভদ্র আচরণ প্রভৃতিতে ত্রিপলীর ইসলামী চিকিৎসালয়সমূহের বিশেষ খ্যাতি রয়েছে।

এরপর আমরা 'মাদরাসাতুল ঈমান' দেখতে যাই। সৌভাগ্যবশতঃ সেখানে মওলভী সিবগাতুল্লাহ্ মুজাদ্দিদীর সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। ইতিপূর্বে কাবুলেও তাঁর সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি লিবিয়ার সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য এসেছিলেন এবং কাবুলে ফিরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বিমান বন্দরে গিয়ে আফগানিস্তানের আকস্মিক বিপ্লবের খবর শুনে সাময়িকভাবে সফর স্থগিত রেখেছেন। পরিস্থিতি পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তিনি লেবাননেই অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এরপর আমরা ত্রিপলীর বিখ্যাত আলিম শায়খ নাদীম আল্-জাস্র-এর সাথে সাক্ষাত করতে যাই। তিনি ত্রিপলীর স্বনামখ্যাত আলিম আর রিসালাতুল হাসীদিয়াহ্-এর গ্রন্থকার শায়খ হুসায়ন আল্-জাস্র-এর পুত্র। আমি শায়খের একটি পুস্তক (কিস্সাতুল্ ঈমান বায়নাল ফালসাফা ওয়াল ইলমে ওয়াল কুরআন) ইতিমধ্যে পড়েছিলাম। এই কয় বছরের মধ্যে তাঁর যতগুলো পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে উপরোক্ত পুস্তকটি ছিল সব চাইতে সারগর্ভ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। আমরা উপ-মহাদেশের বাসিন্দারা আল্লামাতুশ্ শাম শায়খ হুসায়ন আল-জাস্রকে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আর রিসালাতুল হামীদিয়াহ' -এর মাধ্যমে জেনেছিলাম। এই গ্রন্থটি বর্তমানে হিজরী শতাব্দীর প্রথমভাগে বিরাট

আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। পাক-ভারতের উলামা এটাকে খুবই পছন্দ করতেন। তাদের মতে এটি ইসলামী আকায়েদের একটি উল্লেখযোগ্য প্রামাণিক গ্রন্থ। 'তারই স্বনাম খ্যাত সন্তান, সুযোগ্য উত্তরাধিকারী শায়খ নাদীম আল-জাস্‌র বর্তমানে ত্রিপলীর মুফতী।

এরপর আমাদের কাফেলা সায়র-এর দিকে রওয়ানা হয়। 'সায়র' হচ্ছে লেবাননের একটি আকর্ষণীয় গ্রীষ্মনিবাস। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে এর উচ্চতা ৯০০ মিটার। শায়খ নাদীম আল জাসর, এখানেই বসবসে করেন। আমি দীর্ঘক্ষণ শায়খের বাস ভবনের অবস্থান করি। শায়খের আলোচ্য বিষয় ছিল ঐ প্রস্তাবিত ফিল্ম, যাতে সীরাতে নববীর ঘটনাবলী এবং সাহাবায়ে কিরামকে দেখানো হবে এবং কোন কোন আরব রাষ্ট্রে ইতিমধ্যে এটাকে অনুমোদনও দিয়েছে। এই বিদাআতী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাঁকে খুবই চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন দেখা গেল। তাঁর মতে, এই ফিল্মের আঁচল ধরেই দুর্বল হাদীসমূহ, সীরাত ও তাফসীরের ঐ সমস্ত কিতাবসমূহের উপর, যেগুলোর সনদ ও বর্ণনাভঙ্গি সর্বসম্মত মাপকাঠির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়-প্রাচ্যবিদ ও ইসলাম বিদ্বেষীরা এমন সব রোমান্টিক কিস্‌সা-কাহিনী রচনার সুযোগ পাবে যেগুলো সীরাতের সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য নষ্ট করে দেবে, অথচ এর উপর কোন বাধা- নিষেধ আরোপ করা সম্ভব হবে না।

যাহরানায় আমার বক্তৃতা

আমরা দুপুরে ত্রিপলীর মুফতী সাহেবের মেহমান ছিলাম। আমাদের সাথে উলামাদের একটি বিরাট দলও ছিল। পানাহারের পর প্রতিনিধিদলের অভ্যর্থনা ও পরিচিতি উপলক্ষে একটি বক্তৃতা প্রদান করা হয়। আমি উক্ত বক্তৃতার জবাবে কিছু বলি। ত্রিপলীবাসীদের অতিথিপরায়ণতা ও উষ্ণ অভ্যর্থনার শুকরিয়া আদায় করেতে গিয়ে আমি বলি-

"লেবাননের মুসলিম জনসাধারণ এখন অত্যন্ত নাজুক ও শোচনীয় অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। বর্তমানে তাদের বুদ্ধিমত্তা, ইচ্ছাশক্তি এবং আকীদার দৃঢ়তার অগ্নিপরীক্ষা চলছে। দীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজে-দের ঈমানের দৃঢ়তা ও আল্লাহ্‌র সাহায্যের উপর পুনরায় তাদেরকে দৃঢ় আস্থাশীল হতে হবে। সর্বোপরি তাদেরকে আল্লাহ্‌র শুকর আদায় করতে হবে এজন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই মহান কাজের জন্য লেবাননের

মুসলমানদেরকে যোগ্য বিবেচনা করেছেন এবং এই দায়িত্ব পালনের জন্য তাদেরকেই নির্বাচিত করেছেন। এটা চিন্তিত বা আতঙ্কিত হওয়ার সময় নয় বরং ধৈর্য, সহনশীলতা ও শুক্র আদায়ের সময়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ্ কখনো সেই জাতিকে তার সাহায্য সহায়তা থেকে বঞ্চিত করবেন না, যাদের সাংগঠনিক ও সৃজনশীল যোগ্যতা ও দক্ষতা ইসলামী সংস্থাসমূহের আকারে প্রজ্বলিত রয়েছে। আল্লাহ্ সর্বদা তারই সাহায্য করেন যে চেষ্টা করে, দৌড়াদৌড়ি করে, নিজের জীবিত থাকার অধিকার ও যোগ্যতা প্রমাণিত করে এবং সব ধরনের বিপদ-আপদ ও পরীক্ষার মধ্যেও নিজের মুক্তিও সাফল্যের রাস্তা খুঁজে নেয়।"

সাক্ষাৎকার ও পরিচিতি

ত্রিপলী সফরকালে প্রতিনিধিদল বেশ কয়েকজন উলামার সাথে সাক্ষাৎ করে। তাদের মধ্যে উস্তাদ ফায়সাল, মওলভী শায়খ ত্বয়াহা, শায়খ রশীদ মীকাতী, উস্তাদ মুহাম্মদ আলী দ্বাভী এবং শায়খ নাসির আস-সালেহ-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত বুর্যগের সাথে বিভিন্ন ইসলামী বিষয় এবং দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা চলে এবং প্রতিনিধি দল তাদের জ্ঞান ও ধ্যান-ধারণা থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পায়। প্রতিনিধি দলের জন্য এই সফরটি ছিল অত্যন্ত লাভজনক। আমরা ঐ সমস্ত ব্যক্তির কাছে কৃতজ্ঞ যারা আমাদের অভ্যর্থনা জানান এবং এই সমস্ত সাক্ষাৎকার, পরিচিতি এবং মত বিনিময়ের সুযোগ করে দেন। এরপর আমরা বাহমাদূনে প্রত্যাবর্তন করি।

সায়দা সফর

৩রা রজব ১৩৯৩ হিঃ, মুতাবিক ১লা আগস্ট ১৯৭৩ ইং বুধবার ভোরে আমরা লেবাননের অন্যতম শহর সায়দা অভিমুখে রওয়ানা হই। জনবসতি ও অন্যান্য দিক দিয়ে এটা হচ্ছে লেবাননের তিন নম্বর শহর। আমাদের সাথে 'আযহারে লেব্নান' এর নাজিম শায়খ খলীলও ছিলেন। রাস্তা ছিল অত্যন্ত সুন্দর এবং আমাদের সফরও ছিল যারপর নাই আকর্ষণীয় ও আরামদায়ক। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন লেবাননী শহর ও গ্রামসমূহ অতিক্রম করে আমরা সায়দায় গিয়ে পৌছি। শহরটি বৈরুত থেকে ৪৩ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত।

সায়দা পৌঁছার সাথে সাথে আমরা সেখানকার আওকাফ বিভাগের স্থানীয় কার্যালয়ে যাই এবং বেশ কিছুক্ষণ সেখানে বসি। এই অবসরে বেশ কয়েক-জন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও উলামার সাথে আমাদের আলাপ পরিচয় হয়। এরপর আমরা আওকাফ-এর সুযোগ্য ব্যবস্থাপক সালীম সূসানের সঙ্গে সায়দার মুফতী শায়খ মুহাম্মদ হামূদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই। সাক্ষাৎকারটি ছিল অত্যন্ত আনন্দদায়ক। অভ্যর্থনাকক্ষে আমরা দীর্ঘক্ষণ বসে ছিলাম। আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত যে বিষয়টি আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয় তা ছিল, 'মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহ এবং ঐ সমস্ত দুঃখজনক অবস্থা যেগুলো দ্বারা এযুগের মুসলমানরা হন্তদন্ত এবং ইতিপূর্বে তারা কখনো এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হন নি।' উপস্থিত বিজ্ঞজনেরা এ বিষয়ে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করেন। আমাকেও কিছু বলতে হল। আমার বক্তব্যের সারাংশ ছিল নিম্নরূপ।

জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে উলামার স্থান এবং জনসাধারণের উপর থেকে তাদের প্রভাব হ্রাস পাওয়ার কারণ

"আমাদের আলোচ্য বিষয় অত্যন্ত ব্যাপক। যদি আমরা ইসলামী বিশ্বের প্রতিটি শ্রেণী এবং প্রতিটি গোষ্ঠীর পর্যালোচনা করি এবং নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাদের যে ঢিলেমি রয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করি তাহলে লাভের মত লাভ কিছুই হবে না এবং কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তাই আমরা আমাদের আলোচনা উলামা সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবো। এ ধরনের আলোচনা যেমন লাভজনক তেমনি কার্যকর। তাছাড়া এখানে শুধু উলামা হযরত একত্রিত হয়েছেন এবং আমাদের আলোচনার লক্ষ্যবস্তুও তারাই।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জাতির সংস্কার ও সংশোধন উলামা সমা-জের সংস্কার ও সংশোধনের উপর নির্ভরশীল। উলামা সঠিক পথে থাকলে জাতিও সঠিক পথে থাকবে। যদি উলামার মধ্যে কলুষতা দেখা দেয়, অবিশ্বাস ও দুর্বলতার চিহ্ন ফুটে উঠে, পার্থিব আকাংক্ষা ও বস্তুবাদের প্রতি ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়, রিপুর তাড়না ও আয়েশ-আরামের বাসনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, অল্পে তুষ্টির অভাব দেখা দেয়, ভোগ-বিলাসের অভ্যাস গড়ে উঠে তাহলে নিশ্চিতভাবেই জনসাধারণের উপর থেকে তাদের প্রভাব হ্রাস পাবে।

মানুষের স্বভাব হচ্ছে এই যে, সে ঐ সমস্ত জিনিষের দিকেই ঝুকে পড়ে যা তার কাছে নেই। প্রাথমিক যুগের ইসলামী সমাজ আলিমদের সম্মান করত, সমীহ করত এবং তাঁরাও তখন ছিলেন সৎ, সাধু, অল্পে তুষ্ট, পরমুখাপেক্ষিতা ও আত্মস্বার্থপরতা থেকে পবিত্র এবং সহজ সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত। এ কারণে রাজা বাদশাহ্ এবং আমীর–উমরাও তাদেরকে ভয় করত, সমীহ করত, উলামায়ে কিরামকে নিজেদের চাইতে উৎকৃষ্ট মনে করত।

কিন্তু আজ আলিমদের এই অবস্থা যে, আয়েশ–আরাম হাসিলের প্রতিযোগিতায় তাঁরাও ব্যস্তত্রস্ত। এক্ষেত্রে তাঁদের এবং তাঁদের দেশবাসী সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন তফাত নেই। অতএব সমাজও তাদেরকে সেই দৃষ্টিতে দেখছে, যে দৃষ্টিতে তাঁরা সমাজকে দেখে থাকেন। ফলে জনসাধারণের অন্তরে তাঁদের কোন কথা, কোন নসীহতই প্রভাব ফেলতে পারছে না।

দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য আজ যে জিনিষের সব চাইতে বেশী প্রয়োজন তাহলে, আলিম সমাজ যেন নিজেদের হারানো মর্যাদা পুনরায় উদ্ধার করেন এবং নিজেদের আস্থা, বিশ্বাস ও ধর্মীয় মর্যাদা মূল্যায়ন করেন। সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, যখনই ইসলাম ও মুসলমান সাংঘাতিক বিপাকে পড়েছে, যখন তারা নৈরাশ্য ও অবিশ্বাসের আঁধারে নিমজ্জিত হয়েছে তখনই আবির্ভাব ঘটেছে একজন আলিমের। তিনি ইসলামের ডাক দিয়েছেন, সংস্কারের আহবান জানিয়েছেন, উপস্থিত পরিস্থিতিকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন, ইসলামী আকায়েদ ও ইসলামী শরীয়ত পুনঃপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন, জাতির দেহে ফুঁকে দিয়েছেন নতুন প্রাণ, উজ্জীবিত করেছেন তাদেরকে সুস্থ সুন্দর জীবনের প্রতি। এই ধারা আমরা বরাবরই লক্ষ্য করে আসছি। ইমাম হাসান বসরী থেকে শায়খ আবদুল কাদির জিলানী পর্যন্ত, ইবনে তাইমিয়া, শায়খ আহমদ সারহিন্দী এবং এই শতাব্দীরও রাব্বানী উলামা ও সংস্কারক আয়িম্মা পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে এবং প্রত্যেক শতাব্দীতে এই ধারা পরিলক্ষিত হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত দাওয়াত, তাবলীগ এবং ইসলাহও সংস্কারের এই ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।"

বেশীর ভাগ শ্রোতা আমার এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করেন।

মুসলিম ইয়াতীমখানা

তারপর আমরা 'জামইয়াতু রিআয়াতিল ইয়াতীম' নামক একটি মুসলিম ইয়াতীমখানা দেখতে যাই। এটি একটি বিরাট ইমারত, যার মধ্যে বেশ কয়েকটি বিভাগ এবং কয়েকটি হলও রয়েছে। এর ব্যবস্থাপক এবং প্রতিষ্ঠাতারা এর নির্মাণ ও অলংকরণে অত্যন্ত দক্ষতার পারিচয় দিয়েছেন, এতে সব রকমের সুবিধাদি বিদ্যমান। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটি বর্তমান যুগের আধুনিকতম জনহিতকর সংস্থাসমূহের অন্যতম। অবশ্য এমন কিছু ক্রিয়াকাণ্ড ও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা ইসলামী শরীআত ও শিষ্ঠাচার বিরোধী। যেমন এর পরিচিতি সম্পর্কিত পুস্তিকায় এমন একটি ছবি রয়েছে যার মধ্যে এই সংস্থার ছেলে-মেয়েদেরকে স্থানীয় একটি নৃত্যের ভংগিমায় দেখানো হয়েছে। অবশ্য ছাত্রীদেরকে যেভাবে সেলাই ও অন্যান্য হস্তকর্ম শেখানো হচ্ছে তা দেখে আমরা অভিভূত হয়েছি।

এরপর আমরা সায়দার কাযীয়ে শারীআত শায়খ সালীম জালালুদ্দীনের বাসভবনে যাই, যা একটি সুন্দর টিলার উপর অবস্থিত। টিলাটি শস্যক্ষেত এবং উদ্যান পরিবেষ্টিত। সামনে একটি উপত্যকা তাতে রয়েছে নানা জাতের সবুজ গাছপালা এবং সেগুলোতে রং বেরংয়ের ফুল ও ফল। উপত্যকার সৌন্দর্য এবং টিলার প্রাকৃতিক অবস্থানকে যাদুকরী দৃশ্যের অবতারণা করেছে। সেখানে উলামা ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের সাথে দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়। সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং সেই সাথে বন্ধুসুলভ মিষ্টি মিষ্টি কথা এবং ভদ্র-মার্জিত ব্যবহার আমাদেরকে যারপরনাই মুগ্ধ করে।

এরপর আমরা সমুদ্রের ঐতিহাসিক দুর্গটি দেখি এবং সমুদ্র তীরবর্তী একটি জাঁকজমকপূর্ণ হোটেলে দুপুরের খাবার খেয়ে সন্তুষ্টচিত্তে বহমাদূনে ফিরে আসি।

মুফতী আমীনুল হুসায়নীর আতিথ্য

ঐ দিন সন্ধ্যায় 'মুতামারে আলমে ইসলামী' ও 'আল হাইয়াতুল আরাবিয়াতুল উল্য়ালি ফিলিস্তিন'-এর সদর মুফতী আমীনুল হুসায়নী প্রতিনিধিদলের সম্মানে 'মানসূরিয়াতুল মতনস্থ তাঁর বাসভবনে একটি অভ্যর্থনা সভার আয়োজন করেন, যাতে উলামা ও ইসলামী আন্দোলনের প্রতি আগ্রহী শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

লেবাননী মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা

এবার আমরা লেবাননী মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করছি। এটি এমন একটি ঘোরালো অবস্থা, যে সম্পর্কে কোন পরিষ্কার মন্তব্য করা অন্য দেশের অভিজ্ঞ রাজনীতিকদের পক্ষেও সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। যে ব্যক্তি লেবানন সফর করে নি এবং গভীর দৃষ্টিতে সেখানকার অবস্থাও পর্যবেক্ষণ করে নি তার পক্ষে তো বিষয়টি বুঝে উঠাই কঠিন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, উসমানিয়া সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আরবদের, বিশেষ করে সিরীয়দের বিদ্রোহ, মিত্রশক্তির প্রতিশ্রুতি উপর তাদের আস্থা স্থাপন এবং উসমানিয়া সাম্রাজ্যের আওতা থেকে বেরিয়ে পড়ায় শাস্তি ও অভিশাপ থেকে লেবাননের মুসলমানরা এখনো মুক্তি লাভ করতে পারে নি। উসমানিয়া খিলাফতের মধ্যে অনেক ভুল-ভ্রান্তি ও দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও তারা ছিল ইসলামী শক্তি ও ইসলামী ঐতিহ্যের নিশানবরদার এবং পবিত্র স্থানসমূহের মুহাফিজ ও রক্ষক। তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করার যে পরিণাম আরবরা ইতিমধ্যে ভোগ করেছে এবং আজো ভোগ করছে, তাতে লেবাননের মুসলমানদের অংশ সিরিয়ার অন্যান্য অধিবাসীদের অনুপাতে কিছুটা বেশী। লেবাননের মুসলমানরা আজো এই ঘোরালো ও ক্লান্তিকর অবস্থার চাপে অনবরতঃ কাতরাচ্ছে।

সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণ এই যে, লেবাননের পাহাড়ী এলাকার খ্রীস্টানদের এবং অন্যান্য এলাকায় মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য ছিল। এরপর ১৯২০ইং সনে বৈরুত, সায়দা, বাল্‌বাক্, হাসবিয়া ও রাশিয়া এলাকাকে লেবাননের সাথে যুক্ত করা হয় এবং লেবাননের পার্বত্য এলাকাকে এই নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসাবে ধরা হয়। ১৯৩২ইং সনে ফরাসী শাসকরা এতে আদমশুমারীর ব্যবস্থা করে এবং তা ৩১শে জানুয়ারী ১৯৩২ইং সনে সম্পন্ন করা হয়। এই আদম শুমারীর পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল কার্যকর। মূলতঃ ফ্রান্সের উদ্দেশ্য ছিল, আপন মর্জী মত দেশের একটি সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান। গণনা চলাকালে বোধগম্য কারণেই এই গুজব রটিয়ে দেওয়া হয় যে, ফ্রান্সের উদ্দেশ্য, এই নতুন উপনিবেশ থেকে ফরাসী বাহিনীতে জবরদস্তিমূলকভাবে লোক ভর্তি করা। মুসলমানরা এটা চাচ্ছিলো না, তাই গণনা থেকে বাদ পড়াকে তারা মোটেই

গুরুত্বের নজরে দেখে নি। বিষয়টি আরো বেশী ঘোরালো হয়ে দাঁড়ায় এ কারেণ যে, মুসলমানরা ছিল সিরিয়া বিভাগের ঘোর বিরোধী।

ঐ সমস্ত কারণে মুসলমানরা আদম শুমারীর প্রতি মোটেই গুরুত্ব দেয় নি। অতএব পরিষ্কার ফল দাঁড়ালো এই যে, প্রতারণামূলক এই আদম শুমারীতে খ্রীস্টানদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণিত হলো। এরপর লেবাননের শাসকরা দ্বিতীয়বার সঠিক ও পরিপূর্ণ আদমশুমারী অনুষ্ঠানে আর রাযী হলো না। আজো সেই ধারাই বহাল রয়েছে যদিও আজ থেকে দীর্ঘ চল্লিশ বছর আগে ঐ আদমশুমারী অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ঐ আদম শুমারীর উপরই জাতীয় সংবিধান প্রণীত হয়, সরকারী উচ্চপদ ও জাতীয় পরিষদের আসনসমূহ বন্টিত হয় এবং আরবের এই মুসলিম রাষ্ট্রের মুসলমানদের ভবিষ্যৎ মর্যাদা এমনভাবে নির্ণীত হয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকা সত্ত্বেও তারা সংখ্যা লঘিষ্ঠের জীবন অতিবাহিত করতে থাকে। অবস্থা আরো নাজুক ও বিব্রতকর হয়ে দাঁড়িয়েছে এজন্য যে, অমুসলিমদেরকে অত্যন্ত উদারভাবে লেবাননী নাগরিকত্ব প্রদান করা হচ্ছে এবং এভাবে তাদের ভবিষ্যৎকে আরো মজবুত, আরো সংরক্ষিত করে তোলা হচ্ছে।

ফরাসীরা যখন লেবানন ছেড়ে যাচ্ছিলো তখন তারা এর শাসনক্ষমতা মারূনী সম্প্রদায়ের হাতে সোপর্দ করে এবং এমন একটি সংবিধান প্রণয়ন করে, যার দৃষ্টিতে সর্বময় ক্ষমতা সদরে জমহুরিয়াত (রাষ্ট্রপ্রধান)–এর হাতে থাকবে এবং তিনি সর্বদা খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীই হবেন। মোটকথা খ্রীস্টান রাষ্ট্রপ্রধানকে ছলেবলে যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারী এমনভাবে করা হয় যে, তাকে কারো কাছেই জবাবদিহি করতে হবে না। উল্লেখিত সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে একটি ধারা এই ছিল যে, তিনি সর্বদা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন, সদরে জমহুরিয়াহ্ তাকে মনোনীত করবেন এবং তাকেই সংসদের সামনে জবাবদিহি করতে হবে। উপরন্তু সংসদ যখন চাইবে তখনই তাঁর এবং তাঁর মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারবে। প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ কোন ক্ষমতার অধিকারী হবেন না, বরং তিনি সদরে জমহুরিয়ার নিছক হেড ক্লার্ক হিসাবে কাজ করবেন এবং সদরে জমহুরিয়ার সম্মান ও প্রতিপত্তি কোনভাবে যাতে ক্ষুণ্ন না হয় সে ব্যাপারে সদা–সতর্ক থাকবেন।

এটা হচ্ছে সেই সংবিধান যা লিখিত আকারে রয়েছে এবং যা লেবাননী মুসলমানের সাথে ন্যায় ও সাম্যের আচরণ করে না। এছাড়া সেখানে আর একটি সংবিধান রয়েছে, যা গণতান্ত্রিক লেবানন আপন করে নিয়েছে, কিন্তু তা লিখিত আকারে নয়। এই দুই সংবিধানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মতবিরোধ রয়েছে। অলিখিত সংবিধান অনুযায়ী সরকারের অতিগুরুত্বপূর্ণ পদগুলো (KEY POST) সর্বদা অমুসলিমদের দখলে থাকে, গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বৃত্তিভাতা প্রভৃতির মঞ্জুরী অমুসলিম এলাকার জন্যই নির্দিষ্ট থাকে। চরিত্রের মাপকাঠি, এমন কি অফিস-আদালতের কার্যকাল অমুসলিমদের দিকে লক্ষ্য করেই নির্ধারণ করা হয়। এ কারণেই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ লেবাননে সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবারের পরিবর্তে শনিবার ও রোববার। লেবাননের রাষ্ট্রীয় নীতি হলো, সেখানকার চাকুরীর কোটা সম্প্রদায় নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে পূরণ করা হবে। ফলে দেখা যাচ্ছে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার কর্মকর্তারা প্রায় ক্ষেত্রেই অমুসলিম। আর এ কারণেই ঐ সমস্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মকান্ড থেকে বঞ্চিত। এভাবে কোন মুসলমান যদি কোন কারণে একবার লেবানন ছেড়ে গিয়ে থাকে তা হলে পুনরায় লেবাননী নাগরিকত্ব লাভ করতে তাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়।[৮]

নিঃসন্দেহে এই অবস্থার জন্য লেবাননী মুসলমানরাও দায়ী। তাদের অদূরদর্শিতার কারণেই সেখানে অনেক কিছু তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে ঘটে যাচ্ছে। কেননা লেবাননের যাবতীয় অবস্থা ও ব্যবস্থার মূলে অমুসলিমদের দূরদর্শিতা ও পরিকল্পনা কাজ করেছে। কিন্তু মুসলমানরা কোন ব্যাপারেই কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করে নি। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো, মুসলিম দলসমূহের নেতাদের স্বার্থপরতা। তারা যে কোন ভাবে প্রধান মন্ত্রীত্বের পদে অধিষ্ঠিত হতে চান-এজন্য যদি লেবাননের মুসলমানদের যাবতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে হয় তবু আপত্তি নেই। এই নেতারা কখনো লেবাননী মুসলমানদের প্রাপ্য অধিকার আদায়ে সচেষ্ট নন; তারা নিজেদের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্তত্রস্ত। প্রায়ই দেখা যায় যে, মাননীয় প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে ইংগিত পাওয়া মাত্র প্রধান মন্ত্রীত্বের পদের জন্য তারা এমনভাবে ছুটেন যে, তখন তাদের কোন হুশজ্ঞান থাকে না-যদিও এই পদে অবস্থানের মেয়াদকাল কখনো কখনো কয়েক সপ্তাহ, এমন কি কয়েক দিনের বেশী হয় না।

এই সাথে এটাও স্মরণ রাখা উচিত যে, লেবাননের মুসলমানরা আরব রাষ্ট্রসমূহ এবং আরব বিশ্ব থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। কোন আরব রাষ্ট্র থেকে তারা কোন প্রকার সাহায্য পায় না, তাদের সমস্যাদির ব্যাপারে কেউ কোনরূপ উৎসাহ বা সহানুভূতি দেখায় না। অপরদিকে খ্রীষ্টান সম্প্রদায় সমগ্র খ্রীষ্টান-বিশেষ করে ভ্যাটিকান থেকে সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা পেঁয়ে থাকে। সমগ্র খ্রীষ্টান বিশ্ব অনবরতঃ তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছে, অথচ মুসলমানরা আরব ও ইসলামী বিশ্ব থেকে কোন সাহায্যই পাচ্ছে না। কোন কোন রাষ্ট্র এবং কোন কোন আরব দেশের বিত্তশালী মহান ব্যক্তিরা কিছু কিছু ইসলামী ও জনহিতকর সংস্থাকে কিছু কিছু সাহায্য সহায়তা অবশ্যই করে থাকেন, কিন্তু এতে লেবাননী মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা বা তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। প্রকৃতপক্ষে এই দেশটি তার ভৌগলিক অবস্থান ও রাজনৈতিক ষ্ট্রাটেজির কারণে অত্যন্ত গুরুত্বের দাবীদার। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আরব বিশ্ব এর দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য।

উপরে ইংগিত প্রদান করা হয়েছে যে, অমুসলিম শক্তিসমূহ লেবাননের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়কে প্রভাব-শূন্য ও বেদখল করে তাদের স্থলে খ্রীস্টান সম্প্রদায়কে স্থায়ীভাবে ক্ষমতাসীন করার উদ্দেশ্যে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং সুষ্ঠুভাবে তা বাস্তবায়িত করে। সৌভাগ্যবশতঃ অতি সম্প্রতি এ সম্পর্কিত একটি দলীল পাওয়া গেছে। এটি একটি লিখিত প্রচারপত্র, যা খ্রীস্টীয় নেতৃবৃন্দ এবং মিশনারী কর্মীদের পথ প্রদর্শনের জন্য লিখা হয়েছিল এবং অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বিলিও করা হয়েছিল। নিম্নে পত্রটির অনুবাদ পেশ করা গেল।

[এটা হচ্ছে ফরাসী ভাষায় লিখিত সেই প্রচার পত্রের অনুবাদ যা ১৯১৯ইং সনে লেবাননের একটি গীর্জায় পাওয়া যায়।]

রাষ্ট্রমাতার পক্ষ থেকে তার একনিষ্ঠ সন্তানদের নামে

হে যীশুর পুত্রগণ,

হে ঐ সন্তানেরা, যারা নিজেদের আকীদা বিশ্বাস সংরক্ষণের জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী অপমান ও লাঞ্চনা সহ্য করেছ, হে ভদ্র ও পবিত্র সন্তানেরা, এই দশটি উপদেশ তোমরা সর্বদা স্মরণ রাখবে।

১. এই দেশ তোমাদের জন্যই অস্তিত্ব লাভ করেছে, যাতে তোমরা তোমাদের শিরদাড়া সোজা করে দাঁড়াতে পার এবং ঐতিহাসিক যুদ্ধের পর

নিজেদের স্বাধীনতা দ্বারা উপকৃত হতে পার। তোমাদের বিশ্বাস রাখা উচিত যে, ঈসায়ী (খ্রীস্টান) মানে লেবাননী। মরুভূমি থেকে আগমনকারী আরবদেরকে পুনরায় মরুভূমিতেই ফিরে যেতে হবে।

২. আমরা তোমাদের জন্য এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি যাতে তোমরা এই ভূখণ্ডে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপন করতে পার। যেমন, ভূমির মালিকানা ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, অর্থ সম্পদের নিশ্চয়তা এবং বিদেশী সংস্থাসমূহ স্থাপন। এখন তোমাদের কাজ হলো, এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষণ করা এবং দিনের পর দিন এগুলোর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা।

৩. বিনোদন কেন্দ্র এবং পর্যটন ব্যবস্থাদির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করো। আর যখন তোমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন কর তখন আরবদেরকে তাদের বসতি থেকে বের করে দাও। বৈরুত ছাড়া অন্য কোন শহরে যেখানে মুসলমান নেই-একটি সংরক্ষিত বন্দর নির্মাণের কথা কখনো ভুলো না। যখনই সুযোগ পাও এবং পরিস্থিতি অনুকূলে আসে তখন এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করো।

৪. ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সব রকম মাধ্যম অবলম্বন করো। শারীরিক ব্যায়াম, অস্ত্র তৈরী, যুবকদের সংগঠন এবং সেনাবাহিনীর প্রতি সব সময় মনোযোগী থাক। নিজেদের কথা গোপন রাখ এবং নিজেদের সাথীদের উপর আস্থা রাখ। কেননা শত্রুদের সাথে তোমাদের সংঘর্ষ অনেক ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী।

৫. সাহিত্য সংস্কৃতির নেতৃত্ব গ্রহণ করো। যেমন বই পুস্তক প্রকাশনা এবং যাবতীয় প্রতিষ্ঠান এবং একাডেমীর দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নাও। এটা কখনো সমর্থন করবে না যে, তোমার ভাষার উপাদানসমূহের উপর মুসলমানদের একচেটিয়া অধিকার রয়েছে। কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ ছাড়াই ঐ সমস্ত চিন্তাবিদদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাও যারা তোমাদের মত ও পথের বিরোধিতা করে।

৬. তোমরা নিজেদের আপোষের বিরোধকে সীমা ছাড়িয়ে যেতে দেবে না। কেননা বিধর্মীদের বিরুদ্ধে পরস্পর একতা ও ঐক্যই হচ্ছে তোমাদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। তাছাড়া তোমরা হচ্ছ যীশুর সন্তান যিনি আমাদের ঐক্যের শিক্ষাই দিয়েছেন।

৭. অন্যদের পরিকল্পনাসমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করো। তাদের সাথে মিশে যাও এবং কাজ করতে থাক, যাতে তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারসমূহ

অনায়াসে জানতে পার। বাহ্যিকভাবে তাদেরকে সাহায্য করতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু গীর্জা এবং পুরোহিতদের সাথে তোমাদের প্রতিটি ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা চাই এবং আপন সহৃদয় নির্দেশাদি কখনো অস্বীকার করতে নেই।

৮. প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য জায়গায় নিজেদের শির ও নিজেদের বৈশিষ্ট্যাদি উঁচু করে রাখা চাই। বিশ্বাস করো, স্বাধীন বিশ্বের যাবতীয় শক্তিসমূহ তোমাদের পিছনে রয়েছে। নিজেদের কার্জকর্ম এমনভাবে সমাধা কর যেন এ ব্যাপারে তোমরা কিছুই জান না।

৯. চিকিৎসাগত ও ব্যক্তিগত সেবাকর্মের মাধ্যমে আরবের রাজা-বাদশাহ্ ও নেতৃবৃন্দের নৈকট্য লাভের চেষ্টা করো। এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য হাসিলের সব চাইতে সংক্ষিপ্ত পথ। এর মাধ্যমে তোমাদের কর্মক্ষেত্র প্রশস্ত হবে, তোমাদের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পাবে এবং তোমরা অনায়াসে ঐ সমস্ত দেশে প্রবেশ করতে-পারবে যেখানে তোমাদের প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন।

১০. লেবাননী জাতীয়তার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খুব সতর্কতা ও দূরদর্শিতার সাথে কাজ করে যাও, যাতে নিজেদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা সংরক্ষণ করতে পার। অন্যথায় তোমাদের যাবতীয় চেষ্টা বিফলে যাবে।”

দারুল্ ইফতায় একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান

৪ঠা রজব ১৩৯৩ হিঃ, মুতাবিক ২রা আগস্ট ১৯৭৩ ইং বৃহস্পতিবার লেবাননের মুফতী শায়খ হাসান খালিদ প্রতিনিধিদলের সম্মানে এক মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেন। তাতে লেবাননের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী উস্তাদ তাকীউদ্দীন আস-সুলহ্, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী উস্তাদ সায়িব সালাম, বেশ কয়েকজন মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, উলামা, বিচারপতিবৃন্দ এবং বহু সংখ্যক সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ অংশগ্রহণ করেন।

লেবানন বিশ্ববিদ্যালয় এবং বৈরুতের আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সুব্হী সালেহ অভ্যর্থনা ভাষণ প্রদান করেন। এই লেখকের গ্রন্থাদি বিশেষ করে ‘আল-আরবু ওয়াল ইসলাম’ এবং ‘তাহরীকে নদ্ওয়াতুল উলামা’র উপর তিনি বিস্তারিত আলোকপাত করেন। এরপর এই লেখককে বক্তৃতা দিতে হয়। আমি আমার বক্তৃতায় ঐ সমস্ত বন্ধুবান্ধব ও মহান ব্যক্তিবৃন্দের শুকরিয়া আদায় করি যাদের কারণে প্রতিনিধিদলের অবস্থান আরামদায়ক ও

দায়িত্বপালন সহজ হয়েছে। এরপর আমি লেবাননী মুসলমানদের নাজুক অবস্থার উপর সতর্কতার সাথে আলোকপাত করি। যে দেশে তারা জীবন যাপন করছেন, যে সব সমস্যায় তারা সম্মুখখীন হয়েছেন, এক্ষেত্রে তাদের কি কি দায়িত্ব রয়েছে, অনুরূপ অবস্থায় তাদের প্রতি ইসলামের দাবী কি, আমি এই সমস্ত বিষয়ের উপর আলোকপাত করি। নিম্নে আমার বক্তৃতার সারাংশ, যা স্মৃতির উপর নির্ভর করে লিপিবদ্ধ করানো হয়েছে-পেশ করা গেল।

বিভিন্ন সভ্যতার মিলনক্ষেত্র এবং বিশ্বমঞ্চে মুসলিম জাতির করণীয়

"আমি আমার রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর প্রতিনিধিদল এবং আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু, বিখ্যাত ইসলামী গ্রন্থকার, সাউদী রাষ্ট্রের মজলিসে শুরার সদস্য, জেদ্দাস্থ বাদশাহ আবদুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ের উস্তাদ এবং প্রতিনিধিদলের সদস্য উস্তাদ আহমদ মুহাম্মদ জামালের পক্ষ থেকে হযরত মুফতিয়ে আজমের আন্তরিক শুকরিয়া আদায় করছি এজন্য যে, লেবানন অবস্থানকালে তিনি আমাদেরকে যারপরনাই সম্মানিত করেছেন। আমি বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় মুফতী সাহেবের শুক্‌রিয়া আদায় করছি এজন্য যে, তিনি আমাদেরকে লেবাননের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাত করার, তাদের সাথে পরিচিত হবার এবং আলাপ আলোচনা করার সুযোগ করে দিয়েছেন। উপস্থিত এই ব্যক্তিবর্গই আজ লেবাননের বিভিন্ন দল ও সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করছেন। যদি আমরা নিজে থেকে এই সব ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করতাম তাহলে কখনো সফল হতে পারতাম না।

শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ,

আমি আপনাদের দেশের নাজুক পরিস্থিতি এবং আপনাদের দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছি। আপনারা এমন এক দেশে বাস করছেন যে দেশ হচ্ছে বিভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের মিলনক্ষেত্র। আপনাদের দায়িত্ব অত্যন্ত বিরাট এবং আপনাদের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। আপনাদেরকে অত্যন্ত দূরদর্শিতা, সজাগ মস্তিষ্ক ও বিচার-বিবেচনার সাথে পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হবে। এই সাথে যে মহান ধর্মের সাথে আপনারা সম্পৃক্ত এবং যে বিরাট পয়গামের আপনারা প্রতিনিধি সে ধর্ম ও পয়গামের উপর আপনাদের পুরোপুরি বিশ্বাস ও আস্থা থাকতে হবে। উপরন্তু চিন্তার

জগতে আপনারা যে ভ্রান্ত ধারার মুকাবিলা করছেন তাতে আপনাদের দৃঢ়তা ও স্থিরতা থাকতে হবে। যে বিশ্বমঞ্চের দিকে সমগ্র বিশ্ববাসী কৌতূহল ভরে তাকিয়ে আছে সেখানে আপনাদেরকে এক একজন সুশিক্ষিত মুসলিম ও পাকা মু'মিনের পার্ট আদায় করতে হবে। মনে রাখবেন, আপনাদের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি পদক্ষেপ এবং প্রতিটি আচার–আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখা হচ্ছে এবং সেগুলোকে ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী আদর্শের প্রতিনিধিত্ব স্বরূপই বিবেচনা করা হচ্ছে।

বন্ধুগণ,

আপনারা দুনিয়ার সামনে প্রমাণ করতে পারেন যে, ইসলামের মধ্যে যোগ্যতা রয়েছে। আমি আপনাদের টিকে থাকার কথা বলছি না ; আমার মতে জীবিত থাকার যোগ্যতা অর্জন এবং সেজন্য পরমুখাপেক্ষিতা তথা অন্যের কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা একটি নিম্ন পর্যায়ের আচরণ ছাড়া কিছু নয়। আমি বলতে চাই যে, ইসলামের মধ্যে যোগ্যতা আছে, নেতৃত্ব আছে, মানুষের রাখালী করার শক্তি আছে। সর্বোপরি ঐ সমস্ত সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ আছে যেগুলোর সমাধান দিতে বিশ্বের তাবৎ চিন্তাবিদ ও আইনবিদরা অক্ষম ও অপরাগ। আপনারা এমনভাবে ইসলামের খিদমত করতে পারেন যা আরব জগত তথা ইসলামী জগতের কোন দেশই করতে পারবে না। এতে করে আপনারা ক্লান্ত বিপর্যস্ত আরব বিশ্ব ও মুসলিম বিশ্বের সামনে একটি আদর্শ নেতৃত্বের নমুনাও পেশ করতে পারেন।

সম্মানিত ভ্রাতৃমণ্ডলী,

আপনাদের দ্বিতীয় দায়িত্ব হচ্ছে এই যে, আপনারা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বর্তমান যুগের সাথে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছেন, যা অপর কোন আরব বা মুসলিম দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আপনাদের অবস্থান পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল স্রোতের মুখোমুখি। আপনারা বাস করছেন একটি নাজুক পরীক্ষা কেন্দ্র ও একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা কেন্দ্রে। এই অগ্নি পরীক্ষায় কিভাবে আপনারা উত্তীর্ণ হন, কিভাবে আপনারা এই টানাপোড়ন পরিস্থিতিতে শির উঁচু করে টিকে থাকেন সেদিকে সারা মুসলিম বিশ্ব আজ আগ্রহে তাকিয়ে আছে।

যদি আপনারা এই সংগ্রামে জয়ী হন এবং সক্ষম হন নিজেদের সঠিক পথ খুঁজে নিতে, তাহলে অন্যান্য আরব দেশ তথা গোটা বিশ্ব আপনাদের

দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে। নিঃসন্দেহে এটা আপনাদের দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার একটা পরীক্ষা, ঈমান বিশ্বাসের একটা অনুশীলন, দুঃসাহস ও দৃঢ়তা যাচাইয়ের একটা মাধ্যম। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদেরকে যে ক্ষমতা ও যোগ্যতার অধিকারী করেছেন এবং যেসব সুযোগ–সুবিধা আপনাদেরকে দিয়েছেন তা দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, আপনারা এই পরীক্ষায় যথাযথভাবে উত্তীর্ণ হতে পারবেন। লেবাননে আমরা যে কয়টা দিন কাটিয়েছি তাতে আমাদের সাহস বৃদ্ধি পেয়েছে, আমাদের আশা সজীব, সতেজ ও শক্তিশালী হয়েছে। আমি যেমন ত্রিপলীতে বলেছি, এই দেশে আপনাদের অবস্থানের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদেরকে এই কুসংস্কার ও রুচি বিকৃতির বন্যা প্রতিরোধ এবং ইসলাম দুশমনদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি লড়ে এই সুন্দর দেশে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করার যোগ্য লোক হিসাবে বিবেচনা করেছেন। এজন্য আপনাদের উচিত আল্লাহ্র শুকর আদায় করা। আমরা কায়মনোবাক্যে দু'আ করছি, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদেরকে সাহায্য করুন, প্রতিটি পদক্ষেপে আপনাদেরকে সুদৃঢ় রাখুন এবং ভরপুর করে দিন আপনাদের অন্তরকে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও পরস্পর সাহায্য–সহানুভূতির অনুপম প্রেরণা দ্বারা।

বন্ধুগণ,

আমি বিভিন্ন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মানব সমাজ সম্পর্কে যতটুকু পড়াশুনা করেছি সে আলোকে বলতে পারি, স্থান–কাল–পরিবেশ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দিকের প্রতি না তাকিয়ে ইসলামী সভ্যতাকে যদি পৃথক করে ফেলা হয় তাহলে পাশ্চাত্য সভ্যতার চাইতে অধিক শক্তিশালী, প্রভাবশালী ও চিত্তহরণকারী কোন সভ্যতার অভ্যুদয় আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে হয়নি। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে মানব সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এটা মানুষের আগ্রহ অনুপ্রেরণার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, জীবনমান বদলে দিয়েছে এবং চিন্তাধারার উপর ছায়াপাত করেছে। মোটকথা, মানুষের জীবনের এমন কোন দিক নেই যার উপর এর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এটা যেমন ঢুকেছে গরীবের পর্ণ কুটিরে, তেমনি ঢুকেছে ঐশ্বর্যশালীদের মনোরম প্রাসাদেও।

যেহেতু পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলামী সভ্যতা উভয়ই মানব জীবনের সাথে সম্পর্কে রাখে এবং মানুষের প্রয়োজনাদি নিয়ে আলোচনা করে, তাই

কোন কোন কেন্দ্র বিন্দুতে উভয় সভ্যতার সহমিলন ঘটে, আবার কোন কোন কেন্দ্রবিন্দুতে একে অন্য থেকে পৃথক হয়ে যায়।

চিন্তাবিদ হিসাবে এবং ইসলামের হিফাজতকারী হিসাবে আপনাদের কর্তব্য হলো, এই দুই সভ্যতার মধ্যে এমন একটি সূক্ষ্ম অথচ স্পষ্ট রেখা টেনে দেওয়া যার মাধ্যমে উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য চিহ্নিত হয়ে যায়। নির্লজ্জতা অশালীনতা, বেপর্দা, বর্বর সাজসজ্জা এবং ইসলাম সম্মত শালীনতা, পর্দা ও সতর্কতার মধ্যে যেন পার্থক্য নির্মীত হয়। ইসলাম সম্মত খেলাধূলা ও চিত্তবিনোদন এবং ইসলাম বিরোধী অবাধ কামলিপ্সা চরিতার্থ করণের মধ্যে যেন এমন লাইন টেনে দেওয়া হয়, যা একাধারে সূক্ষ্ম ও স্পষ্ট।–এমন সূক্ষ্ম রেখা টেনে দিলে হবে না যা এমন অস্পষ্ট যে, জনসাধারণ তা দেখতে পায় না। কেননা এমন রেখা দ্বারা কোন ফায়দা হবে না যা মানুষের নজরে পড়ে না। আবার সে রেখা এমন মোটা ও বিশ্রী হলে হবে না যা মানুষের কষ্টের কারণ হয়, যা তাদের দৈনন্দিন চাহিদা পূরনের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এটা অপ্রিয় হলেও সত্য যে, যে সমস্ত ইসলামী দেশ আজ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আধুনিক সভ্যতার দু' ধারা স্রোতে পতিত হয়েছে সেখানে এ ধরনের কোন সূক্ষ্ম ও স্পষ্ট লাইনের অস্তিত্ব নেই। ফলে সে সমস্ত দেশে অশান্তি দেখা দিয়েছে। সাধারণ মানুষ আধুনিক সভ্যতা ও চিন্তাধারা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য সে দিকে লাফিয়ে চলছে এবং শিক্ষিত যুবক সমাজ, এমন কি জ্ঞানীগুণীরা এই উদ্ভূত পরিস্থিতির সামনে অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই রেখা টানা আপনাদের জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ। কেননা আপনারা এমন এক দেশে বাস করেছেন যেদেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার ঢল নেমেছে এবং সেখানকার লোক এই সভ্যতাকে নিজস্ব করে নেওয়ার ব্যাপারে অগ্রগামীর ভূমিকা পালন করছে। এই পটভূমিতে আমি বর্তমান মুহূর্তে আপনাদের জন্য লেবাননী দারুল ইফতার সুযোগ্য সদস্যবৃন্দের জন্য যারা ইসলামী জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও ইসলামী আইন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। প্রার্থনা করছি এবং আশাও করছি যেন আপনারা এই বিরাট দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারেন। কেননা এর দ্বারা শুধু আপনাদের জীবন নয় বরং আমাদের জীবন তথা গোটা মুসলিম জাতির জীবন প্রভাবান্বিত হবে এবং এর নিরিখেই আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারিত হবে।

শ্রদ্ধেয় উলামাবৃন্দ,

আমার মতে আপনাদের তৃতীয় দায়িত্ব হলো, আপনারা যে সমাজে বাস করছেন সে সমাজের সামনে এমন জিনিষ পেশ করেন যা তাদের কাছে নেই। আপনারা সেই শূন্যতা পূরণ করুন, যার সৃষ্টি হয়েছে দীর্ঘদিন পূর্বে। আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আয়েশ-আরামের প্রাচুর্য এই সমাজকে আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক বদহজমীতে নিক্ষেপ করেছে। আর মানুষের স্বভাব এই যে, তারা সেই জিনিষকেই অধিক মূল্য দেয় যা তাদের কাছে নেই এবং সেই ব্যক্তিকেই সম্মান-সমীহ করে যার কাছে এ জিনিষ রয়েছে। আপনারা যদি সে জিনিষ দিতে পারেন তাহলে আপনাদের সমাজের লোক যারা জ্ঞান ও সভ্যতার শীর্ষে অবস্থান করছে, আধুনিক জ্ঞানের প্রাচুর্য, তীক্ষ্নধার কথাবার্তা এবং মনোমুগ্ধকর সাজ- সজ্জার সামনে কখনো নিজেদের বৈশিষ্ট্যকে বিলীন হতে দেবে না। তারা শুধুমাত্র সেই জিনিষেরই বশ্যতা স্বীকার করতে পারে যা তাদের কাছে দুষ্প্রাপ্য, যার জন্য তারা রিক্তহস্ত ও কাংগাল। পাশ্চাত্য সভ্যতার চোখে ধাঁধাঁনো রং-ঢংয়ের প্রতি তারা তখনই নিস্পৃহ হয়ে উঠবে যখন তাদেরকে সাদাসিধে জীবন, অল্পে তুষ্টি, সাধুতা ও সততার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তোলা হবে।

উপরোক্ত ক্ষেত্রে এই সমাজ দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। তারা একথা মানতে মোটেই রাযী নয় যে, বিশ্বে এমন কোন ব্যক্তি আছে, যে এই স্বাদ-আহলাদ ও আরাম-আয়েশের প্রতি নিস্পৃহ থাকতে পারে, উপেক্ষা করতে পারে এমন সব জিনিষকে, যাকে বিশ্ববাসী শুধু উচ্চমূল্য ও উচ্চ মর্যাদা দেয় না বরং তার পূজাও করে। আজ বিদ্যাবুদ্ধি, ধনসম্পদ এবং সভ্যতা-সংস্কৃতি মোটেই দুষ্প্রাপ্য নয়, বরং দুষ্প্রাপ্য হচ্ছে সেই জীবন্ত হৃদয় যাকে কেনা যায় না, যা কখনো হারিয়ে যায় না এবং যা কোনরূপ লেনদেনেরও ধার ধারে না। আজ সেই অন্তরই দুষ্প্রাপ্য, যা সজীবতা ও ঈমান-বিশ্বাসে সমৃদ্ধ।

আজ অন্তরের অবস্থা এই যে -আমি অবশ্য একথা কোন বিশেষ দেশ বা বিশেষ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বলছি না তা নির্ঘাত কেনাবেচার সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। কড়ি দেখালে আজ অন্তর কেনা যায়, কড়ি দেখালে তা বেচাও যায়। আজ জাতির নেতা ও নায়করা ক্ষমতার আসন ও পার্টি- নেতৃত্বের পেছনে পাগলের মত ছুটে চলেছেন- এটা করায়ত্ব করতে গিয়ে যে কোন মূল্য দিতে তারা যেন এক পায়ে খাড়া।

নিঃসন্দেহে এটা অন্তরের, উন্নত মানসিকতার এবং চরিত্রের অধঃপতনের আলামত। এ আলামত আজ ফুটে উঠেছে মুসলিম বিশ্বে অত্যন্ত বিশ্রী আকারে। এটাই আজ সঠিক নেতৃত্বের দুষ্প্রাপ্যতার অন্যতম বড় কারণ। মুসলিম বিশ্বে এ ধরনের কাংগাল ভিক্ষুকের সংখ্যা আজ অগণিত। ফলে আজ জনসাধারণ জাতীয় নেতাদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে।

আপনারা, যারা আজ ইসলামের পতাকাবাহী, যারা দাওয়াত ইলাল্লাহ্র বিরাট দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নিয়েছেন। তারাই জাতীয় নেতৃত্বের এই শূন্যতা দূর করতে পারেন। আপনারাই বর্তমান সমাজ এবং বর্তমান সভ্যতার সামনে এক নতুন জীবন, নতুন চরিত্র ও নতুন ব্যক্তিত্বের নমুনা পেশ করতে পারেন। আর এভাবেই আমাদের মাযহাব তার আস্থা এবং আমাদের জ্ঞানীগুণী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাদের হারানো সম্মান ও প্রতিপত্তি ফিরে পেতে পারেন।

আমি পুনরায় লেবানন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মুফতী শায়খ হাসান খালিদ এবং তার শিষ্য এবং বন্ধুবান্ধবকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যারা আমাদেরকে এভাবে সম্মানিত করেছেন এবং সুযোগ করে দিয়েছেন লেবাননী মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ করার, তাদের কাজকর্ম দেখার এবং তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানাদি সম্পর্কে অবগত হওয়ার।

যে স্থানগুলো আমরা দেখে আসতে পারিনি

শায়খ মুফতী হাসান খালিদ বার বার অনুরোধ করছিলেন, যেন আমরা বুকা সফর করি। বুকা হচ্ছে একটি বিরাট ইসলামী এলাকা। ঐ এলাকার একজন দূত আমাদের সাথে সাক্ষাত করতে এসেছিলেন এবং সেখানে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে গিয়েছিলেন। এভাবে বালবাক্ দেখার সুযোগও আমাদের ছিল। বালবাক একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক শহর। যখন থেকে আমরা নহ্ভ (আরবী ব্যায়াকরণ)—এর প্রথম বই পড়েছি তখন থেকে এই নামটি আমাদের কানে যেন গুঞ্জরিত হচ্ছে। কিন্তু সময়াভাবে উপরোক্ত স্থানগুলো দেখে আসা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। আমরা ৫ই রজব ১৩৯৩ হিঃ, মুতাবিক ১৩ই আগস্ট, ১৯৭৩ ইং শুক্রবার দামেশ্কে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। এমন মনে হচ্ছিলো, যেন কোন বস্তু আমাদেরকে দামেশ্কে যেতে বাধ্য করছে এবং সেখানে গিয়ে এমন একটি নতুন

অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছি যার যথাযথ মুকাবিলা করা সম্ভব হচ্ছে না। এ সম্পর্কে আগামীতে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

সাক্ষাৎকার

এই সফরে যাদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটে তাদের মধ্যে সংগ্রামী আলিম শায়খ নামীরের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য তিনি আমাদের একজন পুরাতন বন্ধু। তার সাথে প্রথম পরিচয় হয় ১৯৫১ ইং সনে, দামেশক নগরীতে। আমার দামেশ্‌ক সফরকালে তিনিও সেখানে অবস্থান করছিলেন। তিনি বৈরুতস্থ 'জাম্‌ইয়াতুর রাবিতাতিল্ ইসলামিয়াহ'-এর সভাপতি (সফর) এবং জাম্‌ইয়াতের অধীনে পরিচালিত 'মাদরাসাতুল্ ফাত্‌হিস্ সানূভিয়াহ'-এর সেক্রেটারী (নাযিম)। এটি মেয়েদের একটি মাদ্রাসা। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৬৬ইং সনে। মাদরাসাটি লেবাননের মুসলিম সমাজের একটি শুন্যতা পূরণ করেছে। এখান থেকে সৃষ্টি হচ্ছে ধর্মপরায়ণা, সুশিক্ষিতা ও সু-অনুভূতিশীলা মহিলাদের একটি বিরাট দল। ইসলামী শিষ্টাচার, ইসলামী নীতির আনুগত্য ও প্রচার প্রসারে এই মাদরাসা একটি অতি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে।

উস্তাদ মুহাম্মদ মুবারকের সাথেও আমাদের সাক্ষাত হয়। তিনি হচ্ছেন সিরিয়ার প্রাক্তন মন্ত্রী, দামেশ্‌কস্থ 'কুল্লিয়াতুশ্ শারীআহ'-এর প্রাক্তন প্রিন্সিপাল এবং মক্কাস্থ কুল্লিয়াতুশ্ শারীআহ' এর বর্তমান অধ্যাপক। ইসলামী চিন্তাবিদ ও সংস্কারকদের প্রথম সারিতেই তার স্থান।

উস্তাদ আমর 'আউকের সাথেও আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তিনি লেবাননের 'ইবাদুর রহমান' দলের প্রতিষ্ঠাতা এবং ইসলামী দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী।

মাকতবে ইসলামী, বৈরুত -এর মালিক উস্তাদ যুহায়র শাভিশ-এর সাথেও আমাদের দেখা হয়। তিনি বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদের লেখা বিরাট সংখ্যক শিক্ষা ও চিন্তামূলক পুস্তক বিশেষ যত্নের সাথে প্রকাশ করেছেন। এভাবে আমার পুরাতন বন্ধু উস্তাদ আলী হাসান ফিদআক-এর সাথেও সাক্ষাৎ হয়। তিনি একদা জেদ্দার মীর ছিলেন। তাঁর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৫১ইং সনে, যখন তিনি অর্থমন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং বেতার ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সবেমাত্র আবির্ভূত হতে শুরু

করেছেন। তিনি, আমাদের মধ্যকার এই সম্পর্কে অত্যন্ত যত্নের সাথে সংরক্ষণ করে চলেছেন। তিনি হচ্ছেন এই লেখকের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের অন্যতম।

লেবাননের সমগ্র ইসলামী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের উল্লেখ করা বা সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা পর্যালোচনা করার স্থান এটা নয়। এজন্য দীর্ঘ অবস্থান এবং দীর্ঘ অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। তবে এমন কিছু প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রতি ইংগিত প্রদান করা সমীচীন মনে করছি, যেগুলো দ্বারা সেখানকার মুসলিম সমাজ প্রভাবিত হয়েছে।[৯] যেমন, জামইয়াতুল মকাসিদিল ইসলামিয়াহ্, জাম্ইয়াতু তালীমি আব্নাইল্ মুসলিমীন ফিলকুরা, মুয়াস্সাতুল্ খিদ্মাতিল ইজ্তিমাইয়াহ, জাম্ইয়াতুল মুহাফাযাতি আলাল্ কুরআনিল কারীম, জামইয়াতুর রাবিতাতিল্ ইসলামিয়াহ ফী বৈরুত এবং আল-জামাআতুল ইসলামিয়াহ। এগুলো হচ্ছে ঐ সমস্ত সংস্থার বহির্ভূত, যেগুলোর উল্লেখ এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনে রয়েছে।

সাউদী দূতাবাসের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা

৪ঠা রজব হিঃ ১৩৯৩ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সাউদী দূতাবাসের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদলকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে শাহজাদা আমীর মাতআব বিন আবদুল আযীয (বাদশাহ ফায়সলের ভ্রাতা), আরব এবং মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্রদূতবৃন্দ, কূটনীতিকবৃন্দ, শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ এবং বিরাট সংখ্যক সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। এটা ছিল প্রতিনিধিদলের লেবানন সফরের শেষ ধাপ। ৫ই রজব ১৩৯৩ হিঃ, মুতাবিক ৩রা আগষ্ট ১৯৭৩ ইং শুক্রবার, আমাদেরকে দামেশ্ক সফরে রওয়ানা হতে হবে।

টীকা

১. ইমাম আবূ হানীফা বাগদাদের এবং ইমাম আওযায়ী বৈরুতে সমাধিস্থ হন।
২. তিনি দামেশকে সমাধিস্থ হন।
৩. তিনি বাগদাদে জীবন অতিবাহিত করেন এবং সেখানেই সমাধিস্থ হন।
৪. দু'টি মাদরাসার নাম, যার একটি ছিল বাগদাদে এবং অন্যটি দামেশ্কে।
৫. উস্তাদ আবুদর হাকীম আবিদীন ইখওয়ানুল মুসলিমীন ও দাওয়াতে ইসলামী গ্রুপের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত মিসরে ইখওয়ানের সেক্রেটারী ছিলেন। একজন

সাহিত্যিক, কবি বাগ্মী ও আইনজ্ঞ ছাড়াও আত্মীয়তার দিক দিয়ে তিনি হচ্ছেন ইমাম হাসানুল বান্না শহীদ (র.)–এর ভগ্নীপতি।

৬. আমীনুর রায়হানী একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর গ্রন্থাদি ও রচনাসমূহ এই শতাব্দীর চতুর্থদশকে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। বেশীর ভাগ আরব দেশ এবং সেখানকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দের সাথে তাঁর অত্যন্ত বন্ধুসুলভ ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। তিনি ১৯৪০ ইং সনে ইন্তিকাল করেন।

৭. মাজাল্লাতুল মারাকিব ঃ দ্বিতীয় খন্ড ঃ সংখ্যা ৭২ ঃ মে, ১৯১০ ইং মুতাবিক জমাদি-উল-উলা, ১৩২৮ হিঃ।

৮. আল-মুসলিমূনা ফী লেব্‌নানা মাওয়াত্বিনূনা লা লেআ'য়া ঃ উস্তাদ মুহাম্মদ আলী আল্-মাহামী।

৯. আমরা জানতে পেরেছি, এ ধরনের প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সংখ্যা কয়েকশত এবং তার বেশীর ভাগই বৈরুতে অবস্থিত।

দামেশ্কে দু'দিন

৪

বৈরুত থেকে দামেশ্‌ক

বৈরুতের সাউদী দূতাবাস দামেশকের সাউদী দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করে জানিয়ে দেয় যে, রাবিতার প্রতিনিধিদল ৫ই রজব, ১৩৯৩ হিঃ, মুতাবিক ৩রা আগস্ট, ১৯৭৩ ইং শুক্রবার বৈরুত থেকে দামেশ্‌ক রওয়ানা হচ্ছে।

আমরা খুব ভোরেই সফরের জন্য তৈরী হয়ে যাই। আমাদের ইচ্ছা ছিল খুব সকাল সকাল রওয়ানা হয়ে যাওয়ার। কেননা সেদিন ছিল শুক্রবার। তাছাড়া আমাদেরকে লেবানন–সিরিয়ার সেই সীমান্ত অতিক্রম করতে হবে যা তখনকার দিনে বন্ধ ছিল। আমাদের সফর যেহেতু রাবিতায়ে আলমে ইসলামীর প্রতিনিধি হিসাবে ছিল এবং রাবিতায়ে আলমে ইসলামী ইতিমধ্যে জেদ্দা ও দামেশ্‌কের সরকারী মহলের সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ স্থাপন সব কিছু ঠিকঠাক করে রেখেছিল, তাই আমাদের সীমান্ত অতিক্রম করার পথে আর কোন বাধা ছিল না; বরং রাবিতার পূর্ব–যোগাযোগের ফলশ্রুতি স্বরূপ সিরিয়া সরকার প্রতিনিধিদলের অভ্যর্থনা ও আতিথ্যের প্রতিও তাদের ইচ্ছা ও আগ্রহের কথা প্রকাশ করেছিলেন।

তাছাড়া দামেশ্‌ক থেকে সাউদী দূতাবাসের একজন প্রতিনিধিও বৈরুতে এসেছিলেন এবং তিনি প্রতিনিধিদলকে এই মর্মে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক। তারপর তিনি এতদ্‌সংক্রান্ত সরকারী কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য আমাদের আগেই 'সাতূরা' পৌঁছে গিয়েছিলেন। এরপর আমরাও সেখানে পৌঁছি এবং সফর সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সমাধা করি।

দামেশ্‌কের সাথে আমার পুরাতন সম্পর্ক

আমরা দামেশ্‌কের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। দামেশ্‌কে আমি ইতিমধ্যে একাধিকবার আমার জীবনের সর্বাধিক উপভোগ্য মুহূর্তগুলো কাটিয়েছি। 'হারামায়ন শারীফায়নের পর আমি যদি বিশ্বের কোন শহরকে প্রিয়তম আখ্যা দেই তাহলে সেটা হচ্ছে এই দামেশ্‌ক। আমি এর অনেক ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, বাগ–বাগিচা ও মনোরম দৃশ্যাবলী সম্পর্কে অবহিত রয়েছি। দামেশ্‌কে আমার অনেক প্রাণপ্রিয় বন্ধুবান্ধব ছিলেন, যাদের সংগে ধ্যান–ধারণা ও চিন্তাভাবনায় আমার চমৎকার মিল ছিল। প্রতিবারই আমার দামেশ্‌কে অবস্থান ছিল অত্যন্ত

উপভোগ্য। অন্তরে দারুণ শান্তি পেতাম। আবহাওয়াও হত আমার খুব অনুকূল। আমি যখন দামেশ্‌ক সম্পর্কিত শাওকীর নিম্নের কবিতাটি তখন তাতে অতিরঞ্জিত কিছু আছে বলে অন্ততঃ আমার মনে হত না।

امنت بالله و استثنيت جنته
دمشق روح و جنات و ريحان

"আমি আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করি। আমি তার বেহেশতকে ব্যতিক্রান্ত রেখে বলছি, দামেশ্‌ক হচ্ছে আগাগোড়া আরাম-আয়েশ, বাগ-বাগিচা ও সুখদ উদ্যান ভর্তি একটি স্থান।

আমরা দামেশ্‌কের দিকে এগিয়ে চললাম। বহিরাগতদের জন্য দামেশ্‌-কের রাস্তা হচ্ছে বিশ্বের সুন্দরতম রাস্তাসমূহের অন্যতম। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের মধ্যে দিয়ে আমরা পথ অতিক্রম করছিলাম। হামাসী কবি সমতাহ্ বিন আবদুল্লাহ্‌র নিম্নলিখিত কবিতাটি তখন আমি অলক্ষ্যেই আবৃত্তি করছিলাম,-

بنفسى تلك الارض ما اطيب الزلى + و ما احسن المصطاف و المتربعا
و ليست عشيات الحمى بـرواجع + عليك و لكن خل عينيك تـدمعا

-"এ পুণ্য ভূমির জন্য প্রাণ উৎসর্গ হোক মোর
আহা কী উর্বর টিলা, আহা কী যে বসন্ত সুন্দর
কী যে চারু শোভাময় গ্রীষ্ম নিবাসগুলো এর
এ স্মৃতি অম্লান রবে পরতে পরতে হৃদয়ের
ফিরে আর পাবো নাতো এই দিন আর এই ঠাঁই
এ অক্ষী যুগলে হামী নিভৃতে কাঁদিতে দাও তাই"।

দামেশ্‌কে আমার প্রথম সফর ছিল ১৩৭০ সনের রমযান,-যিলকাদা মুতাবিক ১৯৫১ইং সনের জুন-আগস্ট মাসে। তখন ছিল কর্নেল আদীব আশ্-শিশক্লীর শাসনকাল। আমার সেখানে অবস্থানকাল ছিল দেড় মাস। আমি আমার তখনকার অবস্থা ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করেছিলাম।[১]

আমার দ্বিতীয় সফর ছিল ১৩৭৫হিঃ, মুতাবিক ১৯৫৬ইং সনে। অবস্থানকাল ছিল তিন মাস। আমার সফর ছিল দামেশ্‌ক বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কুল্লিয়াতুশ্ শারীআহ্-এর ভিজিটিং প্রফেস্‌র হিসাবে। তখন সিরিয়া জামহুরিয়ার সদর (প্রেসিডেন্ট) ছিলেন শাক্‌রী আল-কুওয়াতিলী বেক।

এক নযরে অতীত সিরিয়ার সামাজিক অবস্থা

যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য অতীত সিরিয়াকে তার প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রসমূহ থেকে পৃথক মর্যাদা দান করেছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, কোন কোন বিষয়ে কিছু মত–পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সেখানকার জন-সাধারণের মনে মাযহাবের প্রকৃষ্টতা সম্পর্কে কোনরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। তারা উলামাকে সম্মান-সমীহ করত এবং ইসলামী আদাব–আখলাক ও শিষ্টাচারসমূহ মেনে চলত। অবশ্য এই সাথে তাদের মধ্যে প্রাচ্যের আচার আচরণেরও প্রচলন ছিল। গোটা দেশের উপর একাধারে আরবী ও ইসলামী ছাপ পরিলক্ষিত হত। বেপর্দা ও অশালীলতা প্রথমে কদাচিৎ এবং পরবর্তী সময়ে যৎকিঞ্চিত নযরে পড়ত। অবশ্য সমাজ যে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তা উপলব্ধি করার জন্য খুব দূরদৃষ্টি বা বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন ছিল না।

বিপদ ঘন্টা বাজতে শুরু করেছিল এবং পরিস্থিতির চাহিদা ছিল, ইসলামের এবং দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে যারা চিন্তাভাবনা করেন সেইসব চিন্তাবিদ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা অবিলম্বে ঐ বিপদকে সামাল দিতে চেষ্টিত হবেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদরা গজিয়ে উঠেছিল। একের পর এক মন্ত্রীসভা দ্রুত ভেংগে যাচ্ছিল। এক অশান্ত ও অনিশ্চিত অবস্থা বিরাজ করছিল। উলামার মধ্যে মতবিরোধ ছিল এবং তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে কাদা ছুড়াছুড়িতে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। ধর্মীয় দল ও সংস্থাসমূহের মধ্যে ঐক্য ও মমত্ববোধের দারুণ অভাব দেখা দিয়েছিল।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, যার কারণে সিরিয়া অন্যান্য প্রতিবেশী দেশ থেকে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল এবং যে বৈশিষ্ট্যটি যে কোন বহিরাগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করত তা হলো, সেখানকার শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য এবং ধন–সম্পদের প্রাচুর্য। অতি প্রাচীনকালেই আল্লাহ্ তা'আলা ঐ দেশটিকে ফলফলাদি ও শস্যদানায় ভরে দিয়েছিলেন। চতুর্দিকে বেগবান নদীনালা ও স্বচ্ছ পরিষ্কার ঝর্ণা প্রবাহিত ছিল ; বাগ–বাগিচা ও উদ্যানরাজির প্রাচুর্য ছিল ; আর ব্যবসা–বাণিজ্য ছিল উন্নতির শীর্ষে। বৈধ জীবিকা অর্জনের পথ ছিল উন্মুক্ত। জিনিষ পত্রের অগ্নিমূল্য ছিল না এবং কোন জিনিষ দুষ্প্রাপ্যও ছিল না। বেকারত্ব ছিল না, শঠতা প্রতারণারও অস্তিত্ব ছিল না। উৎপাদন ছিল প্রচুর। তাই কোন ব্যক্তিকে বেকার, অসহায়, চিন্তিত বা দুঃখ ভারাক্রান্ত দেখা যেত না। সাধারণ মানুষ আয়েশ আরামের জিন্দেগী অতিবাহিত করছিলো। তাদের

খাওয়া-পরা ও চলাফেরায় শান্তি ও স্বস্তি ছিল। গ্রীষ্মকাল কাটানোর জন্য মানুষ পাহাড়সমূহে (যা দামেশ্‌ক থেকে খানিক দূরে অবস্থিত) এবং অন্যান্য চিত্তবিনোদন কেন্দ্রে চলে যেত। সেখানে ব্যাপকভাবে আমোদ-স্ফূর্তিমূলক খানা পিনার (বনভোজনের) আয়োজন করা হত।২

আমি যখন সিরিয়ার অধিবাসীদেরকে উপরোক্ত প্রাচুর্য ও আয়াশ-আরামে লুটোপুটি খেতে দেখতাম তখন আমার ভয় হত, না জানি, সিরিয়ার অধিবাসীরা আবার এই সমস্ত অবদান ও নিয়ামাতের প্রতি কৃতঘ্ন হয়ে না বসে এবং আল্লাহ্‌র যথাযথ শুক্‌রিয়া আদায় করা থেকে বিমুখ হয়ে না পড়ে।

এই স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি ও নিয়ামাতে পরিপূর্ণ জীবনের অধিকারী সমাজের যা মোটামুটিভাবে ছিল ইসলামের চারিত্রিক শিক্ষার অনুসারী এবং প্রাচ্যের আচার-আচরণ ও চাল-চলনেরও ভক্ত-একটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তার সদস্যদের মধ্যে পরস্পর আস্থা, শুভেচ্ছা, ভ্রাতৃত্ব সহানুভূতি ছিল। ফলে ঐ সমাজে বিরাজ করছিলো এর প্রশান্তি।

জনৈক ইউরোপীয় পণ্ডিত, যিনি দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন সময়ে সিরিয়া গিয়েছিলেন এবং সেখানে দীর্ঘদিন অবস্থানও করেছিলেন, উপরোক্ত প্রাচুর্য ও প্রশান্তি দেখে বেশ প্রভাবিত ও বিস্মিত হয়েছিলেন।

মুহাম্মদ আসাদ (পূর্ব নাম-LEO, POLDVEISS) তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'রোড টু মক্কায় (ROAD TO MECCA) দামেশ্‌কের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন-

" একটা নতুন উপলব্ধির উত্তেজনা নিয়ে, যেসব বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমার বিন্দু মাত্র ধারণাও ছিল না সেগুলোর প্রতি চোখ খোলা রেখে আমি সেই গ্রীষ্মের দিনগুলোতে দামেশ্‌কের পুরোনো বাজারের অলিগলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, আর তার বাসিন্দাদের জীবনকে যে অপূর্ব প্রশান্তি ঘিরে রেখেছে তা অনুভব করছিলাম। ওদের অন্তরের এই নিরাপত্তাবোধ লক্ষ্য করতাম একের প্রতি অন্যের ব্যবহারে-যে আবেগ উষ্ণ মর্যাদাবোধের সাথে এরা একে অপরের সাথে দেখা করে বা একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নেয় তাতে-একে অপরকে বন্ধু ভেবে শিশুদের মতো পরস্পর হাত ধরে দু'টি মানুষ যেভাবে এক সাথে পথ চলে তার মধ্যে দোকানীদের একের প্রতি অন্যের আচরণের এবং ছোট ছোট দোকানের সেই

সব ব্যবসায়ী যারা অবশ্যই পথচারীদের চিৎকার করে ডাকবে তাদের ভাবভঙ্গিতে। মনে হত না যে, এ সব নাছোড়বান্দা দোকানীদের অন্তরে কোন ভয়–ভীতি আছে কিংবা কোন ঈর্ষা আছে। তাদের পারস্পরিক বিশ্বাস এতটা প্রগাঢ় যে, কোন দোকানী যখন কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যাবার দরকার হয় তখন সে তার দোকান পাট তার প্রতিবেশী এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দোকানদারের হিফাজতেই রেখে নির্বিঘ্নে চলে যায়। আমি প্রায়ই দেখতাম, এভাবে ফেলে যাওয়া দোকানের সামনে যখনি কোন সত্যিকারের খদ্দের থেমেছে এবং বুঝা যাচ্ছে, সে (খদ্দের) নিজের মনে মনে ভাবাগোনা করছে, দোকানদার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, না পাশের দোকান থেকে উদ্দিষ্ট জিনিষটি কিনে নিয়ে চলে যাবে। অমনি দেখা গেছে পাশের দোকানীটি, যে আসলে অনুপস্থিত দোকানীর প্রতিদ্বন্দ্বী, এগিয়ে এসে (দণ্ডায়মান খদ্দেরকে) জিজ্ঞেস করছে, 'আপনার কি চাই ? তারপর তার কাছে বিক্রি করছে সে উদ্দিষ্ট জিনিষটি, অনুপস্থিত দোকানীর দোকান থেকেই। সে নিজের জিনিষ বিক্রি না করে অনুপস্থিত প্রতিবেশীর জিনিষই বিক্রি করছে এবং দামটা রেখে দিচ্ছে প্রতিবেশীরই বেঞ্চির উপর। ইউরোপে এ ধরনের বেচাকেনার নমুনা কি কেউ কোথাও দেখেছে ?[৩]

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামী কেন্দ্রসহ প্রাচ্য দেশসমূহে যুগের আবর্তন বিবর্তন এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জড় দর্শনের বিষাক্ত প্রভাবের ফলে উপরোক্ত অবস্থা, ভ্রাতৃত্ব, শুভেচ্ছা ও গোষ্ঠীগত কল্যাণ কামনার প্রবৃত্তি যার ফলশ্রুতিতে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও আত্মিক প্রশান্তি বিরাজ করত, এখন তা প্রায় খতম হয়ে গেছে।

কিন্তু ইতিপূর্বে যে দুবার আমি সিরিয়ায় যাই তখন সেখানকার সমাজে এ সমস্ত জিনিষ মোটামুটি বিদ্যমান ছিল।

সিরিয়ার সামাজিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন

তৃতীয়বার ১৯৬৪ইং সনে ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে আমি সিরিয়া যাই এবং দামেশ্‌কে তিন দিন অবস্থান করি। ইতিমধ্যে সিরিয়ায় বেশ কয়েকটি সামরিক বিপ্লব ঘটে গেছে, যা সেখানকার সামাজিক জীবনের ভিত্তিসমূহ নড়বড়ে এবং গোটা সমাজকে তছনছ করে দিয়েছে। আমি আক্ষেপের সাথে লক্ষ্য করি, সেই চিত্তাকর্ষক দৃশ্যাবলী আর নেই,

সিরিয়া বঞ্চিত হয়ে পড়েছে তার স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য থেকে। বাগবাগিচা যা সেখানকার অর্থনৈতিক ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত, অনুৎপাদনের শিকারে পরিণত হয়েছে। বারিবর্ষণ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে, উদ্বেলিত ঝর্ণাসমূহও শুকিয়ে গেছে, ফলে পানির পরিমাণ স্বাভাবিকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

বলা যেতে পারে যে, এগুলো হচ্ছে এমন প্রাকৃতিক ঘটনা, যার সাথে রাজনীতি এবং পরিকল্পনা প্রণয়নের কোন সম্বন্ধ নেই। আমরা এ ব্যাপারে কোন বিতর্কে যেতে চাই না। তবে এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সরকারগুলোর স্থিতিহীনতা, ঘন ঘন রদ-বদল এবং বার বার রাষ্ট্রনীতি ও প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের ফলে দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জন-সাধারণের মনে মারাত্মক অস্বস্তি, নৈরাশ্য ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। আর এই অনিশ্চয়তা পরিলক্ষিত হয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে। শিক্ষা, চিন্তা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সরকারী কাজকর্ম, ব্যক্তি জীবন, গোষ্ঠী জীবন তথা সর্বক্ষেত্রে এই অনাস্থার ভাব ফুটে উঠে। বন্ধুবান্ধবের কথাবার্তা এবং চেহারা ছবিও এ সাক্ষ্যই দেয় যে, সমাজতান্ত্রিক নায়করা দেশকে উন্নত করার, সুখ-স্বচ্ছন্দ্যে ভরে তোলার, জনসাধারণের মর্যাদা বৃদ্ধি করার, দেশে শান্তি ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করার যে অগণিত সুখ স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন তা কী নিদারুণভাবে ভেঙ্গে গেছে। তারা যে সমস্ত দাবী পূরণের গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেগুলো শুধু যে তারা পালন করেন নি, তাই নয়, বরং কর্মক্ষেত্রে সেগুলোর বিরোধিতায় তাদেরকে খড়্গ হস্ত দেখা গেছে। এ ক্ষেত্রে মাযহাব, আখলাক, রূহ প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে।

ঐ নেতাদের শ্লোগান ছিল ভুখার রুটির ব্যবস্থা, জাতির মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং ফুটপাতের মানুষের পৃষ্ঠপোষকতা। অবশ্য যখন এই সমস্ত দাবী তারা পূরণ করতে পারলেন না তখন অন্ততঃ এতটুকু স্বীকার করলেন যে, সমাজতন্ত্র জাতীয়তা, কমিউনিজম এ সব বিবেক বর্জিত ও মনুষ্য বিরোধী জীবন দর্শন। এগুলোর বুলিসমূহ শুধুমাত্র আবেগ উচ্ছ্বাসে ভরা অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার মাপকাঠিতে পরখ করা নয়। উপরন্তু এগুলো আদর্শ যার লক্ষ্য ধ্বংস কিংবা নিয়মশৃঙ্খলা থেকে পলায়ন ছাড়া কিছু নয়।

এবার ৮ বছর পর আমি এই চতুর্থ বারের মত সিরিয়া এলাম। এই সময় মাস ও বছরের হিসাবে খুব দীর্ঘ নয়, তবে বিস্ময়কর ঘটনার কারণে খুবই গুরুত্ববহ। এই সময়ে দেশ বেশ কয়েকটি বিপ্লবের আঘাতে জর্জরিত

হয়েছে এবং ইতিমধ্যে অনেক বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। যেন এই সময়টুকু ছিল মুসলিম আরবজাতির ইতিহাসে এমন একটি সিদ্ধান্তকর সময়, যার মূল অনেক গভীরে এবং ফলশ্রুতি ও প্রভাব অনেক সুদূর প্রসারী।

যে সব জাতির মাথার উপর তরবারি ঝুলছে এবং যারা সরাসরি বিপদের মুখোমুখি হয়ে আছে তাদের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন এবং এই ঘটনা দুর্ঘটনা কি প্রভাব ফেলতে পারে আমি তার একটা পরিমাপ করার চেষ্টা করছিলাম, এমন সময় আমার দৃষ্টি সিরিয়া সীমান্তে স্থাপিত একটি বোর্ডের উপর পড়ল যার উপর জ্বলজ্বলে অক্ষরে লেখা ছিল 'বাছ পার্টি৪ বানোয়াট সীমান্তরেখার বিরোধী এবং আঞ্চলিকতার দুশমন।

আমি নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম তাহলে ১৯৫১ইং থেকে ১৯৫৬ইং সনের স্বেচ্ছাচারী যুগের অবস্থা ভাল ছিল, বিশেষ করে সীমান্ত সম্পর্কিত ব্যাপারে না,এই সময়ের অবস্থা যখন আমি সিরিয়ায় প্রবেশ করছি?

দামেশ্‌কে পদার্পণ

আমরা আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে দামেশ্‌কে প্রবেশ করলাম। প্রথমে সাউদী দূতাবাসে গেলাম। সাউদী রাষ্ট্রদূত শায়খ মুহাম্মদ মাতলাক আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেন যে, 'ফান্‌দাক উমাইয়াতুল জাদীদ'–এ আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।৫ হোটেলে পৌছে জানতে পারলাম, সিরিয়া জাম্‌হূরিয়ার মুফতী শায়খ আহমদ কুফতারু প্রতিনিধিদলকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এসেছিলেন এবং দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষারতও ছিলেন। কিন্তু 'জামিউল বাগায়' তাঁর ভাষণদানের একটি কর্মসূচী থাকায় চলে গেছেন। সে কর্মসূচী শেষ করেই তিনি আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসবেন। তাঁর স্থলে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন দামেশ্‌কের কাযী শায়খ বাশীর আলবানী এবং মুফতী সাহেবের সুযোগ্য পুত্র সাইয়িদ যাহির কুফতারু।

তাঁরা উভয়ে আমাদেরকে খোশ আমদেদ জানা এবং শায়খ সাহেবের সালামও পৌছিয়ে দেন। কিছুক্ষণ পর শায়খ আহমদ কুফতারুও হোটেলে আসেন। ৮ বছর পর পুনরায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলো এবং সংগে সংগে সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ল যখন আমরা উভয়ে প্রায়ই 'হাই একরাস্থ' তাঁর বাসভবনে কিংবা শায়খ মুহীউদ্দীনে৬ কিংবা 'গাওতায়' দীর্ঘক্ষণ একত্রে বসে থাকতাম এবং বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করতাম।

জামি উমুভী

জুমআর নামায আদায়ের জন্য আমরা জামি উমূভীতে গেলাম। এজন্য অন্তরে দারুণ আগ্রহ পোষণ করছিলাম এবং এই প্রেক্ষাপটে দামেশ্‌ক সফরের জন্য জুমআর দিন ধার্য করেছিলাম। জামি উমূভীতে নামায আদায় করা একাধারে সৌভাগ্যের এবং আত্মিক তৃপ্তির ব্যাপার। আমি যখন মসজিদে প্রবেশ করলাম এবং জুমআর খুতবা শুনলাম তখন শাওকীর দামেশ্‌ক সম্পর্কিত কবিতাটি মনের মধ্যে ভাসতে লাগলো, চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো, আবেগ উচ্ছ্বাসের এক ঝড় বয়ে গেল অন্তরাকাশে, স্মরণে পড়লো অতীতের অনেক ঘটনাবলী। শাওকী তাঁর কবিতায় বলেছেন–

وقفت بالمسجد المخزون آسأله + هل في المصلى او المحراب مروان
تغيرا المسجد المخزون و اختلفت + على المنابر احرار و عبدان
فلا آلاذان آذان في منارته + اذ تعالى ولا الاذان آذان

" আমি এই দুঃখভারাক্রান্ত মসজিদে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, তারপর জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম, মুসল্লা কিংবা মেহরাবে মারওয়ানের মত কোন শক্তিশালী শাসক কি (এখনো) বিদ্যমান আছে ?

এই চিন্তান্বিত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত মসজিদ, যুগের আবর্তন বিবর্তনের অনেক তামাশা দেখেছে, এর মিম্বরে কখনো চড়েছে স্বাধীন মানুষ, আবার কখনো ক্রীতদাস। এখন না আযানের ঐ মিষ্টিধ্বনি আছে যা একদা মিনারার উপর দিয়ে উত্থিত হত, আর না সেই শ্রোতা আছে যারা এই আযান শুনে উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠত।

সাক্ষাৎকার

পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে আমার দামেশ্‌কে আসার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। তাঁদের বেশীর ভাগই এখন আর দামেশ্‌কে নেই। অন্যত্র চলে গেছেন। শুধুমাত্র ওরাই রয়ে গেছেন যারা বার্ধক্যের কারণে থাকতে বাধ্য কিংবা যারা এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন যে, নিজেদের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই ইসলামরূপী আমানতের হিফাজত করবেন এবং সেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে এখানেই পড়ে থাকবেন। কেননা তারা ভালভাবেই জানেন যে, সিরিয়া সর্বদাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত রয়েছে। সিরিয়ার প্রকৃষ্টতা

বর্ণনায় যেরূপ বিরাট সংখ্যক সহীহ্ হাদীস রয়েছে অন্য কোন দেশ বা শহরের ক্ষেত্রে সেরূপ নেই বললেই চলে। যা হোক, কোন কোন বন্ধু নিজে থেকেই আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল, পরবর্তী দিনগুলোতে আমরা নিজেরাই অন্যান্য বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাব।

সিরিয়ার দৈনন্দিন জীবনে কিছু নতুন পরিবর্তন

আসরের পর যখন আমরা হোটেল থেকে বের হয়ে দামেশ্কের রাস্তায় চলতে লাগলাম তখন নতুন দু'টি পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। এক ঃ মানুষের কথাবার্তায় অতিরিক্ত ধরনের গোপনীয়তা রক্ষা ও সতর্কতা অবলম্বনের মনোবৃত্তি। অনুভূত হচ্ছিলো, যেন প্রতিটি লোক বিশ্বাস করে যে, গোপনে কেউ তাকে নিরীক্ষণ করছে এবং তার প্রতিটি কথাবার্তা রেকর্ড করছে। প্রতিটি লোককে যেন পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত ভাষ্যের প্রতিচ্ছবি বলে মনে হলো।

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ

অর্থ ঃ ''মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করবার জন্য তৎপর প্রহরী তাদের নিকটেই রয়েছে।" (৫০ঃ১৮)

কোন কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি আমাদেরকে বলেই ফেললেন, 'অবশ্যই স্মরণ রাখবেন, সর্বত্র গুপ্তচররা ছড়িয়ে রয়েছে, আপনারা যেখানেই অবস্থান করবেন, কিছু চোখ আপনাদেরকে দেখার জন্য এবং কিছু কান আপনাদের কথা শুনার জন্য সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকবে। কোন হোটেল, কোন মোটরগাড়ী, কোন বিনোদন কেন্দ্র কিংবা পার্ক এ থেকে ব্যতিক্রম নয়। ট্যাক্সী ড্রাইভার, খাদিম ভৃত্য কারো থেকেই আপনারা এ ব্যাপারে নিরাপদ নন।

দুই ঃ অবাধ বেপর্দেগী (অশালীনতা), নারী পুরুষের ব্যাপক আকারের ও বিস্ময়কর ধরনের মেলামেশা, রাস্তা ঘাটে ঝুলানো বিশ্রী ছবি এবং কামোদ্দীপক নোটিশ বোর্ড সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছিলো, হিপ্পী যুবক যুবতী দলে দলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো এবং আমাদের বুঝতে বাকি ছিল না যে, যে সমস্ত উৎকৃষ্ট আচরণ ও সর্বজন–পরিচিত বৈশিষ্ট্যের কারণে সিরিয়ার নামডাক ছিল

সে সিরিয়া অবাধ্যতা, পথভ্রষ্টতা এবং চারিত্রিক অধঃপতনের ক্ষেত্রে আজ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। পথ ভ্রষ্টতা ও চারিত্রিক অধঃপতনের সূচনা হয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অবিশ্বাস, ব্যর্থতা ও পরাজয় থেকে। যাদের অন্তর ক্ষত-বিক্ষত এবং যারা হীনমন্যতায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছে তারা পথ ভ্রষ্টতা ও চরিত্রহীনতার মধ্যেই এক ধরনের অতি সাময়িক সান্ত্বনা খুঁজে বেড়ায়। আর সেই সাথে রাষ্ট্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতি বুদ্ধিমান (?) নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করে রাখে যে, মানুষ তখন নিজের হিসাব-নিকাশ কিংবা চিন্তা-ভাবনা করার অবসর মোটেই পায় না। ফলে সমগ্রজাতি আত্মবিস্মৃত ও মাতালে পরিণত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে এই পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল। মিসরে ৫ই জুনের ঘটনার পর এই পরিস্থিতিই দেখা দিয়েছে।

উল্লেখিত দু'টি পরিবর্তন চরিত্র ও মন-মানসিকতার সাথে সম্পর্কিত। সেখানে তৃতীয় যে আর একটি পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করেছি তা হলো, সেখানকার অর্থনৈতিক বিপর্যয়। আমদানীর উৎসসমূহ প্রায় বন্ধ। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সিরিয়া আজ সেই প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত, যার কারণে অতীতে সে ছিল অন্যান্য দেশের ঈর্ষার বস্তু। আমি প্রথমে মনে করেছিলাম যেহেতু সিরিয়া-লেবানন সীমান্ত বন্ধ, তাই এটা একটা সাময়িক ব্যাপার। কিন্তু পরে জানতে পারলাম, আমার ধারণা ঠিক নয়। কেননা জনসাধারণ দেশের এই অবস্থা নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত, তারা এটাকে একটা বিরাট বিপর্যয় বলে ধরে নিয়েছে এবং অতীত দিনের স্বাচ্ছন্দ্য ও আয়েশ-আরামের সেই দিনগুলোর কথা স্মরণ করে মনে মনে বিলাপ করছে যখন তাদের দৈনন্দিন জীবনে সব ধরনের শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা ছিল। তাদের অবস্থা যেন ছিল কুরআনে বর্ণিত নিম্নলিখিত অবস্থার মত।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ ٠

অর্থঃ "আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেথায় আসত সবদিক থেকে তার প্রচুর জীবনোপকরণ।" (১৬ঃ ১১২)

অতীতে ও বর্তমানে এ ধরনের পার্থক্য আমি সর্বত্রই দেখেছি। এটা আমার কাছে একটা গতানুগতিক অনুভূতিতে পরিণত হয়েছে বলা চলে।

অতএব এ বিষয়টিকে আমি খুব একটা গুরুত্ব দিইনি। ভেবেছি, এটা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, জাতীয় জীবনে এ ধরনের উত্থান-পতন ঘটেই থাকে। যদি দেশ সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হয়, এর সীমান্ত সংরক্ষিত হয়, শত্রু এর দিকে চোখ তুলে তাকাবার বা হাত বাড়াবার সাহস না পায়, যদি এর প্রতি ইঞ্চি জমি এর অধিবাসীদের দখলে থাকে তাহলে তো দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। প্রায়ই বিভিন্ন দেশ এবং বিভিন্ন জাতিকে এ ধরনের জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। তখন জনসাধারণকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত হিসাব করে চলতে হয়, কষ্টের জীবন যাপন করতে হয়। তখন মানুষ শুধু প্রাণ রক্ষার জন্য খাবার খায়, শুধু দেহ ঢাকার জন্য কাপড় পরে এবং আয়েশ-আরামের সামগ্রী (LUXURY) থেকে বঞ্চিত থাকে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কোন কোন জাতি বছরের পর বছর এই অবস্থায় কাটিয়েছে কিন্তু জ্ঞাত কারণই এজন্য কোন মনোবেদনা বা ক্লান্তি প্রকাশ করেনি। শেষ পর্যন্ত বিপদের ঘনঘটা বিলীন হয়েছে, লাঞ্ছনা-গঞ্জনার পরিসমাপ্তি ঘটেছে, সুখ- স্বাচ্ছন্দ্যের দিন পুনরায় ফিরে এসেছে। আরব এবং মুসলিম জাতি-গোষ্ঠীকে তো সর্বাধিক উৎকৃষ্ট পন্থায় ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে হবে এবং তা এজন্য যে, তাদের ধর্মও এই শিক্ষাই প্রদান করে, তাদের সামনে তাদের রাসূল ও তার সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এর প্রকৃষ্ট নমুনা রয়েছে এবং তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে এজন্য সওয়াবের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু আমার উপরোক্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ইমারত ভূতলে লুটে পড়ল যখন আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো জূলান (গোলান)-এর সেই উচ্চভূমির দিকে, যা ইসরাঈলের মুঠোয় রয়েছে এবং যার কারণে সিরিয়া এবং খোদ দামেশ্‌ক এক সার্বক্ষণিক বিপদের মুখোমুখি হয়ে আছে। এটি এমন একটি পরিস্থিতি যার সাথে দেশের ভবিষ্যৎ সরাসরি সম্পৃক্ত। যতক্ষণ পর্যন্ত সিরিয়ার অস্তিত্ব ইসরাঈলের কৃপার উপরই নির্ভর করবে। আমরা জানতে পেরেছি, কোনরূপ যুদ্ধ বা সংঘর্ষ ছাড়াই ইসরাঈল গোলান দখল করে নিয়েছে। সিরিয়ার অধিবাসী এবং সেখানকার সশস্ত্র বাহিনীর জন্য এটি ছিল একটি অকল্পনীয় ব্যাপার, যা বলতে গেলে, নাটকীয়ভাবেই ঘটে গেল।

সাক্ষাৎকার

'শারে মাতার-এ অবস্থিত শায়খ আহ্‌মদ কুফতারু-এর সুন্দর ও বিস্তৃত ফার্মে আমাদের একটি আকর্ষণীয় বৈঠক হয়। তাসাউফ ও আত্মিক পবিত্রতার প্রয়োজনীয়তা, ধর্মীয় প্রশিক্ষণ এবং বর্তমান যুগে দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতি এবং সেগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়নের ব্যাপারে শায়খকে খুবই আশান্বিত দেখা যাচ্ছিলো। তাঁর ধারণা, যদি আন্তরিকতা সম্পন্ন বিজ্ঞ মুবাল্লিগ বাহিনী গড়ে তোলা যায় এবং তারা যদি আল্লাহ্‌র পথে সেভাবে নিজেদেরকে উৎসর্গ করে যেভাবে ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুবাল্লিগগণ করেছিলেন তাহলে আমাদের যুব সমাজ ও শিক্ষিত শ্রেণী ধর্মের দিকে অবশ্যই ঝুঁকে পড়বে। তিনি অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে তার দাওয়াতী ও তাবলীগী অভিজ্ঞতার উল্লেখ করেন এবং সেখানকার দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবৃন্দ এবং যুবকরা যে মনোযোগ সহকারে তার কথা শুনেছে, দীর্ঘ সময় ধরে সে বর্ণনাই দেন।

ভোরবেলাও শায়খের আমন্ত্রণে আমরা তাঁর ফার্মে যাই। সেখানে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত বৈঠক চলে। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আমরা রোববার দিন আওকাফ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জনাব আবদুস সাত্তার আস-সাইয়িদের সাথে সাক্ষাত করবো এবং তিনিই আমাদের সফরের কর্মসূচী প্রণয়ন করবেন। এরপর আমরা কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিক স্থান দেখতে যাই। কিছু কিছু মুসলিম মহল্লায়ও প্রবেশ করি। আমরা যে দিন হোটেলে পৌঁছি সেদিন সন্ধ্যায় সিরিয়ার মহামান্য এবং ধর্মীয় নেতা ও মুরুব্বী শায়খ হাসান হাবান্নাকাহ্ আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তার বাসভবনে যাওয়ার আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন। আমরা ধন্যবাদের সাথে তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম। সেই প্রেক্ষিতে আমরা তার বাসভবনে গিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজ সম্পন্ন করি। তখন তার গোষ্ঠীর কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এবং শহরের উলামারা যাদের সাথে তাঁর শিষ্যসুলভ ও আনুগত্য সম্পর্ক ছিল-উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকটি ছিল হৃদ্যতাপূর্ণ। আলোচনার বিষয় ছিল 'ইসলামী শরীআত ও ইসলামী সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের স্থান এবং সেই স্বাভাবিক দুর্বলতা ও সৌন্দর্যাবলী যা শুধুমাত্র মহিলাদেরই বৈশিষ্ট্য।'

দামেশকস্থ সাউদী দূতাবাস সিদ্ধান্ত নেয় যে, প্রতিনিধিদলের সম্মানে দূতাবাসে একটি অভ্যর্থনা সভার আয়োজন করা হবে যাতে মন্ত্রীবর্গ,

রাষ্ট্রদূতবৃন্দ, উলামা ও নেতৃস্থানীয় নাগরিকদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। আমরা স্থির করলাম, সোমবার দিন সকালে হলব যাবো এবং পথিমধ্যে হিম্‌স এবং হিমাতেও কিছুক্ষণ অবস্থান করবো। এরপর বুধবার পুনরায় দামেশ্‌ক ফিরে আসবো। তখন দামেশ্‌কে আমাদের অবস্থানকাল হবে দু'দিন। এই সময়ে বিভিন্ন বৈঠক ও অনুষ্ঠানাদিতেও যোগদান করা যাবে। সাক্ষাৎকারেরও কর্মসূচী থাকেব, যা মুফতী সাহেব এবং ওযীরে আওকাফ নির্ধারণ করবেন। তারপর আল্লাহ্‌ চাহে তো আম্মানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবো।

আমরা আসরের পর সাইয়িদ মাক্কী আল-কাতানীর সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে দামেশকের বিখ্যাত গ্রীষ্মাবাস 'যাবদানীতে যাই।[৮] শায়খ দীর্ঘদিন থেকে নির্জনবাসে আছেন। বর্তমানে শয্যাশায়ী অবস্থায়ই আছেন। চলাফেরা করতে পারেন না। দু'বছর যাবত রাবিতার বৈঠকাদিতেও যোগদান করতে পারছেন না। বেশ কিছুক্ষণ অত্যন্ত শান্ত ও হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে আমরা তার সাথে কথাবার্তা বলি। সেই প্রাচীনকাল থেকেই তার বংশ ধর্মীয় খিদমত ও শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুনামের অধিকারী। দ্বীন ও ইলমের ক্ষেত্রে এবং উলামা সংগঠনের একজন সংগঠক হিসাবে শায়খ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খিদমত আনজাম দিয়েছেন।

যে স্বপ্ন সত্যে পরিণত হলো

রাত ১১টায় আমরা হোটেলে ফিরে আসি। আমার কিছু সংখ্যক ছাত্র যারা নদওয়াতুল উলামায় শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তাদেরকে সময় দিয়ে রেখেছিলাম। লেবাননের কিছু বক্তৃতা যা এখনো লিপিবদ্ধ করা হয় নি তা বন্ধুদের সাহায্যে লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা ছিল, কয়েকজন বন্ধু সহযোগে পুরাতন বন্ধুবান্ধব এবং দামেশকের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবৃন্দের সাথে, যাদের সংগে ইতিপূর্বেকার সিরিয়া সফরকালীন সময়ে হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল এবং যুগের আবর্তনে তাতে কোন শৈথিল্য দেখা দেয় নি-সাক্ষাৎ করারও কর্মসূচী ছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন আল্লামাতুশ শাম শায়খ মুহাম্মদ বাহ্‌জাতুল বায়তার, সিরিয়ার প্রাক্তন মুফতী ডঃ আবুল ইয়াসির বিন আবিদীন,[৯] আল জামিয়াতুল গাররা[১০] এর সদর বা সভাপতি শায়খ আহমদ আদ্‌দাকর এবং শায়খ যয়নুল আবিদীন[১১]। এদের মধ্যে কেউ অসুস্থ, আবার কেউ বয়সের ভারে কাতর।

মাজ্‌মাউল লুগাতিল্ আরাবিয়ায়ও যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। আমি ১৯৫৬ সাল থেকে এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সদস্য। এভাবে সাহাবা, আয়িম্মা এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর সমাধিসমূহ যিয়ারত করারও ইচ্ছা ছিল।

আমি বিছানায় সটান শুয়ে পড়ি। সবাই ছিল ক্লান্ত শ্রান্ত। পরিস্থিতি ছিল স্বাভাবিক। কোথাও কোন অস্বস্তিকর ব্যাপার ঘটছে তেমন কিছু বুঝা যাচ্ছিলো না। আমি গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলাম এমন সময় হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো এবং আমার ভাতিজা মওলভী মুহাম্মদ রাবীকে হোটেলের একজন কর্মচারীর সাথে টেলিফোনে আলাপ করতে শুনা গেল–

ঃ তিনি নীচে আছেন, না উপরে পৌঁছে গেছেন?

ঃ তিনি উপরে পৌঁছে গেছেন। হোটেল কর্মচারীর জবাব।

তারপর দরজায় করাঘাতের আওয়াজ শুনা গেল। আমি দরজা খুলে দিলাম এবং তিনজন লোক, যারা সাধারণ নাগরিকের পোশাক পরিহিত ছিল কক্ষে ঢুকে পড়লো এবং আমাকে বললো, জিনিষপত্র বাঁধাই-ছাদাই করুন এবং উঠে পড়ুন।

ঃ কোথায় ? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ঃ জানি না। –তারা উত্তর দিল।

এরপর ওরা উস্তাদ আহমদ মুহাম্মদ জামাল এবং উস্তাদ আব্দুল্লাহ্ বাহবরীর নিকট গেল। তারা আমাদেরকে পরস্পরের সাথে মিলিত হতে বাধা প্রদান করলো। বুঝতে বাকি রইলো না যে, আমাদেরকে নিশ্চয়ই কোন নতুন পরিস্থিতির মুকবিলা করতে হবে। উস্তাদ আহমদ মুহম্মদ জামাল সাউদী রাষ্ট্রদূতের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করলেন যাতে উপস্থিত পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা যায়, কিন্তু তাকে সে অনুমতি দেওয়া হলো না। উস্তাদ তখন এই বর্বরোচিত ও কর্কশ আচরণের প্রতিবাদ করেন এবং বলেন, আমরা কোন ভেড়া বকরী নই যে, আমাদেরকে জোর করে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আমরা তো শুধু কারণ জানতে চাচ্ছি। কিন্তু তাতে কোন কাজ হলো না।

তারপর আমরা এক মোটরগাড়ীতে আরোহণ করলাম যা হোটেলের সামনেই খাড়া ছিল। আমাদের সাথে ঐ লোকগুলোও গাড়ীতে আরোহণ করলো। রাস্তায় বুঝতে পারলাম, আমরা লেবানন সীমান্তের দিকে যাচ্ছি।

এ সব ঘটনা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ঘটে গেল। আমরা একটি লেবাননী মোটর গাড়ীতে স্থানান্তরিত হলাম। মনে হচ্ছিলো, ঐ গাড়ীটি যেন এ উদ্দেশ্যে পূর্ব থেকেই তৈরী অবস্থায় রাখা হয়েছিল। যা হোক আমরা বৈরুতের দিকে রওয়ানা হলাম এবং প্রত্যুষেই সেখানে পৌছে গেলাম। বৈরুতের পরিচিত বন্ধুরা, যারা মাত্র দু'দিন পূর্বে আমাদেরকে বিদায় জানিয়েছিলেন, পুনরায় আমাদেরকে সেখানে দেখতে পেয়ে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। অনুরূপভাবে গভীর রাতে দামেশ্‌ক শহর ছেড়ে আসার কারণে আমাদের সেখানকার বন্ধুরাও যারপরনেই বিচলিত ও বিস্মিত হন। কিন্তু তারাও এর কোন কারণ জানতে পারেন নি।

এটা ছিল এমন একটা নাটক, যার মূল দৃশ্যটি ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। আমাদের জন্য তো এটা এমন একটা স্বপ্ন ছিল যার সূচনা মধুময়, কিন্তু সমাপ্তি ক্লান্তিকর। আমরা কল্পনা ও বিশ্বাসের মধ্যবর্তী অবস্থায় ছিলাম। বুঝে উঠতে পারছিলাম না, এসব কিছু স্বপ্নে ঘটছে, না জাগ্রত অবস্থায়–এতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ইশারা ও ইচ্ছা কাজ করছে, না তাদের অগোচরেই এসব ঘটে যাচ্ছে।

কুরআন মজীদে হযরত মূসা (আ.)–এর কাহিনীতে বলা হয়েছে–

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا

অর্থ ঃ ''সে (মূসা) নগরীতে প্রবেশ করল যখন এর অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক।" –(২৮ ঃ ১৫)

আমাদের অবস্থা হলো এর ঠিক বিপরীত। আমরা শহর থেকে তখনই বেরিয়ে পড়লাম যখন এর অধিবাসীরা গভীর নিদ্রায় এমনি বিভোর ছিল যে, আমাদের কোন খবরই তারা জানতে পারল না।

এভাবে আমাদের দামেশ্‌ক সফর সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল এবং আমাদের অনেক ইচ্ছা ও আশাই অপূর্ণই থেকে গেল।

বৈরুত সংবাদপত্র 'আল হায়াত–এ আমাদের এই ঘটনার খবর ৮ রজব, ১৩৯৩ হিঃ, মুতাবিক ৬ আগস্ট, ১৯৭৩ ইং সোমবার প্রকাশিত হয়

এবং তখনি বৈরুতস্থ বন্ধুরা আমাদের সম্পর্কে জানতে পারেন। ঐ দিন বি. বি. সি. লন্ডন এবং ইসরাঈল রেডিও এই সংবাদ প্রকাশ করে। বৈরুত এবং অন্যান্য আরব দেশসমূহের সংবাদপত্রে এই ঘটনার সমালোচনা এবং এর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। বৈরুতের বন্ধুবান্ধব আমাদের সাথে দেখা করতে ছুটে আসেন। তারা আমাদের কাছে বিস্তারিত ঘটনা জানার জন্য প্রশ্ন করছিলেন এবং সাথে সাথে বিস্মিত হচ্ছিলেন।

টীকা ঃ

১. ঐ সফরের বিস্তারিত বিবরণের জন্য এই লেখকের 'মুযাক্কারাতু সা-ইহীন ফিশ্শারকিল গারবী' পৃষ্ঠা ৩০৭-১৮ দ্রষ্টব্য।

২. এ ধরনের বিনোদন সফরকে ইংরেজীতে 'পিকনিক বলা হয়। হিজাযে এ ধরনের সফরকে 'কীলা' সিরিয়ায় ' সায়বান এবং ভারতের কোন কোন অঞ্চলে 'গোট বলা হয়।

৩. আত্তারীকু ইলা মক্কা ঃ পৃষ্ঠা ১৬৭ ঃ মূল গ্রন্থ ROAD TO MECCA.

৪. সরিয়ার বর্তমান ক্ষমতাসীন পার্টি।

৫. এটা হচ্ছে দামেশ্কের সর্ববৃহৎ হোটেল যেখানে রাষ্ট্রীয় অতিথি এবং অন্যান্য দেশের সম্মানিত ব্যক্তিরা অবস্থান করেন।

৬. শায়খ মুহীউদ্দীন দামেশ্কের একটি মহল্লার নাম, যা শায়খে আকবর শায়খ মুহীউদ্দীন ইবনে আরবী-এর দিকে সম্পর্কিত। শায়খ সাহেব এই মহল্লায়ই সমাধিস্থ আছেন।

৭. শায়খ হাসান হাবান্নাকাহ্ বর্তমানে সিরিয়ার সবচাইতে শ্রদ্ধেয় ও জনপ্রিয় আলিম। আপন আদর্শবাদিতা, সরকারের প্রতি নিস্পৃহতা এবং পবিত্র জীবন যাপনের প্রতি একাগ্রতার কারণে সাধারণ অসাধারণ নির্বিশেষে সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে। দামেশ্কের বিখ্যাত মহল্লা মীদানে তিনি বসবাস করেন। এই মহল্লাটি সর্বদা উলামাদের কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। দামেশ্কে এর স্থান সেরূপ, যেরূপ লক্ষ্মৌতে ফিরিঙ্গি মহলের। তিনি স্বাধীনভাবে একটি মাদ্রাসা পরিচালনা করতেন, যা সিরীয় সরকার সম্প্রতি জাতীয়করণ করে ফেলেছে। এখন তিনি পঠন-পাঠন ও ওয়ায নসীহত নিয়েই ব্যস্ত থাকেন।

৮. সাইয়িদ মাক্কী কাতানী সিরিয়ার বিখ্যাত আলিম, শায়খে তারীকত এবং রাবেতাতুল উলামা অর্থাৎ সিরিয়ার জামইয়াতুল্ উলামায়ের সভাপতি এবং মক্কাস্থ রাবিতায়ে আলমে ইসলামীর বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। তিনি 'মাগারিবে আক্সা-এর বিখ্যাত হাসানী সাদাত বংশের সন্তান। এই বংশটি 'কাতানী নামে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশসমূহে বিশেষভাবে পরিচিত। এই বংশে অনেক বড় বড় মুহাদ্দিস ও সূফীর জন্ম হয়েছে। সাইয়িদ মাক্কী কাতানীর পিতা

সাইয়িদ জাফর কাতানী একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও শায়খে তারীকত ছিলেন। তিনি পশ্চিম থেকে দামেশ্‌কে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। ১৯৭৩ সনের ডিসেম্বরে সাইয়িদ মাক্কী কাতানী ইন্তিকাল করেছেন।

৯. এই ব্যক্তি হচ্ছেন 'রাদ্দুল মুহতার (যাকে সাধারণভাবে শামী বলা হয়) –এর গ্রন্থকার আল্লামা ইবনে আবিদীনের প্রোপ্রোপৌত্র। তিনি মেডিসিনের ডাক্তার ছিলেন। তবে আপন দ্বীনী জ্ঞান, বংশগত ঝোঁক ও ব্যক্তিগত অধ্যয়নের কারণে বেশ কয়েক বছর সিরিয়া জামহুরিয়ার মুফতী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ধর্মীয় মহলে তাকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখা হয়।

১০. ইনি সিরিয়ার বিখ্যাত শায়খে তারীকত, উস্তাদ ও মুরব্বী শায়খ আলী আদ্‌ দাকর এর সন্তান, যিনি সিরিয়ার অনেকগুলো দ্বীনী মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা এবং এক বিরাট সংখ্যক উলামার উস্তাদ ও মুরব্বী ছিলেন।

১১. ইনি হচ্ছেন শায়খ মুহাম্মদ আল খিযর তিউনিসী–এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা যিনি মিসরের জ্ঞান ও ধর্মজগতের একজন বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং আল–আযহারের শায়খ ছিলেন। ইনি হচ্ছেন একজন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ বুযুর্গ ও দক্ষ আলিম।

হারূন-অর রশীদের

রাজধানী বাগদাদ

৫

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে বাগদাদের স্থান

ইসলামের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিরাট সম্পর্ক বাগদাদের সাথে রয়েছে তা অন্য কোন ইসলামী শহর বা রাজধানীর সাথে নেই। বাগদাদকে উপলক্ষ করে যত ঘটনা ঘটেছে বা যত প্রবাদবাক্য গড়ে উঠেছে সেরূপ অন্য কোন শহরের ক্ষেত্রে হয়নি। বাগদাদ ইসলামী যুগে একেবারেই ঝল্‌মলিয়ে উঠে এবং পুরো পাঁচটি শতাব্দীই আব্বাসী রাষ্ট্রের রাজধানী থাকে। প্রাচীন বাগদাদ বিশ্বের সিংহ ভাগ শাসন করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় প্রত্যেকটি বিষয়ের ইমাম (অগ্রনায়ক) সৃষ্টি করেছে। বিশ্বের প্রতিটি প্রান্ত থেকে পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই শহরের দিকে ছুটে এসেছেন এবং এখানেই বসতি স্থাপন করেছেন। এ কারণেই অতীতে যেরূপ বিরাট সংখ্যক পণ্ডিত ও জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ এখানে হয়েছিল সেরূপ অন্য কোন ইসলামী শহরে হয়নি।

আমাদের ছোটবেলায় মক্কা-মদীনার পর বহির্বিশ্বের যে শহরটির নাম সর্বপ্রথম কানে এসেছিল তা ছিল এই বাগদাদ। প্রথম পুস্তক যার মাধ্যমে আমরা আরবী বর্ণমালা শিখেছিলাম তা ছিল কায়িদা-ই বাগদাদী। প্রকৃতপক্ষে এই কায়িদা-ই-বাগদাদীই হচ্ছে ইসলামী জ্ঞানের দরজা তথা কুরআন, হাদীস, ইসলামী জ্ঞান এবং উর্দূ-ফারসী ভাষা শেখার মাধ্যম।

ইসলামী ইতিহাস, সরফ্, নাহ্‌ভূ (আরবী ব্যাকরণ ও রচনা) এবং তিনটি ফিক্হী চিন্তাধারা (হানাফী, শ্যাফিঈ ও হাম্বলী) অধ্যয়ন করার জন্য যে পথ অবলম্বন করা হত তা বাগদাদের পাশ দিয়েই অতিক্রান্ত হত কিংবা বাগদাদ থেকেই বহির্গত হত অথবা বাগদাদের দিকেই যেত। এভাবে বিভিন্ন চিন্তাধারা ও মতাদর্শের ক্রমোন্নতি তথা মুতাযিলা, আশাইরা, মুতাকাল্লিমীন ও মুহাদ্দিসীনের মধ্যকার ইখতিলাফ তথা মত পার্থক্যের কোন প্রামাণিক ইতিহাস লিখতে গেলে তাতে বাগদাদের হাওয়ালা (বরাত) অবশ্যই থাকতে হবে।

বাগদাদই হচ্ছে সেই স্থান যেখানে আহলে সুন্নাতের ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-কে অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং তিনি সে পরীক্ষায় অপরিসীম ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। এখানেই ইমাম গাযালীর সেই জ্ঞান বিতরণী মজলিস বসত, যে মজলিসের প্রতি সমসাময়িক খলীফাদের মজলিসও ঈর্ষা পোষণ করত। এখানেই আল্লামা ইবনে জূযীর

ওয়ায-নসীহতের সেই মজলিসসমূহ যথারীতি বসত যাতে আল্লাহ্‌র পুণ্যবান বান্দাহ্‌রা বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণ করতেন। এখানেই ছিল শায়খ আবদুল কাদির জিলানীর সেই মাদরাসা যাতে একাধারে জ্ঞান বিতরণ ও অন্তর পবিত্রকরণের কাজ চলত। এখানেই যুহ্‌দ, তাকওয়া, ইফ্‌ফাত ও পবিত্রতার সেই জীবন অতিবাহিত হয়েছে যার ছবি আমরা আবূ নায়ীম ইস্‌পাহানীর 'হ্‌লইয়াতুল আউলিয়া' এবং ইবনে জূযীর 'সিফাতুস্‌ সাফ্‌ওয়া' গ্রন্থে দেখতে পাই। আবার এখানেই অতিবাহিত হয়েছে খেলাধূলা, ক্রীড়া-কৌতুক ও নৃত্য-গীতির সেই অবাধ রংগীন জীবন যার বর্ণনা মিলে আবুল ফরজ ইসপাহানীর 'কিতাবুল আগানী' এবং অজ্ঞাত গ্রন্থকারদের 'আলফে লায়লাহ্‌ ওয়া লায়লাহ্‌' গ্রন্থে। বাগদাদ ছিল এ উভয় ধারার জীবন প্রবাহের সংগমস্থল ও প্রধান কেন্দ্র। উল্লেখিত গ্রন্থাদির প্রত্যেকটিতেই বাগদাদের এই বৈপরিত্যমূলক জীবনের ছবি অংকিত হয়েছে। বাগদাদ এমন একটি স্থান, যেখানে ধন-দৌলত দজলা ও ফুরাত নদীর মত প্রবাহিত হত, যেখানে মঙ্গল-অমঙ্গল উভয়েরই অস্তিত্ব ছিল, যেখানে পথ দেখানো, পথ ভ্রষ্টকরণ উভয় প্রবণতা বিদ্যমান ছিল। মোটকথা জীবনের উপরোক্ত দু'টি ধারা, যা প্রত্যেকটি শহর ও রাজধানীতেই থাকে তা বাগদাদেরও ছিল, তবে ছিল কিছুটা বেশী পরিমাণে।

যাহোক বাগদাদ সফরে আমাদের যেতে হবে-চাই তা যত দীর্ঘ হোক। কিন্তু আমরা আশংকা করছিলাম, না জানি সেখানেও আবার আমাদেরকে সেই ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় কিনা, যার সম্মুখীন আমরা ইতিমধ্যে দামেশ্‌কে হয়েছি।

বৈরুত থেকে বাগদাদ

বাগদাদগামী বিমানের অপেক্ষায় আমরা বৈরুতে তিন দিন অতিবাহিত করি। লেবাননী বিমানের সময় ছিল ৭ই আগস্ট, ১৯৭৩ ইং সোমবার। বৈরুতের সাউদী দূতাবাস বাগদাদের সাউদী দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করলো। সেই প্রেক্ষিতে বাগদাদস্থ সাউদী রাষ্ট্রদূত সেখানকার সরকারী মহলের সাথে যোগাযোগ করে আমাদের জানালেন যে, ইরাক সরকার প্রতিনিধিদলকে খোশ আমদেদ জানাচ্ছেন এবং তারা ৫ দিন পর্যন্ত প্রতিনিধিদলের আতিথ্যের জন্য তৈরী হয়ে আছেন।

সোমবার দিন ঈশার সময় আমরা আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে রওয়ানা হলাম এবং আনুমানিক মধ্যরাতে বাগদাদে গিয়ে পৌছলাম। মহামান্য সাউদী রাষ্ট্রদূত আলী সাকার, ইরাকী মজলিসে আওকাফের নায়েবে সদর আবদুর রাজ্জাক ফাইয়ায, বাগদাদের উলামার একটি দল এবং সাউদী দূতাবাসের কর্মচারীরা আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন। আমরা এক ঘন্টা পর্যন্ত বিমান বন্দরের লাউঞ্জে ছিলাম। সেখানে উলামা হযরাতের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন আওকাফের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং সেই সাথে মসজিদ-সমূহের ইমাম, খতীব এবং মাদরাসাসমূহের শিক্ষকবৃন্দ। তারপর আমরা 'হোটেলে এম্বেসেডার'-এর দিকে রওয়ানা হলাম। এটা হচ্ছে দজলার তীরবর্তী 'শারে আবূ নাওয়াস (আবু নাওয়াস এভিনিউ)-এর উপর একটি বিরাট হোটেল। বাগদাদে তখন খুব গরম পড়েছে এবং প্রবল লূ হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু যেহেতু হোটেল শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত, তাই আমরা অত্যন্ত আরাম ও শান্তিতে রাত কাটালাম।

সাক্ষাৎকার

পরদিন ৮ই আগস্ট, ১৯৭৩ ইং বুধবার প্রতিনিধিদলের কর্মচাঞ্চল্য শুরু হয়। প্রথমে আমরা দিওয়ানূল আওকাফে যাই। সেখানে গিয়ে জানতে পারি যে, আমাদের কর্মসূচী, যার আলোকে আমরা ঘোরাফেরা করবো, তা ইরাকের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রণয়ন করবে। আমাদের সাক্ষাৎকার এবং চলাফেরাও তাদের দ্বারাই নির্ধারিত হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আমাদের জন্য একজন রফীক (Guide) নিয়োগ করল, যে ছিল সে মন্ত্রণালয়েরই একজন কর্মচারী। তার সাহচর্যে ও তত্ত্বাবধানে আমাদের চলতে হবে। পরে বুঝা গেল, সরকারের পক্ষ থেকে আরো দুই ব্যক্তিকেও আমাদের জন্য মোতায়েন করা হয়েছে। যারা আমাদের সাথে সাথে থাকবে এবং সর্বক্ষণই আমাদের প্রতি নজর রাখবে। ঃ

আমরা দিওয়ানুল আওকাফ থেকে কাস্‌রে জাম্‌হুরীতে যাই। সেখানে 'সাজলুত্‌ তাশরীফাত'-এ আমাদের নাম লিপিবদ্ধ করি।[১] সরকারী রফিক আমাদের বলে যে, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, সদরে জামহুরিয়াহ্‌ (রাষ্ট্রপতি) আহমদ হাসান বক্‌র সাক্ষাতের জন্য আমাদের ডাকবেন। অতএব এটা বাঞ্ছনীয় যে, আমরা যেন বাগদাদের বাইরে কোথাও না যাই।

সর্ব প্রথমে আমরা ইমাম আজম (আবূ হানীফা (র.)) -এর মসজিদ দেখতে যাই এবং সেখানেই জুহরের নামায আদায় করি। এরপর ইমাম সাহেবের বিশ্বস্ত ও সুযোগ্য শিষ্য এবং হানাফী মাযহাবের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ ইমাম আবূ ইউসূফের মসজিদ দেখি। আসরের সময় সাইয়্যিদিনা আবদুল কাদির জিলানীর মাযার যিয়ারতের জন্য 'আল-হাযারাতুল কাদীরীয়ায় যাই।[২] সেখানেই আমরা আসরের নামায আদায় করি। সাইয়্যিদিনা জিলানীর খানকার সাথে একটি পাঠাগারও রয়েছে। আমরা তা দেখি এবং কিছু সময়ের জন্য কাযিমিয়ায়ও যাই।[৩]

বৃহস্পতিবার সকালে আমরা কয়েকজন মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করতে বের হই, যাদের নাম সরকারী কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন প্রাথমিক ও কারিগরি শিক্ষাবিষয়ক মন্ত্রী উস্তাদ আহমদ আল-জাভীরী এবং উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ হুসায়ন আশ্শাভী। শেষোক্ত মন্ত্রী অতি সম্প্রতি ভারত সফর করে এসেছেন। আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল, 'একটি আরব-ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য সঠিক শিক্ষানীতি কি হওয়া উচিত- যেমন ইরাকের জন্য যা একদা ইসলামী দাওয়াত ও ইশাআতের (প্রচারের) কেন্দ্র ছিল এবং সমগ্র ইসলামী বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তা-ধারণার নেতৃত্ব দিত ? উভয় মন্ত্রীরই কথাবার্তা ছিল ভদ্রোচিত ও সতর্কতামূলক। আলাপ-আলোচনাকালে অজ্ঞাতে হলেও এমন কিছু শব্দ বেরিয়ে পড়ে, যা পরোক্ষ হলেও এই জাতির আত্মমর্যাদা এবং এই মহান ইলমী ও মাযহাবী দেশের উজ্জ্বল ঐতিহ্যের নিন্দাই করছিল।

একথা কে না জানে যে, জনসাধারণের অনুভূতি-অনুপ্রেরণাকে দাবিয়ে রাখা, অতীত প্রভাবকে নষ্ট করা এবং জীবনের নিখাদ সত্যকে উপেক্ষা করার কোন চেষ্টা আজ পর্যন্ত কোথাও পুরোপুরি সফল হয় নি। এমন কি, রাশিয়ায়ও এ ধরনের চেষ্টা কার্যকর হয়নি। কেননা এটা প্রকৃতিকে পাশ কাটানো এবং সত্যকে গোপন করার অপচেষ্টা ছাড়া কিছু নয়।

দিওয়ানুল আওকাফের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান

'দিওয়ানুল আওকাফ' -এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি (সভাপতি তখন মস্কো সফরে ছিলেন) শায়খ আবদুর রায্যাক ফাইয়ায প্রতিনিধিদলের সম্মানে

জমিউশ্ শুহাদায় একটি নৈশভোজের আয়োজন করেন। এতে বাগদাদের উলামা, মসজিদসমূহের ইমামবৃন্দ এবং মাশায়েখের একটি বিরাট দল অংশ গ্রহণ করেন। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন ইরাকের সাবেক মুফতী শায়খ নাজমুদ্দীন ওয়ায়েয এবং মাদরাসা–ই–আবদুল কাদির জিলানীর উস্তাদ শায়খ আবদুল করীম। অনুষ্ঠানে বেশীর ভাগ সময়ই নীরবতা বিরাজ করছিলো। কেউ কিছু বললে তা ছিল শুধু প্রয়োজন মাফিক। কিন্তু এই নীরবতা থেকেই কথা বলার চাইতে অধিক স্পষ্ট এবং অজানাকে জানিয়ে দেওয়ার দক্ষতা ফুটে উঠেছিলো। তাদের উজ্জ্বল চেহারার রেখাগুলো এবং তাদের সপ্রতিভ আঁখিসমূহের ঝলক যেন বলছিলো, যদি এই পাহারাদাররা না থাকত, যারা আমাদের প্রত্যেকটি কথা রেকর্ড করে, এমন কি আমাদের শ্বাস–প্রশ্বাসও গুণে তাহলে আপনাদের সাথে আমাদের আচরণ হত ভিন্নরূপ। যেন তারা নীরব ভাষায় মত্মু নববীর এই কবিতা আবৃত্তি করছিলো–

الحزن يقلق و التجمل يردع
و الدمع بينهما عصى طيع

"উৎকণ্ঠার সীমা নেই, ধৈর্য লাগামযুক্ত এবং অশ্রু এক অদ্ভুত টানাপোড়নে বিপর্যস্ত।"

যে কথাটি বলা যাবে না

'রেমাদী ইরাকের একটি ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র। সেখানকার একটি উলামা প্রতিনিধিদল আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। তারা আমাদেরকে রেমাদী যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান, যাতে করে তারা সেখানে নিজেদের ইসলামী আবেগ অনুপ্রেরণা ও ধর্মীয় অনুভূতি অবাধে আমাদের কাছে ব্যক্ত করতে পারেন এবং যাতে করে আমরা তাদের ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক কর্মতৎপরতা সম্পর্কে অবহিত হতে পারি এবং ঐ শহরটিকে দেখতে পারি, যা অনেক উলামা ও মাশায়েখের কেন্দ্রস্থল হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আমরা ঐ পুণ্য–পবিত্র আগ্রহ ও সদিচ্ছার জন্য তাদের শুকরিয়া আদায় করি এবং বলি, 'আমাদের তো সেখানে যেতে বাধা নেই, তবে তা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষ ; কেননা তারাই আমাদের কর্মসূচী তৈরী করেছেন। অনুভূত হয় যে, তারা তাদের শহরে আমাদের সাথে মিলিত হতে

এবং পরস্পর মত বিনিময় করতে খুবই উৎসাহী। তারা সংগে সংগে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করেন এবং আবেদন করেন, যাতে তাদেরকে তাদের এই ধর্মীয় ভ্রাতৃবৃন্দ তথা রাবিতায়ে আলমে ইসলামীর প্রতিনিধিবৃন্দকে–যারা দীর্ঘদিন পর এই সফরে এসেছেন–আমন্ত্রণ জানানোর সুযোগ দেওয়া হয়। তারা তাদের এই আশা ও ইচ্ছার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে গিয়ে এবং পূর্বসূত্র হিসাবে এই মর্মে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেন যে, সোভিয়েত রাশিয়ার বিখ্যাত আলিম যিয়াউদ্দীন বাবাখানভ যখন ইরাক সফরে এসেছিলেন তখন তারা তাকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং সরকারও তা অনুমোদন করেছিলেন। এভাবে তারা রাবিতার প্রতিনিধিদলকে আমন্ত্রণ জানানোর ব্যাপারে নিজেদের পক্ষে যুক্তি পেশ করছিলেন। অন্যকথায় কোন না কোনভাবে তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অন্তর নরম করতে চাচ্ছিলেন এই বলে যে, তারা (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) ইতিপূর্বেও বহিরাগত আলিমকে আমন্ত্রণ জানানোর অনুমতি দিয়েছিলেন। তাদের এই যুক্তি প্রদর্শন থেকে আমরা অনেক না বলা কথা জেনে নিলাম। দেশ আজ কী বিস্ময়কর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলছে তা আমরা এমন সুন্দরভাবে বুঝে নিলাম যেরূপ বুঝাটা কোন বই–পুস্তক পড়ে বা সুন্দর বাক্য শুনে হয়ত সম্ভব হত না। পরে জানতে পেরেছি, বেচারীর লোক তাদের প্রচেষ্টায় সফলকাম হয় নি অর্থাৎ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের দরখাস্ত অনুমোদন করেনি।

আমরা নাজাফ দর্শনের ইচ্ছা ব্যক্ত করলাম। নাজাফ শুধু ইরাকের নয় বরং সমগ্র শিয়া বিশ্বের এমন একটি শিক্ষাকেন্দ্র যেখানে থাকেন হাজার হাজার শিক্ষার্থী যাদের বেশীর ভাগ ভারতীয়। এভাবে আমরা কারবালা ও কূফা সফরের জন্যও আবেদন জানালাম। কিন্তু উত্তর এলো, 'এতে আশংকা রয়েছে যে, সদ্‌রে জামহুরিয়াহ্ আপনাদেরকে সাক্ষাতের জন্য তলব করবেন এবং তখন আদনাদেরকে শহরে পাওয়া যাবে না।আমরা যখনি বাগদাদের বাইরে কোথাও যাবার জন্য আবেদন করেছি তখনি আমাদেরকে এই একই উত্তর দেওয়া হয়েছে এবং এই একই ওযর পেশ করা হয়েছে। অবশ্য আমরা সালমান পার্ক এবং মাদায়েনের ঐতিহাসিক স্থানগুলো যা বাগদাদ থেকে ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণে, দজলার পূর্ব তীরে অবস্থিত–দেখার সুযোগ পাই যদিও আমাদের সফর ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত।

শিয়া উলামার একটি দল হোটেলে এসে প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাৎ করেন। বেশ কিছুক্ষণ তারা আমাদের সাথে বসেছিলেন, তবে আমাদের ডানে বামে 'কিরামান্ কাতিবীনরা ছিল সদা-সতর্ক। ঐ উলামা নাজাফ ও কারবালা যিয়ারতের জন্য আমাদেরকে উৎসাহিত করেন এবং এই সফরের প্রয়োজনীয়তা এবং এর শিক্ষাগত ও ধর্মীয় গুরুত্বের দিকটিও তুলে ধরেন। তারা আমাদেরকে এও বলেন যে, সেখানকার উলামাবৃন্দ আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য খুবই আগ্রহী। আমরা সেখানে যাওয়ার এবং সেখানকার উলামার সাথে সময় অতিবাহিত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করি, কিন্তু আমরা তাদেরকে এও বলি যে, এই দেশে ঘোরাফেরার ব্যাপারে আমরা মুক্ত স্বাধীন নই এবং আমাদের বাগদাদের বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওজর হলো, 'সম্ভবতঃ মাননীয় সদর অনুগ্রহ পূর্বক তাঁর সাক্ষাৎ দ্বারা কৃতার্থ করার জন্য আমাদেরকে তলব করবেন এবং তখন আমরা বাগদাদের বাইরে থাকায় এই বিরাট সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থেকে যাবো।

বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়, আল্-মাজ্মাউল ইল্মী আল্-ইরাকী ও আল্-মাজ্মাউল্ ইল্মী আল-কুরদী

এই সংক্ষিপ্ত অবস্থানকালে আমরা বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডঃ সাদ আর্‌রাভীর সাথে সাক্ষাৎ করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমরা তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করি। ডঃ সাদ বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা ও বিস্তার এবং এর বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন। সরকার নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী এটা ছিল আমাদের শেষ সাক্ষাতকার।

জ্ঞান ও সংস্কৃতিগত ঝোঁকবশতঃ আমরা আল্-মাজমাউল ইল্মী আল্-ইরাকী (ইরাক একাডেমী) এবং আল্-মাজমাউল ইল্মী আল্-করদী (কুরদী একাডেমী)-তে না গিয়ে পারিনি। এই সব সংস্থার শিক্ষা ও গবেষণাগত উদ্যোগ প্রচেষ্টার আমরা প্রশংসা করি। আল্-মাজমাউল ইল্মী-আল্-ইরাকীতে পৌঁছলে গবেষক আলিম ডঃ নাজী মারূফ যার গবেষণাকর্ম, উচ্চ পর্যায়ের রচনা ও গ্রন্থাদি থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ আমরাও পেয়েছি। মাজমার সদর আবদুর রায্যাক মুহীউদ্দীন, উস্তাদ ইউসূফ ইয্যুদ্দীন, মাজ-মার জেনারেল সেক্রেটারী ফাযিল ত্বাই এবং আমাদের পুরাতন বন্ধু এবং

ইরাকের ইসলামী কবি ওয়ালিদ আল- আজমী আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। মাজমার সদর ডঃ নাজী মারুফ আমাদেরকে আল-মাজমাউল ইলমী আল-কুরদী দেখারও পরামর্শ দেন। উভয় একাডেমীই তাদের কিছু কিছু প্রকাশনা উপহারস্বরূপ আমাদের প্রদান করেন।

নতুন অভিজ্ঞতা

শারে মুতানববীতে অবস্থিত একটি বিরাট পুস্তকালয়ে আমরা যাই এবং সেখানে আমার লিখিত কিছু পুস্তক অনুসন্ধান করি, কিন্তু একটিও পাইনি। এই পুস্তকালয়টি ঐ সমস্ত বই পুস্তক থেকে একেবারে শূন্য যে সমস্ত বই পুস্তক ইসলামের প্রকৃষ্টতার সাক্ষ্য বহন করে। আমরা জানতে পারি যে, বেশীর ভাগ ঐ সমস্ত পুস্তক রাখা এখানে নিষিদ্ধ, যেগুলো এই দেশে ইসলামের পুনরুত্থান এবং পুনরুজ্জীবনের দাওয়াত দেয় এবং যেগুলোতে বর্তমান পরিস্থিতির সমালোচনা রয়েছে। এই শহরে যা পূর্ব আরবের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং যার উপর একটি উন্নয়নকামী পার্টি শাসন চালাচ্ছে এবং যে পার্টি স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশের পক্ষপাতী বলে নিজেকে যাহির করে-অনুরূপ ব্যাপার খুবই বিস্ময়কর।

বাগদাদস্থ সাউদী দূতাবাস প্রতিনিধিদলের সম্মানে একটি নৈশ ভোজের আয়োজন করে। তাতে শুধুমাত্র দূতাবাসের কর্মীবৃন্দ এবং ঐ সমস্ত ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন যাদেরকে আমাদের সঙ্গীরূপে নিয়োগ করা হয়েছিল। ওরাই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ইরাকী সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছিলো। প্রতিনিধিদলের সদস্য ও আপন দ্বীনী ভ্রাতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করার ঐকান্তিক আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও কোন ইরাকী আলিম ঐ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি।

ইরাকী যাদুঘর ঃ এর শিক্ষা ও প্রভাব

১০ই আগস্ট, ১৯৭৩ ইং শুক্রবার আমরা ইরাকী যাদুঘর দেখতে যাই। সেখানে আমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য যাদুঘরের পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বয়ং একজন বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ। খ্রীস্টপূর্ব এক হাজার অব্দ থেকে আজ পর্যন্ত ইরাকী সভ্যতা, ইতিহাস, সমাজ ও রাষ্ট্র যতগুলো স্তর অতিক্রম করেছে, প্রাচীন নিদর্শনাদির মাধ্যমে তিনিই আমাদেরকে সেগুলো

বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দেন। যেমন ব্যাবলনীয় যুগ, কুশী যুগ, সালুকী যুগ, ফরসী যুগ ইত্যাদি। আমাদের দৃষ্টি ছিল ইসলামী যুগ ও প্রাচীন ইসলামী নিদর্শনাদির দিকে যদিও সেখানে এগুলোর পরিমাণ ছিল খুবই কম।

মনে হচ্ছিলো, যেন আমরা এমন একটি ঐতিহাসিক ফিল্ম দেখছি, যাতে এক শাসক আসছে, তো অন্য শাসক চলে যাচ্ছে, এক সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হচ্ছে, তো অন্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটছে, এক শহর গড়ে উঠছে, তো অন্য শহর বিলীন হয়ে যাচ্ছে, সুউচ্চ জাঁকজমকপূর্ণ দালান কোঠা তৈরী হচ্ছে, তো এক পলকের মধ্যে তা আবার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে যাচ্ছিলো যেন ইতিহাস এমন একটি মিলনাত্মক (Comedy) নাটক যার মধ্যে বাস্তবতার নাম গন্ধও নেই-ঠিক যেন শিশুদের নাটক যাতে কেউ রাজার চরিত্রে অভিনয় করছে, কেউ মন্ত্রীর, কেউ সবলের, আবার কেউ দুর্বলের যেমন আলীবাবা কিংবা আলফে লায়লার কাহিনী, যাতে অভিজ্ঞ নাট্যকার যাকে যে চরিত্র অভিনয় করতে দিয়েছেন সে সেই চরিত্রে অভিনয় করছে, কেউ নিজের ইচ্ছায় কোন চরিত্র পরিবর্তন করতে পারছে না। বরং সব অভিনেতার নিয়ন্ত্রণের লাগাম নাট্যকারের হাতে রয়েছে সবাই তারই ইঙ্গিতে নড়াচড়া করছে এবং সবাই বুঝতে পারছে যে, সে তার কাজে মোটেই স্বাধীন নয় বরং অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এরপর সে তার কামনা বাসনার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে কল্পনা সাগরে-মনে করছে, সে সর্বদাই এই চরিত্রে অভিনয় করবে এবং তার ক্ষমতা ও শাসনকাল কখনো ফুরিয়ে যাবে না।

এই ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যাদি এবং বছর ও মাসের আবর্তন বিবর্তন আমার মন-মানসিকতাকে একেবারে বদলে দিয়েছে এবং যে কোন শাসনকাল-চাই তা যতই প্রশস্ত ও প্রলম্বিত হোক তার উপর থেকে আমার আস্থা ও বিশ্বাস একেবারেই উঠে গেছে।

অতীতের কিছু নিদর্শন

আমরা সাইয়িদ আবদুল কাদির জীলানীর মাযার যিয়ারত করি এবং শায়খের মসজিদে একাধিকবার নামাযও আদায় করি। শায়খ হচ্ছেন উম্মতে ইসলামিয়ার সেই হাতে গোনা ব্যক্তিদের অন্যতম যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা কল্পনাতীত সম্মান মর্যাদা দান করেছিলেন। এরূপ খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা বহু কম লোকেরই ভাগ্যে জুটেছে। আমার চোখের সামনে শায়খের সেই

কৃতিত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড ভেসে উঠল, যা ইসলামের তাবলীগ ও প্রচার, অন্যায় প্রতিরোধ, অন্তর পবিত্রকরণ, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সব কিছু বর্জন এবং আল্লাহ্র সাথে সম্বন্ধ স্থাপনের আকারে প্রতিভাত হয়েছিল।[৬]

অগণিত ভক্ত শ্রোতাদের দ্বারা শায়খের মসলিস পরিপূর্ণ, নাসারা-ইয়াহুদীরা দলে দলে এসে তার কাছে ইসলাম গ্রহণ করছে। খুনী, ডাকাত, জুয়াড়ী ও দুষ্কৃতিকারীরা আপন কৃতকর্মের উপর অনুশোচনা প্রকাশ করে নতুন জীবনের সূচনা করছে। দর্শনার্থীদের অন্তর নম্রতা ও একাগ্রতায় ভরে উঠছে, তাঁর পরশে পাথর মোমে এবং শত্রু মিত্রে পরিণত হচ্ছে এ সব দৃশ্যাবলী আমি একটির পর একটি যেন অবলোকন করছিলাম।

এখন যদি শায়খ থাকতেন

শায়খের যুগ হলো, আব্বাসী খিলাফতের উত্থানের যুগ। চতুর্দিকে তখন ইসলামের জয়জয়কার। বলতে গেলে, সমগ্র বিশ্বই মুসলমানদের পদানত। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও শায়খ বাগদাদ এবং ইসলামী বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি মনে করতেন ইসলামের মধ্যে দুর্বলতা এবং মুসলমানেদের মধ্যে কপটতা সংক্রামিত হয়েছে। ইসলামী সমাজ সেই সমস্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে যা ছিল অতীত জাতি ও সাম্রাজ্যসমূহের পতনের কারণ। আর সেই ব্যধিগুলো হচ্ছে-জড়বাদিতা, কামাসক্তি, আত্মস্বার্থপরতা, গায়রুল্লাহ্র দাসত্ব, চরিত্রের প্রকৃষ্টতার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন, ধর্মবিমুখতা, রাজা-বাদশা ও আমীর উমরার তোষামোদ ইত্যাদি।

আমি মনে মনে বললাম, শায়খ যদি এখন জীবিত থাকতেন এবং আজ-কের বাগদাদ দেখতেন তাহলে তাঁর দয়াদ্র-কোমল অন্তরের অবস্থা কি হত ? তিনি নিশ্চয়ই দেখতে পেতেন, তাঁর এ যুগের স্বদেশবাসীরা কিভাবে নতুন নতুন মূর্তির পূজারীতে পরিণত হয়েছে, কিভাবে দুনিয়া প্রেমে মতোয়ারা হয়ে উঠেছে, কিভাবে ইসলামের পরিবর্তে অন্যান্য ধর্ম এবং মানুষের তৈরী জীবন পদ্ধতির সাথে নিজেদের জুড়ে দিয়েছে এবং কিভাবে বাইরে থেকে জীবনের আচরণ পদ্ধতি, প্রশাসন নীতি এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শ আমদানী করেছে। শায়খ , যিনি সম্ভ্রান্ত বংশীয় তথা হাশিমী খলীফার অসদাচরণ সহ্য করতে পারতেন না এবং তার চরিত্র ও কাজকর্মের কঠোর সমালোচনা করতেন তিনি আজকের এই পরিস্থিতিকে কিভাবে মেনে নিতেন

যখন একজন খ্রীষ্টান নেতা[৭] বা খোদাদ্রোহী নায়ক-এই ধর্ম ও বংশের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই-হারুন-অর রশীদ ও তার সন্তানদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে এবং পুশতিনী মুসলমান ও আরব বংশোদ্ভূত জাতি গোষ্ঠীকে এমনভাবে হাঁকাচ্ছে যেমন রাখাল ভেড়া বকরীর দল হাঁকিয়ে নিয়ে যায়।

ইসলাম ও মুসলমানের দুরবস্থার উপর শায়খের আক্ষেপ

আমার পরিষ্কার মনে পড়ছে, ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীতে যখন বাগদাদ দাওয়াত ও ইসলাহ্ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এবং ইসলাম দেশে-বিদেশে একটি শক্তিশালী ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল তখনও শায়খ তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন,

"দ্বীনে মুহাম্মদীর প্রাচীরসমূহ ধ্বসে পড়েছে, ইসলামের ভিত্তিসমূহ নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে (অতএব) এসো হে দেশবাসী, যে অংশ ধ্বসে পড়েছে তা পুনরায় উঠাই এবং মেরামত করি।

হে চন্দ্রসূর্য, হে দিবারাত্রি, এসো। হে লোকসকল, ইসলাম ফরিয়াদ জানাচ্ছে এবং সাহায্যের জন্য ডাকছে। এই দুষ্কৃতকারী, পথভ্রষ্ট, বিদআতী, জালিম এবং প্রতারকরা ইসলামকে পঙ্গু করে ফেলেছে।[৮] শায়খ তার এই আক্ষেপ ও মনোবেদনা তখনি প্রকাশ করেছিলেন যখন ছিল স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণের যুগ। যদি আজ শায়খ বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনি কী দুঃখই না পেতেন যখন দেখতেন খোদ মুসলমানরা ইসলামের উপর জুলুম নির্যাতন চালাচ্ছে, ধর্মকে তার জীবনকোঠা থেকে বেদখল করে দিয়েছে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে মুসলমানরা যে ইল্ম, বিজ্ঞতা ও ন্যায়বিচারে পূর্ণ নিখুঁত জীবন পদ্ধতি পেয়েছিল, তাদেরই ভাষায় যে অলৌকিক গ্রন্থ লাভ করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ্র রিসালাত ও নেতৃত্বের ছায়াতলে তারা যে সম্মান মর্যাদা ও উন্নতির অধিকারী হয়েছিল এখন তারা সেগুলোর প্রতি কোনই সম্মান প্রদর্শন করছে না বরং সেগুলোকে ছেড়েছুড়ে অন্য ধর্ম, অন্য মাযহাব, অন্য দর্শন ও অন্য জীবন ব্যবস্থার সাথে নিজেদের বেঁধে ফেলেছে। এক যুগ এমন ছিল যে, মুসলমানরা এখান (বাগদাদ) থেকেই অর্ধেক বিশ্ব শাসন করত, দুনিয়া-আখিরাত উভয় ক্ষেত্রেই তারা ছিল সৌভাগ্যের অধিকারী। মানুষের দেহ, মন উভয়কে জয় করে তারা তাদের শাসন চালাত। কিন্তু

মুসলমানরা যখন ইসলামের এই সমস্ত নিয়ামাতকে অবজ্ঞা করল তখনই তারা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, নিঃসতা ও অধঃপতনের গভীর গর্তে পতিত হলো।

ইরাক ঃ বিপ্লবের আগে ও পরে

আমরা প্রতিদিন শহরে যাবার সময় শারে রশীদ (রশীদ এভিনিউ) অতিক্রম করতাম। এটাই ছিল আমাদের হোটেলের নিকটতম রাস্তা। আমরা রাসাফাহ ও কুরখের মধ্যবর্তী স্থানে পায়চারি করতাম এবং এই সমস্ত স্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট কবিতা ও ঘটনাসমূহের স্মৃতিচারণ করতাম।[১] আমরা ঐ পুল পাড়ি দিতাম যা এই দুইটি অঞ্চলকে একত্রে গ্রথিত করেছে। তখন আমরা ঐ সমস্ত গীতিকবিতা আবৃত্তি করতাম যা এই পুল (জাস্‌র)-কে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে আরো অনেক পুল নির্মিত হয়েছে যেগুলোর উপর দিয়ে দজলা পার হওয়া যায়।

ইতিপূর্বে ১৯৫৬ ইং সনে আমি বাগদাদে এসেছিলাম। তখন ছিল শাহ ফায়সাল বিন গাযীর শাসনকাল। নূরী আস- সাঈদ পাশা ছিলেন তাঁর মন্ত্রী। সত্যি কথা বলতে গেলে, ওটা কোন আদর্শ শাসনকাল ছিল না। তখনকার শাসন ব্যবস্থা ও প্রশাসন নীতির কঠোর সমালোচনা করার সুযোগ রয়েছে। জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের মধ্যে বহু যোজন দূরত্ব বিরাজ করছিল। জুলুম, অত্যাচার, স্বেচ্ছাচারিতা ও একদেশদর্শিতা ছিল। ইরাকী রাষ্ট্র যেন বৃটিশ রাজনীতির ছত্রছায়ায় চলছিলো। নিঃসন্দেহে এই অবস্থা ভ্রান্ত এবং সমালোচনাযোগ্য। যদি শাসকদের আচার-আচরণ ঠিক হত, যদি তারা ইসলামী শরীআত এবং ন্যায় ভিত্তিক আদর্শ অনুসরণ করতেন তাহলে পুরোপুরি সম্ভাবনা ছিল যে, দেশ আরো সুখী, সুদৃঢ় ও স্বচ্ছল হত।

কিন্তু এবার যখন আমি বাগদাদের রাস্তায় পায়চারি করছিলাম, জন-সাধারণের কথাবার্তা শুনছিলাম এবং তাদের চেহারার রেখা পড়ছিলাম তখন এবং এই সফরের বিশেষ কিছু অভিজ্ঞতার আলোকেও অনুভূত হচ্ছিলো যে, আবদুল করীম কাসিমের বিপ্লবের পূর্বে দেশ অধিকতর স্বচ্ছল ও সুদৃঢ় ছিল, জাতির মধ্যে আজকের চাইতে অধিক স্বাধীনতা, স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধিকার ছিল। ১৯৫৬ ইং সনে যখন আমি বাগদাদে আসি তখন কোন ধরনের চাপ, বাধ্যবাধকতা বা খবরদারী ছিল না। আমি অবাধে বাগদাদ ও বাগদাদের

বাইরে যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়িয়েছি। যার সাথে ইচ্ছা সাক্ষাৎ করেছি এবং যে কেউ ইচ্ছা করেছে, আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছে-কোন ধরনের জিজ্ঞাসাবাদের আশংকা মোটেই ছিল না। 'জামিয়াতু ইনকাযে ফিলিস্তিন-কেন্দ্রে আমি একটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম, যা পরে 'আযিযমাতু ঈমানিনও আখলাকিন' নামে প্রকাশিত হয়। ঐ অনুষ্ঠানে বিরাট সংখ্যক যুবক ও শিক্ষিত শ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিলেন। আমি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ঐ বক্তৃতায় আমার অভিমত ব্যক্ত করেছিলাম।

ইরাক ও ইসলামী বিশ্বের চারিত্রিক অধঃপতন, বর্তমান সমাজের ঈমান ও চরিত্রগত ভ্রষ্টতা, বিবেকবান ও আদর্শবান ব্যক্তিত্বের অভাব প্রভৃতি বিষয়ের উপর আমি অবাধে আমার অভিমত পেশ করেছিলাম। এতদসত্ত্বেও রাজনৈতিক মহলে কোন হৈ চৈ সৃষ্টি হয়নি, আমাকেও কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি, বরং আমি বাগদাদ থেকে সেরূপ নিশ্চিন্তে, নিরাপদে ও আনন্দচিত্তেই বেরিয়ে এসেছিলাম-যেরূপ দাখিল হয়েছিলাম সেখানে।

মানুষের স্বভাব এই যে, সে লাভ-ক্ষতি এবং সাফল্য অসাফল্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা করে না।

তাহলে শেষ পর্যন্ত এই ভয়ংকর বিপ্লব ঐ সমস্ত দেশকে কী দিল-যে সব বিপ্লব ঘটানো হয়েছিল দেশ ও জাতির অবস্থা উন্নতিকরণ, জুলুম অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি থেকে তাদেরকে মুক্তকরণ এবং তাদের জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠার শ্লোগান উচ্চারণ করে? এটি এমন প্রশ্ন, যার উত্তর আমি ঐ সব ব্যক্তিদের কাছে চাই যারা সত্যান্বেষী, সত্যনিষ্ঠ এবং সর্বোপরি আরব-ইসলামী দেশসমূহের সমস্যাদি সম্পর্কে আগ্রহী।

জামিউশ শুহাদায় বক্তৃতা

আওকাফ দফতর 'জামিউশ শুহাদাকে আমাদের জুমআর নামায আদায়ের স্থান হিসাবে নির্ধারণ করেছিল, যা বাগদাদ থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে এবং এই ভীষণ গরমের সময় দুপুর বেলা সেখানে যাওয়াও অত্যন্ত কষ্টকর। জানি না, কিভাবে আমাদের আগমন সংবাদ সেখানকার উলামা ও মুসলিম যুবকশ্রেণীর কাছে পৌছে গিয়েছিল, যারা আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করা এবং আমাদের কথা শুনার জন্য খুবই আগ্রহী ছিলেন। দেখা গেল, মসজিদ নামাযীতে একেবারে উপ্‌চে উঠেছে। আমার কাছে বেশ কিছু

লোক তাদের মনোবঞ্ছা প্রকাশ করলেন, যেন নামাযের পর আমি কিছু বলি। আমি জ্ঞাত কারণেই তাদের কাছে ওজর পেশ করলাম, কিন্তু তাতে কোন কাজ হলো না। শেষ পর্যন্ত আমি বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের উপর ছেড়ে দিলাম। আমি আশংকা করছিলাম, শেষ পর্যন্ত এমন কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে যায়, যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঐ বন্ধুদের উপর গিয়ে পড়ে, যারা আমার বক্তৃতা শুনার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন এবং সে উদ্দেশ্যেই মসজিদে এসেছিলেন। যা হোক কর্তা ব্যক্তিরা শেষ পর্যন্ত আমাকে বক্তৃতা করার অনুমতি প্রদান করে।

আমি চিন্তা করতে লাগলাম, আমার আজকের বক্তৃতার বিষয়বস্তু কি হবে ? আমি উপলব্ধি করছিলাম, আমার কথা বলার বৃত্ত সীমিত এবং পরিস্থিতি নাজুক। এমন সময় কুরআনই আমাকে হাত ধরে পথ দেখিয়ে দিল—আর কুরআন সব সময়ই এরূপ বিব্রতকর অবস্থায় মানুষকে সরাসরি পথ প্রদর্শন করে থাকে। এটাকে আল্লাহ্র ইলহাম এবং তার তাওফীকই বলতে হবে যে, উস্তাদ আবদুর রাযযাক ফাইয়ায তাঁর অতি মিষ্টি ও আকর্ষণীয় সুরে নামাযের পূর্বে সূরা আম্বিয়া তিলাওয়াত করেছিলেন। আমি এই সূরারই নিম্নোক্ত আয়াতটিকে—

لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ٠

—আমার বক্তৃতার বিষয়বস্তু হিসাবে বেছে নিলাম। পবিত্র আয়াতটি যেন আমার কথার মধ্যে এক দূর-দিগন্তের সৃষ্টি করলো। ফলে এমন সব কথা আমার মুখ দিয়ে বের হতে লাগলো যা অন্তরকে স্পর্শ করে, জীবনের সাথে যার সম্পর্ক রয়েছে এবং যা ছিল পরিস্থিতিরও সম্পূর্ণ অনুকূল। আমি যা বলেছিলাম তার সারমর্ম ছিল নিম্নরূপ ঃ

কুরআন এমন স্বচ্ছ দর্পণ
যার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমষ্টি তাদের চেহারা
ও স্থান চিনে নিতে পারে

বন্ধুগণ, আমার এক প্রিয় বন্ধুর কাছ থেকে সূরা আম্বিয়ার তিলাওয়াত শুনার পর নিম্নোক্ত আয়াতটি যেন আমার মনের মধ্যে তার অর্থের শত কলি ফুটিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ٠

অর্থ ঃ "আমি তো তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি কিতাব, যাতে আছে তোমাদের উল্লেখ, তবুও কি তোমরা বুঝবে না।"

এই আয়াত আমাদের বলছে যে, কুরআন এমন এক স্বচ্ছ-পরিষ্কার ও নিখুঁত বিশ্বস্ত দর্পণ যার মধ্যে প্রতিটি লোক নিজের চেহারার রেখাগুলো পড়তে পারে, সমাজের তার কি অবস্থা তা সে দেখতে পারে এবং আল্লাহ্‌র কাছে তার কি মর্যাদা তাও জেনে নিতে পারে। কেননা কুরআন মানুষের চরিত্র ও গুণাবলী বর্ণনা করে এতে মানুষের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন নমুনার ছবি অংকিত রয়েছে। فيه ذكركم-অর্থাৎ এই কিতাবে তোমাদের বর্ণনা আছে, তোমাদের অবস্থা ও গুণাবলীর উল্লেখ আছে। আমাদের পূর্ববর্তী উলামা ও গুরুজনেরা কুরআনকে একটি জীবন্ত উপদেশদাতা বলে মনে করতেন। তাঁদের মতে, কুরআন এখন কেন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু নয়, যা শুধু অতীত বা অতীত যুগের লোকদের সম্পর্কে আলোচনা করে এবং জীবিত লোকদের সমস্যাদি এবং মনুষ্যত্ব ও মানবতার অগণিত নমুনা ও আদর্শ, যার অস্তিত্ব প্রতিটি যুগে এবং প্রতিটি স্থানে ছিল বা আছে-তার সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না।

আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ তাদের চরিত্র ও গুণাবলী এবং তাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থাদি সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত ছিলেন। প্রতিটি বস্তু তাদের সামনে ছিল পরিষ্কার। তারা এই কুরআন থেকেই তাদের পথের দিশা পেতেন। এই অলৌকিক ও বিস্ময়কর গ্রন্থে তারা নিজেদের চেহারা দেখতেন, নিজেদের চরিত্র ও আচার-আচরণের প্রকৃত অবস্থা নিরীক্ষণ করতেন। যদি তা আশানুরূপ ও সন্তোষজনক হত তাহলে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করতেন, আর যদি অন্যরূপ হত তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হতেন এবং নিজেদের সংশোধন ও সংস্কারে সচেষ্ট হতেন।

এই আয়াতের তিলাওয়াত শুনে সাইয়িদিনা আহ্‌নাফ বিন কায়সের একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ল। হযরত আহনাফ ছিলেন শ্রেষ্ঠ তাবেয়ীদের অন্যতম। তিনি সাইয়িদিনা আলী বিন আবী তালিবের একজন বিশিষ্ট অনুসারী ছিলেন। তার ধৈর্য ও সংযম প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও যখন রাগান্বিত হতেন তখন তাঁর আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ

দারুনভাবে সজাগ হয়ে উঠত। লোকে বলাবলি করত যে, আহনাফের যখন রাগ উঠে তখন একসাথে যেন ঝলসে উঠে লক্ষ তরবারি। এই ঘটনা আমি আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন আন-নাস্‌র আল-মারূযী (মৃত্যু ২৭৫ হিঃ সন)-এর গ্রন্থ 'কিয়ামুল লায়ল-এ পড়েছি। গ্রন্থকার ছিলেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর শ্রেষ্ঠ শিষ্যদের অন্যতম এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই গ্রন্থ আপনাদেরই শহর বাগদাদে রচিত হয়েছিল।

ঘটনাটি এই যে, একদা আহনাফ বিন কায়েস জনৈক ব্যক্তিকে এই আয়াত পড়তে শুনে চম্‌কে উঠেন এবং বলেন, 'একটু কুরআন মজীদ নিয়ে এসো তো, আমি তাতে আমার পরিচয় তালাশ করবো, দেখবো আমি কার সাথে আছি বা কার সাথে আমি তুলনীয়।

তিনি যখন কুরআন মজীদ খুললেন তখন তার দৃষ্টি এই আয়াতের উপর পড়ল যাতে কিছু লোক সম্পর্কে বলা হয়েছে-

كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ‧ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ‧ وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ‧

অর্থ ঃ "তারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করত নিদ্রায়, রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং নিজেদের ধনসম্পদে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক আদায় করত।" -(৫১ ঃ ১৭-১৯)

এরপর তার দৃষ্টি পড়লো নিম্নোক্ত আয়াতটির উপর-

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ‧

অর্থ ঃ "তারা শয্যা ত্যাগ করতঃ তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায় এবং আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে।" -(৩২ ঃ ১৬)

এরপর তার সামনে এমন একটি দল উপস্থিত হল যাদের প্রশংসা নিম্নভাবে করা হয়েছেঃ-

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا

অর্থ ঃ "এবং তারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত এবং দণ্ডায়মান থেকে।" -(২৫ ঃ ৬৪)

এরপর তিনি অতিক্রান্ত হলেন ঐ সমস্ত লোকের নিকট দিয়ে যাদের উল্লেখ কুরআন মজীদে নিম্নোক্তভাবে করা হয়েছে–

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَ الْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ - وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ·

অর্থ ঃ " যারা স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ্ সৎকর্ম পরায়ণদের ভালবাসেন।" – (৩ঃ ১৩৪)

এরপর তার সামনে আরো কিছু নমুনা উপস্থিত হলো যার পরিচয় নিম্নরূপ ঃ

وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ · وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ·

অর্থ ঃ "তারা মুহাজিরদেরকে নিজেদের উপর স্থান দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও, যারা কার্পণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম।" – (৫৯ ঃ ৯)

এরপর তাঁর সামনে এলো নিম্নের আয়াতটি–

وَ الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ وَ اِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ · وَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ·

অর্থঃ " যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হতে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধাবিষ্ট হয়েও ক্ষমা করে দেয়, যারা তাদের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাদেরকে আমি যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে।" –(৪২ ঃ ৩৭–৩৮)

এরপর তিনি থেমে গেলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহ্, এখনো তো আমি নিজেকে খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি পুনরায় অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন। এবার তিনি এমন একটি দলের উল্লেখ পেলেন যাদের আচার–আচরণ নিম্নরূপঃ

اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ۔ وَ يَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ۔

অর্থঃ ''আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই–একথা ওদের নিকট বলা হলে তারা অহংকারে তা অগ্রাহ্য করত এবং বলত ঃ আমরা কি উন্মাদ কবির কথায় আমাদের ইলাহ্দেরকে বর্জন করবো" ?– (৩৭ ঃ ৩৫–৩৬)

এরপর তাঁর চোখে পড়ল নিম্নের আয়াতটি–

وَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَ اِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۔

অর্থঃ ''যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ্ এক–একথা বলা হলে তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তাদের দেবতাগুলোর উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।–(৩৯ ঃ ৪৫)

তারপর ঐ সমস্ত লোকের উল্লেখ আসে যাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবেঃ–

مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ۔ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۔ وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ۔ وَ كُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ ۔ وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ حَتّٰى اَتَانَا الْيَقِيْنُ ۔

অর্থঃ " তোমাদেরকে কিসে সাকার–এ নিক্ষেপ করেছে ? ওরা বলবে, আমরা সালাত কায়েম করতাম না, আমরা অভাবগ্রস্তকে আহার্য দান করতাম না এবং যারা অন্যায় আলোচনা করত তাদের আলোচনায় যোগ দিতাম, আমরা কর্মফল দিবস অস্বীকার করেছি, আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত।" (৭৪ ঃ ৪২–৪৭)

এরপর তিনি থেমে গেলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহ্ আমি তোমার দরবারে এই সমস্ত লোকের নিষ্কৃতি কামনা করি। এরপর একের পর এক পাতা উল্টিয়ে অনুসন্ধান করতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত নিম্নের আয়াতটি তার নজরে ভেসে উঠলোঃ

وَ اٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلاً صَالِحًا وَ اٰخَرَ سَيِّئً عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

অর্থ ঃ "অপর কতক লোক নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে, ওরা এক সৎকর্মের সাথে অপর এক অসৎকর্ম মিশ্রিত করেছে। আল্লাহ্ হয়ত ওদেরকে ক্ষমা করবেন, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" –(৯ ঃ ১০২)

তারপর তিনি বলতে লাগলেন, 'প্রভু, আমি এই সব লোকেরই অন্তর্ভুক্ত।[১০]

আসুন, আমরা নিজেদের বর্ণনা এবং নিজেদের ছবি ধীরে-সুস্থে এবং বিশ্বস্ততার সাথে কুরআন থেকে খুঁজে বের করি। কুরআন যেমন সুসংবাদ দাতা তেমনি সতর্ককারী। সৎকর্মশীলদের সাথে সাথে কাফির ও মুশরিকদের বর্ণনাও এতে রয়েছে। কুরআনে ব্যাষ্টি, গোষ্ঠী উভয়েরই ছবি অংকিত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে–

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ يُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ وَ هُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ . وَ اِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ - وَ اِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ الْمِهَادُ .

অর্থঃ "মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে যার পার্থিব জীবন সম্বন্ধে কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহ্কে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে কিন্তু ঘোরবিরোধী। যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শস্যক্ষেত্রে ও জীবজন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে ; কিন্তু আল্লাহ্ অশান্তি পছন্দ করেন না। যখন তাকে বলা হয়, তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর, তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত করে। সুতরাং জাহান্নামই তার জন্য যোগ্য। নিশ্চয় ওটা নিকৃষ্ট আশ্রয় স্থল।" –(২ ঃ ২০৪–৬)

এরপর বলা হয়েছে–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ ·

অর্থঃ "মানুষের মধ্যে অনেকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভার্থে আত্মবিক্রয় করে থাকে। আল্লাহ্ তাঁর দাসগণের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।

একটি দলের উল্লেখ আছে নিম্নভাবে–

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ - يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ط ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ·

অর্থঃ "হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের মধ্যে কেউ দ্বীন হতে ফিরে গেলে আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসেন ও যারা তাকে ভালবাসবে ; তারা বিশ্ববাসীদের প্রতি কোমল ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি কঠোর হবে, তারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবেন না, এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।"–(৫ ঃ ৫৪)

অপর একটি দলের উল্লেখ আছে নিম্নভাবে–

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ج فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ·

অর্থঃ "বিশ্বাসীদের মধ্যে কতক আল্লাহ্‌র সাথে কৃত তাদের অংগীকার পূর্ণ করেছে, ওদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। ওরা তাদের লক্ষ্য পরিবর্তন করেনি। –(৩৩ ঃ ২৩)

· শুক্‌র ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করত গিয়ে কুরআন আম্বিয়া ও তাঁদের অনুসারীদের উল্লেখ করেছে এবং নাশুক্‌রী, কৃতঘ্নতা,

দাম্ভিকতা ও সদ্ব্যবহারের উত্তর দুর্ব্যবহারের মাধ্যমে প্রদানের নিন্দা করতে গিয়ে এবং এগুলোর দুর্ভাগ্যজনক পরিণামের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۔

অর্থঃ "তুমি কি ওদেরকে লক্ষ্য কর না যারা আল্লাহ্র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বদলে তা অস্বীকার করে এবং ওরা ওদের সম্প্রদায়কে নামায়ে আনে ধ্বংসের ক্ষেত্রে।"-(১৪ ঃ ২৮)

আর এর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছে এমন এক জনবসতি দ্বারা যারা আল্লাহ্র নিয়ামাত বিস্মৃত হয়েছে এবং নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্যের উপর দাম্ভিক হয়ে উঠেছে-

وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَا قَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَ الْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ۔

অর্থঃ "আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিত, যেথায় আসত সব দিক থেকে তার প্রচুর জীবনোপকরণ ; এরপর তা আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করল ; ফলে তারা যা করত সেজন্য আল্লাহ্ তাদেরকে আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির। -(১৬ ঃ ১১২)

ঐ সমস্ত মানবিক ও চারিত্রিক নমুনা, যা কুরআন বিভিন্ন নামে পেশ করেছে-কোথাও কোন স্বেচ্ছাচারী শাসনের নামে যেমন ফিরআউন, কোথাও কোন সত্যদ্রোহী মন্ত্রী কিংবা আমীরের নামে-যেমন হামান, কোথাও কোন দাম্ভিক ও কৃপণ পুঁজিপতির নামে-কারূন, কোথাও কোন জালিম অত্যাচারী জাতির নামে-যেমন আদ, আবার কোথাও কোন বিখ্যাত স্থাপত্য দক্ষ জাতির নামে-যেমন সামূদ-এসবই স্থায়ী মানবিক নমুনা, যা কোন স্থান-কালের সাথে নির্দিষ্ট নয়, এসব নমুনা মানব-স্বভাবের বিভিন্ন দুর্বল দিক এবং দুর্বল প্রান্তের প্রতিনিধিত্ব করছে।

কুরআন কারীম এই সমস্ত ব্যষ্টি ও গোষ্ঠীর শেষ পরিণামের উপরও আলোকপাত করেছে এবং পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছে, যে বা যারাই ওদের

পদানুসরণ করবে, ওদেরকে আপন নায়ক ও পথপ্রদর্শক বলে স্বীকার করবে তার বা তাদের পরিণামও তাই হবে যা ওদের হয়েছে।

سُنَّةَ اللّٰهِ فِيْ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ط وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا ۔

অর্থঃ ''পূর্বে যে সব নবী অতীত হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রেও এই ছিল আল্লাহ্‌র বিধান। আল্লাহ্‌র বিধান সুনির্ধারিত। –(৩৩ ঃ ৩৮)

বক্তৃতা শেষ হতেই শ্রোতারা করমর্দনের জন্য যেন ফেটে পড়ে। একজন তো আমাকে কানে কানে বলেই ফেললো, শ্রোতার সংখ্যা এর দশ গুণ হত, গোটা বাগদাদ এখানে ছুটে আসত–যদি অবস্থা স্বাভাবিক হত এবং মানুষের স্বাধীনতা ও স্বাধিকার থাকত।

হায় ! বসরা দেখা হলো না

আমরা বসরা সফরের অনুমতি চাইলাম। এটা হচ্ছে সেই স্থান যা ছিল জ্ঞান, আল্লাহ্ প্রেম ও ইসলামী দাওয়াতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, উমাইয়া যুগে দামেশ্‌কের পর সর্ববৃহৎ শহর এবং সাইয়িদিত তাবিয়ীন হাসান বসরীর জন্মভূমি। কিন্তু আমাদেরকে সেই পুরানা কথাই শুনানো হলো, 'সদ্‌রে জামহুরিয়া তলব করবেন এবং আপনাদেরকে পাওয়া যাবে না। কুয়েত যাবার সময় ইচ্ছা ছিল বসরার থেমে সেখান থেকে আম্মান যাবো, কিন্তু সে সুযোগ পাওয়া গেল না।

বাগদাদ ত্যাগ

রোববার সন্ধ্যায় বাগদাদ ত্যাগ করলাম। অন্তরে এর স্মৃতি এবং ভালবাসা উঁকিঝুঁকি মারছিলো। ভাবের ভাষায় যেন উচ্চারিত হচ্ছিলো–

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے

بہت نکلے مرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے

''হাজারো বাসনা এমন যে, প্রত্যেক বাসনার উপর প্রাণবায়ু নির্গত হওয়ার উপক্রম হয়।

আমার বহু আশাই প্রতিফলিত হয়েছে, এরপরও কিন্তু বহু কমই প্রতিফলিত হয়েছে।

টীকা :

১. 'সাজলুত তাশরীফাত বলা হয় সেই রেজিষ্টারকে, যাতে শুধু সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এবং যারা সদ্রে জামহরিয়ার সাথে দেখা করেন তারাই স্বাক্ষর করে থাকেন। এটা বিভিন্ন রাষ্ট্রের একটি সৌজন্যনীতি, যা বহিরাগত বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দকে পালন করতে হয়।

২. সেই স্থান, যেখানে শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (র.) সমাধিস্থ আছেন।

৩. এখানে ইমাম মূসা কাযিম এবং তাঁর প্রপৌত্র মুহাম্মদ আত্-তাকী আল-জাওয়াদ সমাধিস্থ আছেন। এই দুই মহান ব্যক্তি শিয়া হযরাতের মতে, ইছনা আশারী ইমামদের অন্যতম। জায়গাটি 'কাযিমীন নামে খ্যাত।

৪. ঐ জায়গা যেখানে হযরত সালমান ফারসী সমাধিস্থ আছেন। সেখান থেকে কিঞ্চিত দূরে হযরত হুযায়ফা বিন আল ইয়ামান-এর সমাধি রয়েছে।

৫. আমি আমার গ্রন্থ, 'তারীখে দাওয়াত ও আযীমত (প্রথম খণ্ড)-এ শায়খের অবস্থাদি ও কৃতিত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের উপর বিস্তৃত আলোকপাত করছি।

৬. কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, মূর্খরা তাঁর ধর্মপালনের ঐকান্তিকতা, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের আহবান এবং সুন্নাত প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করেনি। তারা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এমন সব পন্থা অবলম্বন করতে থাকে যা তাওহীদ ও ইসলামী শিক্ষার ঘোর বিরোধী। যেমন তারা তাঁর কবরকে সিজদা করে, চুমো দেয়, তাওয়াফ করে। এইসব ইসলাম বিরোধী দৃশ্য আমাকে যারপরনাই আঘাত দেয়। আমি এদিকে সেখানকার দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমার বিশ্বাস, যদি আওকাফ মন্ত্রণালয় কিংবা 'নেকবাতুল আশরাফ, দৃঢ় উদ্যোগ গ্রহণ করেন তাহলে এই সমস্ত কুকর্ম বন্ধ করা খুব একটা কঠিন হবে না।

৭. এখানে, ইরাকে বর্তমান ক্ষমতাসীন 'আল-বাথ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও নায়ক মিশেল আফলাক-এর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। আফলাক ধর্মের দিক দিয়ে খ্রীষ্টান এবং মূলতঃ জাতীয়তাবাদী ও সমাজতন্ত্রী ছিলেন।

৮. আল ফাতহুর রাব্বানী ঃ পৃষ্ঠা-৬৬১

৯. বাগদাদের পশ্চিম পার্শ্বের মহল্লাগুটি 'কুরখ নামে খ্যাত। এই মহল্লা সম্পর্কে কবি আবুল আ'লা মাররী বলেন-

فيا برق ليس الكرخ داری و انما + رمانی اليه الدهر منذ ليال

فهل فيك مان ماء المعرة قطرة + تغيث بها ظمان ليس بسال

" অর্থাৎ হে বিজলী, কুরখ আমার জন্মস্থান নয়, কালের বিবর্তন কিছু দিনের জন্য এখানে ছেড়ে গেছে। তোমার কাছে কি 'মাআরবার এক বিন্দু পানি আছে যার দ্বারা একজন পিপাসার্ত তার পিপাসা নিবৃত্তি করবে?

কুরখ বাগদাদের একটি প্রাচীন মহল্লা। এর পূর্ব দিকের এলাকাটি রাসাফা নামে খ্যাত। হারুন রশীদ নিজেই এই নামকরণ করেছিলেন, এবং এখানে তিনি একটি প্রসাদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। রাসাফাহ্ সম্পর্কে ইবনুল জাহ্ম বলেন,

عيون المهابين الرصافة و الجبر + جلبن الهوى من حيث أدری ولا أدری

اثرن لی الشوق القديم القديم و لم اكن + سلوت و لكن زدن جمرًا علي جمر

" আয়াত নয়না সুন্দরীরা যারা রাসাফাহ্ ও জাসরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে হাস্যরসে নিমগ্ন রয়েছে–আমাকে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পন্থায় তাদের প্রেম ডোরে বেঁধে নিয়েছে। তারা আমার পুরাতন আসক্তিতে যা এখনো ঝরে যায় নি –এক নতুন স্পন্দন এনে দিয়েছে এবং বাতাস করে এই ভালবাসার স্ফুলিঙ্গকে আরো উজ্জ্বল করে দিয়েছে।

১০. কিতাবু কিরামিল লায়ল ঃ পৃষ্ঠা ১৩ ঃ মুলতান সংস্করণ, হিঃ ১৩২০ সন।

প্রাণ উৎসর্গকারী

রক্ষীসেনার দেশ

জর্দান

৬

বাগদাদ থেকে আম্মান

আমাদের এই সফরের শেষ লক্ষ্যস্থল ছিল পূর্ব জর্দান। এরূপ হওয়াটা আমাদের জন্য ভালাই হলো। কেননা মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সেখানে পাওয়া গিয়েছিল তা ঐ সমস্ত দেশে মোটেই পাওয়া যায় নি। যেখানকার সরকারগুলো বাহ্যিকভাবে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারী এবং যেখানকার রাজনৈতিক নেতারা এক মুহূর্তের জন্যও মেনে নিতে রাজী নয় যে, তাদের উপর নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা বংশের শাসন চলুক। তাদের মতে, এটা এমন এক ধরনের পশ্চাৎপদতা, যা এই স্বাধিকার ও উন্নতির যুগে মোটেই সহ্য করা যায় না।

১২ই আগস্ট, ১৯৭৩ ইং রাত আনুমানিক ৯টায় আমরা বাগদাদ থেকে রওয়ানা হলাম। আমাদের বিদায় জানানোর জন্য সাউদী রাষ্ট্রদূত এবং বাগদাদের কিছু সংখ্যক শিক্ষক যারা সাউদী আরবে শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত আছেন-বিমান বন্দরে এসেছিলেন। বসরা বিমান বন্দরে আমরা এক ঘন্টার জন্য অবতরণ করলাম। পূর্বাহ্ণে আবেদন করা সত্ত্বেও আমরা এই ঐতিহাসিক শহরটি দেখার অনুমতি পাইনি, যা একদা দ্বীন, ইল্‌ম, সাহিত্য ও আরবী ব্যায়াকরণের গবেষণা এবং প্রচার-প্রসারের একটি বিরাট কেন্দ্র ছিল। বিমান বন্দরে আকস্মিকভাবেই সাউদী কাউন্সিলারের সাথে আমাদের দেখা হয়। তিনি বার বার অনুরোধ করেন, যেন আমরা বসরায় কিছু সময়ের জন্য হলেও তার আতিথ্য গ্রহণ করি। এই অভাবিত সাক্ষাতে আমরা সবাই আনন্দিত হই। এরপর আমরা কুয়েতের উদ্দেশ্যে বিমানে আরোহণ করি। আমরা কুয়েতের শেরাটন হোটেলে রাত কাটাই। সেখানে শায়খ আবদুর রায্‌যাক সালেহ, আমাদের বন্ধু ডঃ আবদুল লতিফ খান এবং ভ্রাতৃপ্রতিম ইবরাহীম হাসনী আমাদের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। তারা কিছুক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন। তারপর আমাদেরকে বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ দানের জন্যই তারা নিজ নিজ আবাসে ফিরে যান।

১৩ই আগস্ট ১৯৭৩ ইং সোমবার সকালে আমরা আম্মানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই এবং জুহরের পূর্বেই সেখানে পৌছি। আমাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন আওকাফ মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী উস্তাদ আবদ্ খলফ, পাকিস্তানস্থ জর্দানের রাষ্ট্রদূত, রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর 'মজলিসে তাসীসী (সাংগঠনিক)-এর সদস্য কামিল আশ্-

শরীফ, সাউদী মাদারুল মুহাম উস্তাদ মুহাম্মদ আয়মাশ এবং অন্যান্য ব্যক্তিবৃন্দ। আমরা বিমান বন্দর থেকে সোজাসুজি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, জর্দান-এর দিকে রওয়ানা হই। পথিমধ্যে সাইয়িদ কামিল আশ্-শরীফ আমাদেরকে বলেন, 'শাহ্ হুসায়ন প্রতিনিধিদলের এই সফরের সংবাদ শুনে খুশী হয়েছেন এবং প্রতিনিধিদলকে খোশ আমদেদ জানিয়েছেন; সম্ভাবনা আছে যে, তিনি কোন এক সময়ে প্রতিনিদলকে সাক্ষাৎ দান করবেন। আমরা এজন্য তাঁর (শাহের) শুকরিয়া আদায় করি। তবে এই অভিজাত বংশ থেকে অনুরূপ ব্যবহারের প্রত্যাশা খুবই স্বাভাবিক; এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

আওকাফ মন্ত্রণালয়ের আতিথ্য

আওকাফ ও ইসলামী বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আতিথ্যে আমরা হোটেলে অবস্থান করি। আমাদের দেখাশুনার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন ডঃ ইসহাক ফারহান। আওকাফ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রতি বছর একটি শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সৌভাগ্যক্রমে আমরা ঠিক তখনই জর্দানে আসি, যখন ইসলামী সংস্কৃতির প্রচার এবং ইসলামী অনুভূতির পুনর্জাগরণের জন্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছিলো এবং বক্তৃতার আলোচ্যসূচীও তৈরী করা হচ্ছিলো। আমরা যখন দামেশ্কে ছিলাম তখনই মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী আমাদেরকে এসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদানের আগাম আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। মাননীয় আওকাফ মন্ত্রী এই লেখকের ঠিকানায় ভারতেও একটি আমন্ত্রণ লিপি পাঠিয়েছিলেন। প্রতিনিধিদলের এই জর্দান সফরকে মন্ত্রণালয় একটি সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে। এর প্রেক্ষাপটে তারা বক্তৃতা-বিবৃতি, সাক্ষাৎকার ও সফরের কর্মসূচী তৈরী করে এবং তা ব্যাপকভাবে প্রচারও করে।

মাননীয় আওকাফ মন্ত্রী হোটেলে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। আরব প্রাচ্যে যে কয়েকজন বিশিষ্ট পন্ডিত ও শিক্ষাবিদ রয়েছেন তিনি তাদের অন্যতম। তিনি ইসলামী চিন্তাধারা ও ইসলামী মন-মানসিকতারও অধিকারী। ইতিপূর্বে জর্দানে শিক্ষা ও আওকাফ বিষয়সমূহ একই মন্ত্রণালয়ের অধীন ছিল। পরবর্তী সময়ে দু'টি বিষয়ের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়েছে। আমরা ডক্টর সাহেবকে তাঁর ইসলামী প্রবন্ধাদির মাধ্যমে জেনেছিলাম। 'ইসলামী দেশসমূহের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ' বিষয়ের উপর তাঁর

কোন কোন প্রবন্ধ আমাদের মতে খুবই চিন্তামূলক এবং বিবেচনা যোগ্য। মন্ত্রীসভায় তাঁর অস্তিত্ব দেশের জন্য আশীর্বাদতুল্য যদিও তার দায়িত্ব শিক্ষামন্ত্রণালয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অনুরূপভাবে তথ্য ও বেতার বিভাগের পরিচালক উস্তাদ আলী ফারীজ, ডঃ আবদুল্লাহ্ আজাম (যিনি প্রতিনিধিদলের রফীক নিযুক্ত হয়েছিলেন), মহাপরিচালক উস্তাদ ইয্যুদ্দীন খাতীব এবং সাপ্তাহিক 'আল্ লেওয়া'-এর সম্পাদক উস্তাদ হাসান আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

মাননীয় আওকাফ মন্ত্রী এবং তাঁর সঙ্গীদের সাহচর্য

১৪ই আগস্ট ৭৩ ইং, মঙ্গলবার সকাল ৯টায় আওকাফ ও ইসলামী বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর সাথে তাঁর অফিসে সাক্ষাতের মাধ্যমে প্রতিনিধিদল তাদের কর্মসূচীর সূচনা করে। দু'ঘন্টা স্থায়ী এই সাক্ষাতকারে মাননীয় মন্ত্রী আওকাফ মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচী, কর্মক্ষেত্র, ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিবর্তনের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, সর্বপ্রথম আওকাফ মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাথেও এই মন্ত্রণালয় সরাসরি সম্বন্ধ স্থাপন করছে। মন্ত্রী মহোদয়ের কথায় দৃঢ়তা ও উপস্থিত বুদ্ধির ঝলক ফুটে উঠছিলো। তাঁকে ইসলাম ও সাধারণ শিক্ষার পয়গাম এবং সমসাময়িকতার অনুভূতি সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ মনে হল। এ বিষয়টি তার কাছে অজ্ঞাত নয় যে, এ 'ওয়াক্ফ'-এর ফিক্হী আহকাম ও মাসায়েলের মধ্যে এমন গ্রহণ-যোগ্যতা রয়েছে যে, তা সমসাময়িক যুগের অনুকূলে থেকেও কিতাব, সুন্নাহ্ ও ফিক্হে ইসলামীর আলোকে মুসলমানদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান ও যাবতীয় প্রয়োজনাদি পূরণ করতে পারে। মাননীয় মন্ত্রী এই সীমিত সময়ের আলোচনায় তাঁর মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো এবং এর অধীনে পরিচালিত সংস্থাসমূহের একটি বিস্তারিত বিবরণী পেশ করেন, যার দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা অনেক তথ্য জানতে পারি এবং এই মন্ত্রণালয়ের এমন একটি বিস্তারিত ও সমন্বিত নক্শা আমাদের সামনে ভেসে উঠে, যা ইসলামী উপাদানসমূহ সংরক্ষণ এবং তার সাথে আধুনিক উপাদানসমূহ সংযোজনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বেলা এগারোটায় আমরা 'মাহাদে শারয়ী' দেখতে যাই এবং এর নাযিম শায়খ মুহাম্মদ ইবরাহীম শাকরার সাথে সাক্ষাৎ করি। শায়খ মুহাম্মদ ইসলামী

বিশ্বের অন্যতম স্বনাম খ্যাত আলিম ও চিন্তাবিদ। তিনি যেমন ইসলামী আকয়িদে অনমনীয় দৃঢ়তার অধিকারী, তেমনি উদার চিন্তারও মালিক। একজন সুবক্তা হিসাবেও তাঁর সুখ্যাতি আছে। তিনি দীর্ঘদিন মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। এই সুযোগে মাহাদে শারয়ী' সংলগ্ন 'মাদ্‌রাসাতুল্ কুরআন' ও আমরা দেখে আসি।

শাহ হুসায়নের সাথে সাক্ষাৎ

এরপর ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মহিলা শাখা দেখার কর্মসূচী আমাদের ছিল। জুহরের সময় হয়ে যাওয়ায় আমরা 'মাহাদে শারয়ী' সংলগ্ন মাসজিদে নামায আদায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এমন সময় তাৎক্ষণিকভাবে শাহ্ হুসায়ন আমাদেরকে সাক্ষাতের জন্য শাহী প্রাসাদে তলব করেন। আমরা জুহরের নামায আদায় করে আওকাফ মন্ত্রীর দফতরে যাই এবং সেখান থেকে সাইয়িদ কামিল আশ্-শারীফ-এর সংগে যিনি প্রাসাদ পর্যন্ত প্রতিনিধিদলের রফীক (সাথী) ও পথ প্রদর্শক ছিলেন শাহী প্রাসাদ অভিমুখে রওয়ানা হই।

প্রাসাদে প্রবেশ করতেই সাউদী আরবস্থ জর্দানের রাষ্ট্রদূত শায়খ মুহাম্মদ আমীন আশ্‌শানক্বিতী এর সাথে দেখা হয়। তিনি অতি সম্প্রতি শাহের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রাজধানীতে এসেছেন। তাঁরই উপস্থিতিতে আমি বর্তমান শাহের পিতামহ বাদশাহ আবদুল্লাহ বিন হুসায়ন মরহুমের সাথে প্রথমবার আজ থেকে ২২ বছর পূর্বে ৬ই শাওয়াল ১৩৭০ হিঃ, মুতাবিক ১০ই অক্টোবর ১৯৫১ইং, সোমবার এবং দ্বিতীয়বার ৯ই শাওয়াল ১৩৭০হিঃ, মুতাবিক ১৩ই অক্টোবর, ১৯৫১ইং বৃহস্পতিবার বাগদাদ প্রাসাদে সাক্ষাত করি। ঐ সাক্ষাতের দৃশ্যটি আজ পুনরায় মনের মধ্যে জীবন্ত হয়ে উঠলো, যখন আমরা তাঁরই স্বনামখ্যাত পৌত্রের সাথে একই প্রাসাদে সাক্ষাত করছিলাম। কিন্তু আজ ও গতকালের পার্থক্য কত গভীর, কত ব্যাপক ! গাণিতিক হিসাবে ২২ বছর নিঃসন্দেহে একটি সংক্ষিপ্ত সময়-ব্যক্তি, জাতি, বংশ ও রাষ্ট্রের জীবন ও ইতিহাসে এর খুব একটা গুরুত্ব নেই। তবে যুগের আবর্তন-বিবর্তন বিশেষ করে এই দেশের রাজনৈতিক ও ভৌগলিক পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য করলে এটি নিঃসন্দেহে একটি লক্ষ্যণীয় সময়কাল।

বাদ্‌শাহ হুসায়ন তার মাননীয় পিতামহের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে এমন একটি রাজ্য লাভ করেছেন, যা এমন সব চ্যালেঞ্জ, এমন সব সমস্যা

এবং এমন সব বৈপরিত্যের মুকাবিলা করছে–যা সম্ভবতঃ এই যুগের কোন রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্যকেই করতে হচ্ছে না। তিনি নেতৃত্বে ও দেশ–পরিচালনার ক্ষেত্রে এমন একটি নাজুক মুহূর্তের মুখোমুখি হয়ে আছেন, যার মুকাবিলা করা শুধুমাত্র একজন অসামান্য বুদ্ধিমত্তা ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতার পক্ষেই সম্ভব। আমি যখন অভ্যর্থনা কক্ষ থেকে প্রতীক্ষাকক্ষে এবং সেখান থেকে শাহের কক্ষে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তখন মনে হচ্ছিলো, যেন আমি কোন নাটক কিংবা স্বপ্ন দেখছি। মানুষের অসহায়তা, জীবনের অস্তিত্বহীনতা এবং যামানার অনবরতঃ রং পরিবর্তনের উপর আমার বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়–তর হচ্ছিলো। ইতিপূর্বে আমি যখন জর্দানে এসেছিলাম তখন আমার প্রিয় বন্ধু ও মেযবান (নিমন্ত্রণকারী) এবং আম্মানের ব্যবসায়ী শায়খ কাসিম আমআরীর ঘরে বসে খাবার খাচ্ছিলাম, এমন সময় আকস্মিকভাবে শাহ্ আবদুল্লাহ্‌র একটি জরুরী পয়গাম এসে পৌছে। আমাকে বলা হয়, 'সাইয়িদুনা'[১] আপনাকে ডাকছেন। আমি সংগে সংগে শাহের আহ্বানে সাড়া দিই। দ্বিতীয়বার জামি' মাস্‌জিদে, যেখানে খোদ শাহ ও নামায আদায় করছিলেন, হঠাৎ আমার কাছে তাঁর আহবান পৌছলো এবং আমাকে বলা হলো, 'সাইয়িদুনা আপনাকে ডাকছেন।' আর আজ তাঁরই স্বনামখ্যাত পৌত্রের পয়গাম আমার কাছে আকস্মিকভাবে এসে পৌছলো এবং আমাকে বলা হলো, 'সাইয়িদুনা আপনার অপেক্ষায় রয়েছেন।' আজ এবং গতকালের মধ্যে কতনা সামঞ্জস্য ! তখন অতীত ও বর্তমানের মধ্যে কত বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হয়ে গেছে।

আমরা যখন শাহের দফতরে প্রবেশ করলাম তখন খোদ শাহ্ আমাদের অভ্যর্থনায় এগিয়ে এলেন। দরজা খোলা হলো। তিনি অত্যন্ত বিনম্রবদনে এগিয়ে এলেন এবং ক্ষমাপ্রার্থী হলেন এজন্য যে, তিনি যে পোশাকে ছিলেন সে পোশাকেই আমাদের সাথে মিলিত হচ্ছেন। এরপর কোনরূপ শাহী আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই তিনি স্বাধীনভাবে এবং আন্তরিকতার সাথে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলেন। আমাদের আলাপ–আলোচনা সেই নাজুক, ঘোরালো এবং ক্লান্তিকর পরিস্থিতি পর্যন্তও গিয়ে পৌছে, যেখানে প্রতিভা, দূরদর্শিতা, সততা ও লৌহদৃঢ় ঈমানের পরীক্ষা হয়ে থাকে এবং যার উৎকৃষ্টতম ছবি আঁকা হয়েছে পবিত্র কুরআনে নিম্নের আয়াতটিতে ঃ

حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوْا اَنْ لاَّ مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلاَّ اِلَيْهِ

অর্থ ঃ "যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিসহ হয়ে উঠল এবং তারা উপলব্ধি করল যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আশ্রয়স্থল নেই।" −(৯ ঃ ১১৮)

আমি নিজের চোখে দেখেছি এবং কার্যতঃ পরীক্ষাও করেছি, মুসলমান ও আরব–বিশেষ করে ঐ সমস্ত লোক যারা সিংহের চোয়ালের মধ্যে অথবা চাক্কির দুপাটের মধ্যে অবস্থান করছে, তরবারির সুতীক্ষ্ণ ডগার উপর যারা জীবন অতিবাহিত করছে–আল্লাহ্ ছাড়া তাদের কোন আশ্রয় স্থল, কোন সাহায্যকারী ও সহায়ক নেই। যদি আজ তাদের নিষ্কৃতির কোন পথ থেকে থাকে তাহলে সেটা হলো, অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করা, আন্তরিকভাবে মুসলমান হওয়া এবং দৃঢ়ভাবে আস্থা ও বিশ্বাস রাখা যে, একমাত্র ইসলামই মানুষকে সত্যিকার জীবন দান করতে পারে এবং প্রকৃত মনুষ্যত্বের দিকে পথ প্রদর্শন করতে পারে–আর জীবনকে ঐ সমস্ত কদর্যতা থেকে পাক–পবিত্র রাখা যা ইসলামের শ্রীবৃদ্ধি ও সৌন্দর্যবর্ধনের পথে প্রতিবন্ধক এবং যা মুসলিম জাতির অধঃপতনের কারণ এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিটি ক্ষেত্রে হুবহু সেভাবেই কার্যকরী করা যেভাবে কুরআন নির্দেশ দিয়েছে, যেভাবে আল্লাহ্র রাসূল পথপ্রদর্শন করেছেন আর এই আয়াতটির মর্মার্থও মনে প্রাণে উপলব্ধি করা।

وَ لَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَ لاَ النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

অর্থ ঃ "ইয়াহূদী ও খ্রীস্টানগণ তোমাদের প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর।" −(২ ঃ ১২০)

আমি শাহ্ হুসায়নকে তাঁর ঐ বিরাট দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিই, যা ফিলিস্তিনী শরণার্থী, তাঁর এবং তাঁর ভবিষ্যৎ বংশধরদের আকীদা–বিশ্বাসের ব্যাপারে তাঁর উপর অর্পিত হয়ে থাকে। এটা কোন মতেই ঠিক নয় যে, ফিলিস্তিনীদেরকে খ্রীস্টান প্রচারক এবং রিফিউজী রিলিফ কমিটিসমূহের দয়ামায়ার উপর ছেড়ে দেওয়া হবে, যারা এদের দুরবস্থা ও অসহায়তা থেকে নিজেদের মতলব উদ্ধারের চেষ্টায় রয়েছে। আমি বলি, "এটা আমাদের

সর্ববৃহৎ দায়িত্ব এবং আখিরাতেরও। আমরা সবাই একদিন আল্লাহ্‌র সমীপে দণ্ডায়মান হব, তখন আমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এই সব বিপন্ন ও কৃপাপ্রার্থী লোকদের সম্পর্কেও, যাদেরকে শুধু এ কারণে তাদের জন্মভূমি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা বলেছিল, 'আমাদের প্রভু একমাত্র আল্লাহ্।' এই সাথে আমি শাহের সাহসিকতাপূর্ণ কিছু পদক্ষেপের প্রশংসা করি এবং কোন কোন মুহূর্তে তিনি যে অতুলনীয় বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাও অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করি।

আমি শাহ্‌কে বলি, একজন মহান ব্যক্তি বলেছিলেন, 'আমার কাছে যদি শুধুমাত্র একটি মাত্র দু'আ থাকত যা আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চিতভাবে কবুল করতেন তাহলে আমি শহরের শাসকের জন্যই সে দু'আটি করতাম। কেননা যদি সে সৎ হয় তাহলে গোটা শহর সৎ হয়ে যাবে এবং যদি সে অসৎ হয় তাহলে গোটা শহরই বরবাদ হয়ে যাবে।' যদিও আমি শাহ্‌কে একথা বলার যোগ্য নই, তবু আমি তাঁকে একথা বলার সৎসাহস করেছি।

শাহ্ অত্যন্ত নীরবে ও বিনম্রবদনে আমার কথা শুনতে থাকেন। কথোপকথনকালে আমাদের রফীক শ্রদ্ধেয় উস্তাদ আহমদ মুহাম্মদ জামান এবং সাইয়িদ কামিল আশ্-শরীফও উপস্থিত ছিলেন। উস্তাদ আহমদ মুহাম্মদ জামান বলেন, 'আমি অনেকবারই বলেছি যে, আমাদের যাবতীয় আশা ভরসা এখন শাহ্ ফায়সাল এবং শাহ্ হুসায়নের সাথেই সম্পৃক্ত।'

বৈঠক শেষ হলে শাহ্ আমাদেরকে বিদায় জানানোর জন্য কিছু দূর এগিয়ে আসেন। তারপর আমরা তাঁকে সালাম জানিয়ে হোটেলে আমাদের অবস্থানস্থলে ফিরে আসি।

শহরের ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন

১৫ই আগস্ট ১৯৭৩ইং বুধবার সকাল ৯টায় আমরা ঐ বিরাট ইসলামী দাতব্য চিকিৎসালয়টি দেখতে যাই, যা ইসলামী ফালাহী আন্–জুমানের পক্ষ থেকে আম্মানে নির্মিত হচ্ছে। এটা একটা বিরাট প্রকল্প। যদি এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় তাহলে এই হাসপাতাল আরব ইসলামী এলাকার সর্ববৃহৎ হাসপাতাল হবে এবং এটা পূরণ করবে এই শহরের চিকিৎসাগত বিরাট চাহিদা, যেখানে প্রায় সর্বত্রই খ্রীস্টান মিশনারী এবং পাশ্চাত্য সংস্থাসমূহ হাসপাতাল স্থাপন এবং জনসাধারণকে চিকিৎসাগত সুযোগ–সুবিধা প্রদানে

সদা তৎপর রয়েছে। এখানে রয়েছে খ্রীস্টান মিশনারীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, যেখানে একটি নাজুক ও সহানুভূতিশীল প্রান্ত থেকে জনসাধারণের অন্তর জয় করার এবং তাদের বিশ্বাসকে অন্য ধারায় প্রবাহিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। রোগীর প্রতি স্নেহমমতা ও সহানুভূতি প্রদর্শন, তাদের যন্ত্রণা কিছুটা লাঘব করা–নিদেন পক্ষে তাদের সাথে দুয়েকটি মিষ্টি কথা বলা, যা তাদের অন্তর স্পর্শ করে, নিঃসন্দেহে তাদেরকে আপন করে নেওয়ার একটি সহজতর পন্থা।

এই হাসপাতালটি, নির্মাণ ও সুসজ্জিতকরণের শেষ পর্যায় অতিক্রম করেছে। উস্তাদ মুহম্মদ আবদুর রহমান খলীফা এবং তাঁর সহকারী উস্তাদ মশহুর হাসান হামূদ, যিনি হাসপাতালের প্লানিং এবং আনজুমানের মহাপরিচালক–আমাদেরকে হাসপাতালের বিভিন্ন অংশ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখান। কিভাবে এই প্লান কার্যকরী হল এবং কিভাবে এক্ষেত্রে অভিজ্ঞ স্থাপত্যশিল্পী এবং বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসকদের সাহায্য সহযোগিতা পাওয়া গেল তিনি আমাদেরকে তার বিস্তারিত বিবরণ দেন। হাসপাতালটি সত্যি সত্যি অত্যাধুনিক পন্থায় নির্মিত হচ্ছে। এতে সর্বাধুনিক সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি আমদানী করা হচ্ছে।হাসপাতালের সাথেই নির্মিত হবে একটি বিরাট মসজিদ, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, বক্তৃতা–হল, ইসলামী লাইব্রেরী, নার্স কোয়ার্টার এবং নার্স ও ওয়ার্ডবয়দের প্রশিক্ষণ স্কুল।

এরপর আমরা জর্দান বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ দেখতে যাই।মসজিদটির নির্মাণ কাজ সমাপ্তি পর্যায়ে রয়েছে।তবে মনে হচ্ছিলো, মসজিদটি সেই পরিবেশের খুবই উপযোগী হয়েছে যেখানে অবস্থান করছে এমন হাজার হাজার যুবক যারা মসজিদ থেকে সত্যিকার অর্থে প্রভাবিত হওয়ার যোগ্যতা ও মন মানসিকতা রাখে।

আমরা আম্মানের আওকাফ অফিসেও যাই এবং সেখানকার দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সাথে কিছুক্ষণ কাটাই। এরপর আমরা মাকতাবাতুল মাসজিদিল আক্সা দেখতে যাই। এই সফরে আমরা যে সমস্ত বিরাট লাইব্রেরী দেখেছি এটা সেগুলোর অন্যতম। লাইব্রেরীটি ইসলামী বই পুস্তকে একেবারে ঠাসা। আমার বেশীর ভাগ বইপুস্তক, যা বৈরুত ও কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়েছে তার সব কয়টির কপি এখানে রয়েছে।

আমরা মাসজিদে আহমদ কাররাও দেখি, যা রাজধানীর কেন্দ্রীয় মাসজিদ-সমূহের অন্যতম। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় এই একটি মাসজিদ থেকেই আযান প্রচার করা হয়। এটা একটা নতুন চিন্তাধারা যা অন্য কোথাও দৃষ্টিগোচর হয়নি। এ পদক্ষেপটি নিঃসন্দেহে সমালোচনাযোগ্য। কেননা ঘটনাচক্রে এই মাসজিদের মাইক যদি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, কিংবা মুআয্যিন ঘুমিয়ে থাকে তাহলে সমগ্র শহরের লোক আযান থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে। উপরন্তু আযানের যে ফযীলত রয়েছে এবং আযানদাতার জন্য আল্লাহ্র কাছে যে পুরস্কার রয়েছে উপরোক্ত ব্যবস্থার ফলে তা থেকেও শহরের বাকি মাসজিদ-গুলো আপনা আপনি বঞ্চিত হয়ে পড়ে। আমরা মাসজিদের বিভিন্ন অংশ ঘুরে ঘুরে দেখলাম। এতে যে লাইব্রেরী রয়েছে তার ইমারত যেমন সুন্দর ও মজবুত তেমনি তাতে বই-পুস্তক রাখার উদ্যোগ আয়োজন এবং বিন্যাসপদ্ধতিও সুন্দর ও আকর্ষণীয়। আমরা লাইব্রেরীটি দেখে অত্যন্ত খুশী হই।

ইয়াতীমখানা প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত জমিও আমরা দেখি। এর সন্নিকটে রয়েছে গ্রাম ও পল্লী অঞ্চল থেকে আগত হাজীদের অভ্যর্থনাকেন্দ্র ও অবস্থানস্থল।

এক নজরে ফিলিস্তিনীদের অবস্থা

আমরা ফিলিস্তিনী ক্যাম্পের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখতে পেলাম, ফিলিস্তিনী শিশুরা যাদের পিতা-পিতামহরা একদা ইসলামী বিজয় অভিযানে এবং ইসলামী দাওয়াত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন- দারিদ্র ও দুরবস্থার চরম শিকারে পরিণত হয়েছে। তাদের অবস্থা দেখলে কলিজা ফেটে যায়, চোখ আপনা আপনি অশ্রুতে ভরে উঠে। আমরা জার্মান মিশনারী 'শালনার'-এর কেন্দ্রও দেখলাম, যাতে অনেকগুলো দফতর, প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র, খাদ্য সরবরাহ এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের শাখা-প্রশাখা রয়েছে। আমি তখন বললাম, 'এখন চিতা ও ভেড়ার মধ্যে কোন দেওয়াল নেই, উভয়কেই তাদের ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এবার ভেবে দেখুন, ভুখা, শীর্ণকায় ও অসহায় এই ভেড়াগুলো ঐ হৃষ্টপুষ্ট ও রক্ত পিপাসু চিতাগুলোর মধ্যে কি করে জীবিত থাকবে যখন উভয়ই নিজ নিজ প্রকৃতির উপর অবস্থান করছে?

ইসলামী কেন্দ্রের অভ্যর্থনা সভা

সন্ধ্যায় আমরা ইসলামী কেন্দ্রের ফালাহী আনজুমান (কল্যাণ সংস্থা) দেখতে যাই, যা আসলে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের কর্মসূচী বাস্তবায়নের একটি ক্ষেত্র। এর পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন আমার পুরাতন বন্ধু জর্দানের মুজাহিদ নেতা উস্তাদ মুহাম্মদ আবদুর রহমান খলীফা। এই শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে ইসলামী দাওয়াতের যে সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে আমার পরিচয় লাভ ঘটেছে তাদের মধ্যে উস্তাদ খলীফা অন্যতম। তাঁর সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৯৫৬ ইং সালে দামেশ্‌কে, যখন তিনি মুতামারে ইসলামীতে অংশগ্রহণের জন্য সেখানে এসেছিলেন।'

এরপর তিনি ভারতে আসেন। আমার ছোট পল্লী যা 'শাহ আলমুল্লাহ্ রায়বেরেলী' নামে পরিচিত তার পদধূলিতে ধন্য হয়। তিনি তখন আমাকে মুতামারে ইসলামীতে অংশ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলেন, যা এর কিছুদিন পরই অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। এবার তিনি আমাদের সম্মানে একটি অভ্যর্থনা সভার আয়োজন করেন। তাতে পরস্পর পরিচিতির ব্যবস্থা রাখা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আওকাফ মন্ত্রী ডঃ ইসহাক ফারহান, সাইয়িদ কামিল আশ্-শরীফ, শহারের উলামা, শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবৃন্দ এবং ইসলামী দাওয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সর্বপ্রথম উস্তাদ মুহাম্মদ আবদুর রহমান খলীফা একটি প্রেরণামূলক বক্তৃতা দেন, যাতে তিনি প্রতিনিধিদলকে খোশ্ আমদেদ জানান এবং উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দেন। প্রতিনিধিদলের একজন সদস্যের সাথে যে তার পুরাতন সম্বন্ধ রয়েছে তিনি একথাও উল্লেখ করেন এবং এই শহরের অবস্থান, এর সাথে ইসলামী বিশ্ব ও আরব বিশ্বের সম্বন্ধ এবং সে সম্বন্ধের মর্যাদা ও নাজুকতা সম্বন্ধেও বিস্তারিত আলোচনা করেন।

একটি সংগ্রামরত সীমান্তবর্তী দেশের দায়িত্ব

উস্তাদ খলীফার পর আমাকেও কিছু বলতে হয়। আমার বক্তব্যের সারকথা ছিল নিম্নরূপঃ

"সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র এবং সালাম তার নির্বাচিত বান্দাদের উপর। উস্তাদ মুহাম্মদ আবদুর রহমান খলীফা যেভাবে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন সেজন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই। আর এটা আমাদের জন্য কোন

অভাবিত ব্যাপার নয়। এক ভাই অন্য ভাইয়ের এবং এক বন্ধু অন্য বন্ধুর, যারা একই মত ও পথের অনুসারী–ব্যাথা–বেদনায়, সুখে–দুঃখে ও আপদে–বিপদে অংশীদার হবে। এটা কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। আমরা আমাদের এই সহৃদয় বন্ধুর প্রতি বিশেষভাবে ঋণী এজন্য যে, তিনি শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দের সাথে আমাদেরকে এভাবে পরিচিয় করে দিয়েছেন। ফলে আমরা সবার সাথে মত বিনিময়ের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছি। আমি মনে করি, আমাদের এই সফরের, এটাই সব চাইতে বড় প্রাপ্তি। কেননা আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দেখার জন্য এ সফরে আসিনি, বরং আমাদের এ সফরের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, আমাদের ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করা, তাদের সাথে কথাবার্তা বলা ও মত বিনিময় করা।

বন্ধুগণ,

এ দেশে বসবাসকারী আরব ভাইদের কাছে আমাদের এই আশা ছিল যে, তারা ইসলামের আলো দূরদূরান্তের দেশসমূহে পৌছিয়ে দেবেন–আর প্রথম যুগে তারা এটা করেছেনও। এজন্য আমরা, ভারত উপমহাদেশের অধিবাসীরা তাদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। কেননা তাদেরই মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ইসলামরূপী নিয়ামাত দ্বারা উপকৃত করেছেন। আপনাদের দেশ সব সময়ই দাওয়াতে ইসলামের কেন্দ্র ও উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এই দেশের ইতিহাস বিজয়ের ইতিহাস, যুদ্ধ ও সংগ্রামের ইতিহাস, বীরত্ব ও বাহাদুরীর ইতিহাস। এই ইতিহাস যুগে যুগে আমাদের ঈমান বিশ্বাসকে মজবুত করেছে, আমাদেরকে ইসলামের উপর গর্ব করার সুযোগ করে দিয়েছে, বিভিন্ন সময়ে আমাদের উপর যে আক্রমণ এসেছে, ইসলাম বিরোধী যে সব আন্দোলন গড়ে উঠেছে তার সার্থক মুকাবিলা করার শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে এবং এ পথে সুদৃঢ় থাকার এবং ধৈর্যের সাথে বিপদ–আপদের মুকাবিলা করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে। সর্বপ্রকার বিপদ–আপদে এই ইতিহাসই হচ্ছে আমাদের জন্য সব চাইতে বড় সান্ত্বনা। শুধুমাত্র 'ফুতুহুশ শাম' শীর্ষক ইতিহাস গ্রন্থের কথাই ধরুন। এটি এমন একটি ইতিহাস, যা মুসলমানদের ঈমান, দুঃসাহস এবং প্রতিকূল পরিবেশে সুদৃঢ় থাকার শক্তি যোগাত। আমার ছেলেবেলাকার সেই ঘটনাটি এখনো পরিষ্কার মনে আছে যখন আমাদের পরিবারের মেয়েরা একত্রিত হতেন এবং তাদেরই

একজন 'ফুতুহুশ্ শাম' -এর উর্দু কাব্যানুবাদ সবাইকে পড়ে শুনাতেন। এটি ছিল সেই সমরগীতি যা 'ফুতুহুশ্ শাম থেকে নকল করে আমাদেরই বংশের এক বুযুর্গ (সাইয়িদ আবদুর রায্যাক কালামী) তাতে উর্দু ছন্দের পোশাক পরিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে ছন্দের সংখ্যা ছিল ২৫ হাজার।[২] আমরা কোন না কোন প্রয়োজনে যখন এই সব মজলিসে প্রবেশ করতাম-আর ছোটদের কি পরিমাণ প্রয়োজন হয় এবং কিভাবে হয় তা তো আপনাদের জানাই আছে- তখন দেখতাম আমাদের মা-বোনদের চোখ দিয়ে অশ্রুর বন্যা বয়ে যাচ্ছে ; আর তাদের মাথার উপর যেন ঈমান ও সান্ত্বনার মেঘ ছায়া বিস্তার করে আছে। তারা ঐ সমস্ত ঘটনার কথা শুনতেন যেগুলোতে সাহাবা ও তাবেঈন অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তাতে তাদের বিপুল সংখ্যক শহীদ অথবা আহত হয়েছিলেন। ঐ সমস্ত ঘটনার কথা শুনার পর মুসলমানদের কোন নিকটজন তাদের থেকে দূর-দূরান্তে চলে গেলে কিংবা তাদের উপর কোন বিপদ-আপদ এসে পড়লে ঐ ইসলামী ঘটনার কথা স্মরণ করে তারা তাদের যাবতীয় দুঃখ কষ্টের কথা ভুলে থাকত, উপরন্তু তাদের অন্তর ভরে উঠত ইসলামী প্রেরণায় এবং তারা লাভ করত বিপদ বাধা অতিক্রম করার এক দুর্বার শক্তি।

শুধু মহিলাদের মধ্যে নয় বরং পুরুষদের মধ্যেও এই সমরগীতি চর্চা ছিল। একজন সুর করে তা পড়তেন এবং অন্যরা অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে তা শুনতেন। আর এই চর্চার ফলে তাদের বীরত্ব, ঈমান ও শাহাদাতের প্রেরণায় যেন বান ডাকত। শুধু আমাদের পরিবারের নয়, বরং বেশীর ভাগ সম্ভ্রান্ত মুসলিম বংশ ও পরিবারে এই 'সমরগীতি' পঠন ও শ্রবণের প্রচলন ছিল।

আমরা আমাদের এসব অভিজ্ঞতার আলোকে এবং আপনাদের গৌরবদীপ্ত ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এই আশাই করছিলাম যে, এই দেশ, যেখান থেকে মুহাম্মদ (সা.)-এর মুবাল্লিগগণ দলে দলে বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিলেন- সেখান থেকে আমাদের আরব ভাইরা পুনরায় আর্বিভূত হবেন এবং এই মহান পয়গাম পৌঁছিয়ে দেবেন বিশ্বের সমস্ত প্রান্তে, যেখানে এখনো তা পৌঁছে নি এবং সেই সাথে বৃদ্ধি করবেন ইসলামী বিজয়ের সীমারেখাও। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, আজ আমরা আপনাদের কাছে আবেদন করছি শুধু একটুকু যে, আপনারা এই ভূখণ্ড টিকে রক্ষা করুন, যা ইসলামের পুঁজি। সারা মুসলিম বিশ্বই এই ইসলামী কেন্দ্রেরই শাখা এবং প্রতিচ্ছায়া। আপনারা হচ্ছেন গ্রন্থের

আসল বাক্য এবং আমরা হচ্ছি তার টীকা। আমরা আপনাদের কাছ থেকেই ক্ষমতা, আস্থা, গর্ব এবং সম্মানের প্রেরণা লাভ করি। এখানে কোন দুর্বলতা দেখা দিলে তা সংগে সংগে মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য শহর এবং রাজধানীতেও সংক্রমিত হয়ে পড়ে। আপনারা কোন ক্ষেত্রে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হলে সংগে সংগে দিল্লী, করাচী, জাকার্তা এবং অন্যান্য শহরের মুসলমানদের মাথাও হেট হয়ে যায়।

বন্ধুগণ, আপনারা সকলেই জানেন, ইসলামী বিজয়ের পূর্বে এই এলাকা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। 'ঈসাইয়ত' (খ্রীস্টধর্ম) ছিল এই এলাকার সরকারী ও সাধারণ ধর্ম এটা ছিল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের উর্বরতম এলাকা। এখানেই ছিল তাদের পবিত্রস্থানসমূহ হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম-স্থান এবং জেরুজালেম। মানুষের উপর আল্লাহ্র রহমতের বান ডাকলো, তিনি ইচ্ছা করলেন এখানেই ইসলামের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের এবং এই এলাকাটি মুসলমানদের অভিভাবকদের অন্তর্ভুক্ত করার। সুতরাং আরবরা এটাকে জয় করলো, এখানে ইসলামের বিস্তার ঘটালো এবং তাদের ভাষা ও সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করলো। ফলে এ অঞ্চল একটি ইসলামী আরবী দেশের রূপনিল।

আমার মতে, এ এলাকার প্রতি খ্রীস্টান ইউরোপের আগ্রহ প্রদর্শন কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। ইউরোপের বড় বড় শক্তিগুলো এই এলাকার প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাবে, তাও ইতিহাসের নতুন কোন ঘটনা নয়। বরং বরাবরই দেখা গেছে যে, সমগ্র খ্রীস্টানজগত এই এলাকার দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়েছে, এক মুহূর্তও তারা এই ভূখণ্ডের কথা ভুলতে পারে নি। তারা এই এলাকাকে পদানত করার জন্য বার বার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। সালাবী (ক্রুসেড) যুদ্ধগুলো তাদের ঐ প্রচেষ্টারই কয়েকটি ধাপ মাত্র। তারা তাদের লক্ষ্য হাসিলের জন্য ইউরোপের যাবতীয় সহায়-সম্পদ কাজে লাগিয়েছে, কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি, তাদের যাবতীয় প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তার যে বান্দাদেরকে এই দেশ শাসন ও সংরক্ষণের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন তারা ছিলেন বিশ্বাসী, শক্তিশালী, বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য এবং সর্বপ্রকার বাড়াবাড়ি, স্বার্থপরতা ও কপটতা থেকে মুক্ত। উদাহরণস্বরূপ আমি সালাহ্উদ্দীন আইয়ূবীর উল্লেখ করছি। তিনি সালীবীদের (ক্রুসেডারদেরকে) পরাজিত ও বিপর্যস্ত করে মুসলমানদেরকে

তাদের হৃত মর্যাদা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এ দেশের মুসলমান শাসক ও নেতৃবৃন্দ-নিজেদের দুর্বলতা ও পরস্পর মত দ্বৈততা সত্ত্বেও-এই দেশের পবিত্রতা ও মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে ছিলেন সদাজাগ্রত। আর আমি তো বলি যে,তুরস্কের উসমানী সাম্রাজ্যের শাসকরাও এই ইসলামী স্থানসমূহের ব্যাপারে ছিলেন অনুভূতিপ্রবণ। তারা পুরো পাঁচটি শতাব্দী এই দেশের হিফাজত করেছেন। তাদের সাথে আমার কোন সম্বন্ধ নেই, না বংশের ক্ষেত্রে, আর ভৌগলিক জাতীয়তা, কিংবা সভ্যতা ও ভাষার ক্ষেত্রে-বরং শুধুমাত্র-প্রকাশের খাতিরে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, তাদের সতর্কতার সামনে শত্রুদের যাবতীয় প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে যেত। ইতিহাস একথার সাক্ষী যে ইয়াহুদী কনফারেন্সের সভাপতি ডঃ হের টায়ল্- যাকে বহু লোক ইয়াহুদীয়তের পয়গম্বর বলে আখ্যায়িত করে-সুলতান আবদুল হামীদ খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং আবেদন করেন, যেন তিনি উসমানী সাম্রাজ্যের ছত্রছায়ায় ইয়াহুদীদেরকে একটি জাতীয় মাতৃভূমি প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেন। এর বিনিময়ে তিনি উসমানী সাম্রাজ্যের যাবতীয় ঋণ (তখন ঋণের পরিমাণ ছিল অনেক) পরিশোধ এবং সেই সাথে এমন একটি নৌ-বাহিনী গড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন, যে বাহিনীর যাবতীয় খরচ ইয়াহুদীরাই বহন করবে। এছাড়াও তিনি উসমানী সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করার জন্য প্রচুর আর্থিক সাহায্য এবং সুলতানকে ব্যক্তিগতভাবে বহু উপহার উপঢৌকন প্রদানেরও আশ্বাস দেন। এতদ্‌সত্ত্বেও সুলতান আবদুল হামীদ খান (র.) ইয়াহুদী নেতাকে যে জবাব দিয়েছিলেন তা হলো, 'এই সব ধন-দৌলত তোমাদের কাছেই থাক; সময় মত কাজে আসবে। আমার কাছে বিশ্বের সমগ্র ইয়াহুদীদের যাবতীয় ধন-দৌলত বায়তুল মুকাদ্দাসের এক মুষ্টি মাটির সমতুল্যও নয়। একথার ফলশ্রুতি এই হয়েছিল যে, ইয়াহুদীরা চক্রান্ত করে সুলতান আবদুল হামিদ খানকে সিংহাসনচ্যুত করে এবং জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় তার উপর অমানুসিক নির্যাতন চালায়।[৩] উসমানী সাম্রাজ্য নিজের অসংখ্য দুর্বলতা সত্ত্বেও ইসলামী শক্তির এমন একটি বিরাট ও সুদৃঢ় দুর্গ ছিল, যা দেখে অমুসলিমরাও ভয় পেত। সেটা ছিল ঐ কাঠের মত, যা কৃষক আপন ক্ষেতের মধ্যে গেড়ে তার উপর একটি কাপড় পরিয়ে দেয়। ফলে পাখীরা মনে করে, এটা একটা মানুষ বা ভয়ংকর অন্য কিছু। তাই ঐ ক্ষেতের ধারে কাছে ঘেসে না। কিন্তু যখন ঐ কাঠটি ভেংগে পড়ে কিংবা কোন চতুর কাক বুঝে নেয় যে, এটা কাঠ ছাড়া

কিছু নয়, কিংবা এটাকে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয় তখন পাখীরা ঝাঁকে এই ক্ষেতের দিকে ছুটে আসে এবং মুহূর্তের মধ্যে যাবতীয় ফসল সাবাড় করে দেয়। এই দেশের কাহিনীও তাই–যার উপর উসমানী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। শত্রুরা এই সাম্রাজ্যকে ভয় করত। তারা এর ধারে কাছেও ঘেঁষত না। কিন্তু যখন দুর্গ ধ্বংস হয়ে গেল এবং ভীতিকর কাঠটি মাটিতে লুটে পড়ল তখন শত্রুরা দলে দলে ছুটে এল এবং গোটা দেশটিকে ছিন্নভিন্ন করে দিল।

উসমানী সাম্রাজ্যের পতন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে যে সব নেতা এ দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসেন তারা বস্তুতান্ত্রিকতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতা দ্বারা যারপরনাই প্রভাবান্বিত ছিলেন পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ধ্বংসাত্মক প্রভাব তাদেরকে এমন অন্তঃসারশূন্য করে দিয়েছিল, যেমন কাঠকে ঘুন অন্তঃসারশূন্য করে দেয়। ঐ সব নেতা ছিলেন অবিশ্বস্ত, প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারী, ধর্মীয় মর্যাদাবোধ ও স্বদেশপ্রেম, থেকে মুক্ত ও বঞ্চিত। ইউরোপবাসীরা যখন এই অবস্থা দেখল তখন লোভাতুর লালায় ভরে উঠল তাদের মুখ। তাদের বিশ্বাস হলো, এ অঞ্চলের নেতাদের অন্তর নিয়ে বেসাতির এবং এই অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তারের সময় সমুপস্থিত। আমাদের নেতৃবৃন্দ এমন বস্তুতান্ত্রিকতার এবং হীনমন্যতার পরিচয় দিলেন, ইতিহাসে যার দৃষ্টান্ত মেলা ভার। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব এবং জীবনের অনিশ্চয়তার ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি একদম বদলে গিয়েছিল অথচ কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وَمَا هٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلاَّ لَهْوٌ وَّلَعِبٌ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ٠

অর্থ ঃ "এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়াকৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন যদি ওরা জানত।"–(২৯:৬৪)

اِعْلَمُوْا اَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ٠

অর্থ ঃ "তোমরা জেনে রেখ, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়াকৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক শ্লাঘা ও ধনে-জনে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছু নয়, ওর উপমা বৃষ্টি, যা দ্বারা উৎপন্ন শস্যভাণ্ডার অবিশ্বাসীদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর অবশেষে তা খড়কুটায় পরিণত হয়। আর পরকালে রয়েছে-কঠিন শাস্তি।" - (৫৭ঃ২০)

এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও বলেছেনঃ

اللهم لا عيش الا عيش الاخرة۔

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্, আখিরাতের জীবন ব্যতীত কোন জীবন নেই।''

আল্লাহ্ ও রাসূলের কথার উপর থেকে তাদের বিশ্বাস উঠে গিয়েছিল এবং তারা পার্থিব সম্মান ও মর্যাদার প্রতি এরূপ ঝুঁকে পড়েছিল, যেন এগুলোই মানবজীবনের আসল লক্ষ্য। তারা শাসনক্ষমতা লাভ করার জন্য নিজেদের নীতি, আদর্শ, ইয্যত, সুনাম, চরিত্র ঐতিহ্য সব কিছুকেই অকাতরে বিলিয়ে দিচ্ছিলো। বন্ধুগণ, যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার পূর্বে মনের মধ্যেই বিপ্লব সংঘটিত হয়। আর যখন মানুষ হৃদয়মনের আভ্যন্তরীণ বিপ্লবে সাফল্য লাভ করে তখন বাহ্যিক বিপ্লব ও সংগ্রামেও তার সাফল্য অর্জন নিশ্চিত হয়ে পড়ে। মানসিক যুদ্ধ শুরু হয় আগে এবং তা সব সময়ই বাহ্যিক যুদ্ধের চাইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে!

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমরা আভ্যন্তরীণ যুদ্ধে হেরে গেছি- আমাদের অন্তর এখন বিক্রিত পণ্যে এবং আমাদের মনমানসিকতা এখন নিছক বেচাকেনার সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। আর একারণেই আমাদের উপর উপনিবেশবাদী শত্রুদের প্রভাব বিস্তারের সব পথই খোলা। যে যেদিকে পারছে আমাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে। আমরা তড়পাচ্ছি, কাতরাচ্ছি, আহাজারি করছি, কিন্তু শত্রুকে ঘাড়ের উপর থেকে হটাতে পারছি না।

আর এর কারণ এই যে, জাতির প্রতি অবিশ্বাস ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধ করার দুটি মাত্র পথ আছে। এর একটি হলো শক্তিশালী আকীদা - আর সত্যি কথা বলতে গেলে আকীদাই হল সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী বস্তু। দ্বিতীয়টি হলো, দেশপ্রেম। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, প্রাচ্যের কোন কোন জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে এই দুইটি গুণ যথাযথভাবে পাওয়া গেলেও আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে এগুলোর বড়ই অভাব। তাদের

অন্তরে না আছে সত্যিকার আকীদা, আর না আছে প্রকৃত দেশপ্রেম। এ কারণেই আমরা প্রায়ই শুনি যে, অমুক নেতা ও অমুক নায়ক আরব - ইসলামী মাতৃভূমির কিছু গুরুত্বপূর্ণ এলাকা শত্রুর কাছে বেচে দিয়েছেন, কিংবা অমুক নেতা দুশমনদের চর হিসাবে কাজ করছেন এমন কি, কখনো এমনও দেখা গেছে যে, শত্রুর উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে যেন শত্রুর চাইতে আমাদের নেতা বা নেতৃবৃন্দ অধিক উৎসাহী যেমন উর্দূতে একটি কথা আছে, 'মুদ্দায়ী (বাদী) সুস্ত (অলস), (কিন্তু) গাওয়াহ (সাক্ষী) চুস্ত্ (চতুর)।'

বন্ধুগণ, আপনারা ইসলামের নাজুকতর ফ্রন্ট এবং মুসলমানদের সর্বশেষ দুর্গে অবস্থান করছেন। বন্যা শহরের সীমান্ত প্রাচীর পর্যন্ত পৌছে গেছে। যদি তা প্রাচীর ডিংগাতে পারে তাহলে আর কোন বাঁধই সেটাকে রুখতে পারবে না। আপনারা সর্বশেষ প্রতিরোধ লাইনেই মোতায়েন রয়েছেন। যদি শত্রুরা এই লাইন অতিক্রম করতে পারে তাহলে সমগ্র ইসলামী বিশ্ব তারা পদানত করে ফেলবে। আজ মুসলিম জাতির দৃষ্টি আপনাদের উপর নিবদ্ধ। আপনারাই তাদের উন্নতি ও সম্মান প্রতিপত্তির উৎস, আপনারাই তাদের ইয্যত ও শক্তির পরিমাপকযন্ত্র। আমি বলছি না যে, আপনারা শুধু আপনাদের ও আপনাদের দেশের ইয্যত সম্মান রক্ষার্থে আল্লাহ্কে ভয় করুন, বরং আমি বলছি, আপনারা ভয় করুন, আল্লাহ্কে সমগ্র মুসলিম জাতির ইয্যত ও সুনাম রক্ষার্থে এবং ইসলামের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের উদ্দেশ্যে—আল্লাহ্কে ভয় করুন। ঐ সমস্ত মুসলিম জাতির প্রতি লক্ষ্য করে, যারা আপনারদেরকে প্রথম মুসলিম এবং ইসলামের সর্বপ্রথম পতাকাবাহীদের জীবন্ত নমুনা বলে মনে করে। আল্লাহকে ভয় করুন ঐ সমস্ত নিষ্পাপ আত্মাগুলোর দিকে চেয়ে যারা এখনো দুনিয়ায় পদার্পণ করেনি; ওরা আপনাদের কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে এবং আপনাদের প্রতি ও কৃতজ্ঞ থাকবে এজন্য যে, আপনারা তাদের জন্য রেখে গেছেন এমন একটি অতীত যা নিয়ে তারা গর্ববোধ করতে পারে। - অন্যথায় তারা আল্লাহ্র দরবারে ফরিয়াদ করবে এই মর্মে যে, আপনারা তাদের পবিত্রস্থানসমূহ হাতছাড়া করেছেন, তাদের অতীতকে কলংকময় করে গেছেন এবং অপমান ও লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রেখে যাননি।

এই সমাবেশ, কথা বলার এই সুযোগ, আমার অন্তরে দুঃখবেদনার ঝড় তুলেছে, আমার পুরাতন ক্ষতসমূহ যেন পুনরায় চাংগা হয়ে উঠেছে। আর

এটা এ কারণে যে, আমি ইসলাম ও মুসলমানদের সমস্যাকে একই সমস্যা বলে মনে করি এবং সমগ্র ইসলামী বিশ্বকে একই দেশ বলে মনে করি। মুসলমানদের প্রতিটি দুর্ঘটনা এবং মুসলিম বিশ্বের এক ইঞ্চি জমির উপরও শত্রুদের দখল আমার কাছে অসহ্যকর। ফিলিস্তিন সমস্যা সর্বত্রই আমার নজরে পড়ে। আমি, যেখানেই যাই সেখানেই চেতন মনে হোক অথবা অবচেতন মনে হোক মুতাম্মিম বিন নুভায়রার নিম্নোক্ত কবিতাটি আওড়াতে থাকি।

لقد لا منى عند القبور على البكا + رفيقى لتذرات الدموع السوافك

و قال اتبكى كل قبر أريته + لقبر ثوى بين اللوى و الدكادك

فقلت له ان اشجا يبعث اشجا + فدعنى فهذا كله قبر مالك

"কবরগুলোর পাশে অশ্রুবন্যা বইয়ে দেয়ার উপর আমার সফরসাথী আমাকে তিরস্কার করলো।

এবং সে বললো, তুমি শুধু এই কবরটির কারণে, যা লুই ও দাকাদিকের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে, যে কবরই দেখ অশ্রুপাত করতে থাকে।

তখন আমি বললাম, এক ব্যথা অন্য ব্যথাকে চাংগা করে দেয়। আমার কাছে এই সব কবরই (যেন) মালিকের কবর।'[৪]

আমার বক্তৃতার উপর উস্তাদ ইউসূফ আল–আজম দাঁড়ান এবং প্রতিনিধিদলকে অভ্যর্থনা জানিয়ে একটি সারগর্ভ ভাষণ দেন। মুসলমানরা – বিশেষ করে এই দেশের মুসলমানরা বর্তমানে যে অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে রয়েছে এবং যে বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে কালাতিপাত করছে, তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে তার উপর আলোকপাত করেন।

মুতাসারে ইসলামী কেন্দ্র

সন্ধ্যা ৭টায় আমরা মুতামারে ইসলামীর কেন্দ্রীয় অফিসে যাই। বর্তমানে উস্তাদ কামিল আশ-শরীফ মুতামারের প্রেসিডেন্ট। আমরা সেখানে মুতামারের সদস্যবর্গ ও সংশ্লিষ্টদের সাথে পরিচিত হই।

আওকাফ মন্ত্রীর পক্ষ থেকে নৈশ ভোজ

আওকাফ মন্ত্রী প্রতিনিধিদলের সম্মানে একটি নৈশভোজের আয়োজন

করেন। তাতে শহরের বিরাট সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দ, উলামা ও পণ্ডিতবর্গ অংশগ্রহণ করেন। ওদের মধ্যে আমার পুরাতন বন্ধু সুনাম খ্যাত বুযুর্গ ও আলিম শায়খ মুস্‌তাফা আহমদ যারকাও ছিলেন তিনি বর্তমানে আম্মানস্থ 'কুল্লিয়াতুশ্ শারীআহ্'-এর শিক্ষক । শিক্ষকতার সাথে তিনি ইসলামী নাগরিক আইনও প্রণয়ন করছেন। আশা করা যায়, এই আইন দেশে চালু করা হবে।

সাক্ষাৎকার

১৬ই আগষ্ট, ১৯৭৩ইং সন বৃহস্পতিবার আমরা বেশ কয়েকজন বিখ্যাত আলিম ও শিক্ষাবিদের সাক্ষাৎ লাভ করি। যেমন, রাবিতাতুল্ উলুমুল্ ইসলামিয়াহ্-এর প্রেসিডেন্ট তায়সীর যুব্ইয়ান, জর্দানস্থ সাউদী রাষ্ট্রদূত শায়খ মুহাম্মদ আমীন আশ্-শানকীতী এবং কুর্দী মুজাহিদ আমীন বারুসক। শায়খ আমীনের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৫১ সালে। তিনি সাবেক ইরানী প্রধানমন্ত্রী ডঃ মুসাদ্দিক-যিনি ইরানে আপন দুঃসাহসিক পদক্ষেপের কারণে বিশেষ করে খনিজ তেল জাতীয়করণের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে দৃষ্টি নিজের দিকে আকৃষ্ট করছিলেন-এর কাছে প্রেরিত তার বার্তায় যে কবিতাটি পাঠিয়েছিলেন তা আমার এখনও মনে আছে।

لقفت عصاك عصيهم فتصايحوا

لا سحر بعد اليوم انت مصدق

"তোমার লাঠি ওদের লাঠিগুলোকে গিলে ফেলেছে; ফলে ওরা চীৎকার করতে শুরু করেছে। (কিন্তু) এখন আর কোন যাদু চলবে না। নিঃসন্দেহে তুমি (কথা ও কাজে) মুসাদ্দিক (সত্যবাদী ও সত্য প্রতিষ্ঠাকারী)।'

প্রতিনিধিদল যতদিন আম্মানে ছিল, শায়খ আমীন বারুসক বরাবরই আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতেন এবং আমরা তার কবিতা, জিহাদের ঘটনাবলী - সর্বোপরি তার চিত্তাকর্ষক কথাবার্তা শুনে যারপরনাই মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত হতাম।

সল্‌তে বক্তৃতা

আজ সল্‌তে এই লেখকের বক্তৃতার কর্মসূচী ছিল। সুতরাং আসরের সময় অপরাহ্ণ ৪টায় আমরা সল্‌তের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। পর্বতরাজি ও

উপত্যকাসমূহের দৃশ্য এবং আঁকাবাঁকা বন্ধুর রাস্তাসমূহ দেখে আমার মনে মনে ঐ সমস্ত আরব বিজেতাদের দুঃসাহস ও দৃঢ়তার পরিমাপ করছিলাম যারা অসংখ্য বিপদ-বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এই দেশ জয় করেছিলেন এবং এখানকার আদিবাসীদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। আমি চিন্তা করে দেখলাম, আজকের বক্তৃতা প্রাথমিক যুগের ঐ সমস্ত মুসলমানদের সম্পর্কে হওয়া উচিত যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা ইসলামরূপী অপরূপ নিয়ামাত দান করেছিলেন এবং ইসলাম তাদের মধ্যে এক নবজীবনের সঞ্চার করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছিল এক আলোকোজ্জ্বল নতুন পথের দিশা, তারা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে যে সীমিত পরিবেশে জীবনযাপন করেছিলেন সেখান থেকে তাদেরকে টেনে বের করে প্রশস্ততম পরিবেশে নিয়ে এসেছিল। আমি আমার বক্তৃতায় জাহিলিয়াতের সাথে ইসলামের তুলনামূলক আলোচনা করে ইসলামের আশীর্বাদপুষ্ট অবিস্মরণীয় দিকগুলোর উপর বিস্তারিত আলোকপাত করি।

শ্রোতায় হল পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিলো, বক্তৃতাটি তারা বেশ পসন্দ করেছেন।

উস্তাদ কামিল আশ্-শরীফ-এর বাসভবনে

মাননীয় রাষ্ট্রদূত সাইয়িদ কামিল আশ্-শরীফ প্রতিনিধিদলের সম্মানে তাঁর বাসভবনে একটি সান্ধ্যভোজের আয়োজন করেছিলেন।

আম্মান থেকে আরবদ

আমাদের আরবদ সফরের দিন ধার্য করা হয়েছিল ১৭ আগষ্ট ১৯৭৩ ইং শুক্রবার। আম্মানের পর আরবদ হচ্ছে জর্দানের সেই কেন্দ্রীয় শহর যার উপর ইসলামের ছাপ রয়েছে এবং ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ও ইসলামী প্রেরণার দিক দিয়ে যার বেশ খ্যাতি রয়েছে। এই শহর জর্দানের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত। আরব সফর আমাদের জন্য খুবই আকর্ষণীয় হয়। আমরা সেখানে প্রাচীন সভ্যতার বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি দেখি। আম্মান থেকে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর আমরা বুক্আ নামক একটি প্রান্তর অতিক্রম করি। সেখানে ফিলিস্তিনী শরণার্থীদের একটি ক্যাম্প রয়েছে, যা খান কয়েক পর্ণকুটিরেরই সমষ্টি; শুধুমাত্র কয়েকটি ঘরের দেওয়াল পাতলা ইটের তৈরী। সেখানে সিমেন্টের তৈরী কয়েকটি দোকান রয়েছে। দারিদ্র ও দুরবস্থার কালো ছায়া যেন

পরিবেশটাকে অন্ধকার করে রেখেছে। বস্তির সন্নিকটে শিশুদের শিক্ষার জন্য একটি মিশন স্কুলও রয়েছে।

বুকআর পর আমরা জরশে থামলাম। জরশ প্রাচীন রোমীয় নিদর্শনাদির জন্য বিখ্যাত। সেখানকার ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন রোমীয়দের উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাক্ষ্য দিচ্ছে। সেখানে আধুনিক যুগের স্টেডিয়ামের মতই প্রাচীন যুগের একটি স্টেডিয়ামের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। রোমীয়রা শরীর চর্চা ও পুরুষদের খেলাধূলার প্রতি যে বিশেষ আগ্রহী ছিল এ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য তাদের কিছু কিছু খেলা এমনও ছিল যেগুলোতে নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার দিকটি ছিল সুপরিস্ফুট।

জরশের পর সাওফ নামক এলাকা। সেখানেও ফিলিস্তিনী শরণার্থীদের একটি ক্যাম্প রয়েছে। আরবদ পৌছার আগে আমরা অন্য একটি ক্যাম্প দেখেছিলাম, যা 'মুখাইমাতুল হাসান' নামে খ্যাত।

উত্তর–সীমান্ত ঃ কিছু মন্তব্য

'আরবদ'কে এক পাশে রেখে আমরা উত্তর সীমান্তের দিকে এগিয়ে চললাম এবং পার্বত্য এলাকায় গিয়ে পৌছলাম। আমরা 'উম্মুল কায়স' নামক একটি জনবসতিতে অবতরণ করলাম। গোলান পর্বত শ্রেণী যার নাম তার অবস্থানের গুরুত্বের কারণে যুদ্ধের দিনগুলোতে সমগ্র বিশ্বে উচ্চারিত হচ্ছিলো, আমাদের সামনেই দণ্ডায়মান। আমাদের এবং পর্বত শ্রেণীর মধ্যে একটি গভীর নিম্ন উপত্যকা, যার মধ্য দিয়ে ইয়ারমূক নদী সাপের ন্যায় কিল্‌বিলিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে। স্মরণে ভেসে উঠলো ইয়ারমূকের সেই লড়াই, মুসলিম বীরদের সেই দুঃসাহসিকতা, সেই বীরত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড; ক্ষত পুনরায় চাংগা হয়ে উঠলো এবং আমি অবচেতন মনেই আওড়াতে থাকলাম স্পেনীয় কবি সালেহ্ বিন শরীফ আর রামাদী–এর নিম্নের কবিতাটি।

حتى المحاريب و هى جامدة + حتى المنابر ترثى و هى عيدان

"মেহরাবগুলোও আহাজারী করছে অথচ সেগুলো জড়বস্তু, মিম্বরও রোদন করছে অথচ সেটা নির্জীব এক খন্ড কাঠ ছাড়া কিছু নয়।''

এহেন দৃশ্য অবলোকন করলে হৃদয়ে আগুন জ্বলে উঠে, তবে সে হৃদয়ে,

যেখানে লুকিয়ে আছে ঈমান ও বিশ্বাসের স্ফুলিঙ্গ। আরবী ভাষায় বলতে গেলে–

لمثل هذا يذوب القلب من كمد

ان كان فى القلب اسلام و ايمان

এই উপত্যকায় দু'টি জনবসতি আছে–একটি নদীর দক্ষিণে এবং অপরটি উত্তরে। নদীর উত্তর দিক এবং অনেক দূর পর্যন্ত গোলান পর্বতশ্রেণী সিরিয়ার দখলে ছিল। কিন্তু ১৯৬৭ইং সনের যুদ্ধে উত্তরের এলাকা সিরিয়ার হাত ছাড়া হয়ে যায় এবং গোলানের উপর ইসরাঈল তার আধিপত্য বিস্তার করে। দক্ষিণ অংশ জর্দানের দখলে ছিল এবং এখনো আছে।

গোলান পর্বতশ্রেণী স্বচক্ষে দেখার পর মূল বিষয় এবং প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে সরাসরি যে জ্ঞান অর্জিত হয় তা পঞ্চাশটি কিতাব পড়েও অর্জন করা সম্ভব নয়। আমরা বিস্মিত হয়েছি সেখানকার ঐসব প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করে, যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা কতইনা সুষ্ঠুভাবে ঐ দেশকে তার শত্রুদের হাত থেকে হিফাজতের ব্যবস্থা করেছেন। ঐ পর্বতশ্রেণী শুধু পর্বতশ্রেণী নয়, বরং এমন একটি সুদৃঢ় দুর্গ, যা জয় করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। ঐ দেশের উপর আল্লাহ্ তা'আলার যে অপরিসীম অবদান রয়েছে তাতে কোন শত্রুই ততক্ষণ পর্যন্ত তার দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস পাবে না যতক্ষণ না তার অধিবাসীরা ঐ সমস্ত মহান অবদানের কথা ভুলে যায়–যা এইসব প্রাকৃতিক প্রাচীর ও দুর্গের আকারে পরিদৃষ্ট হয়। যতক্ষণ না তারা এই উর্বর ভূখন্ডের অমর্যাদা করে–যা তাদের জন্য দুধ ও মধুর নহর বইয়ে চলেছে এবং যা ইসলামী দাওয়াত, ইসলামী বিজয় ও ইসলামী সভ্যতা প্রসারের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে–সর্বোপরি যতক্ষণ না নিজেদের আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে তারা গাফিল ও অমনোযোগী হয়ে পড়ে। গোলানের পর্বতশ্রেণী এমন দুর্গ, যা দেওয়া যেতে পারে কিন্তু নেওয়া যেতে পারে না। অর্থাৎ দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে সেগুলোকে অন্যের হাতে সমর্পণ করা যেতে পারে কিন্তু শক্তি প্রয়োগ করে অন্যের হাতে থেকে ছিনিয়ে আনা চাট্টিখানি কথা নয়। আজ এই দুর্গ ইসরাঈলের মুঠোয়। এখানে পাতা কামান থেকে

তারা যেকোন মুহূর্তে একদিকে আরবদের উপর এবং অন্যদিকে দামেশকের উপর গোলা নিক্ষেপ করতে পারে।

গোলানের উত্তরে তাবারিয়া উপসাগর, যার উপকূলে তাবারিয়া নামীয় একটি ইসরাঈলী শহর গড়ে উঠেছে। উম্মুল কায়সের পাহাড়িয়ার উপর দাঁড়ালে ঐ শহর পরিষ্কার নজরে পড়ে। আর জর্দানী এলাকায় অবস্থিত ইয়ারমূক নদীর উপকূল থেকে ঐ সিরিয়া এলাকাও দেখা যায় যার উপর ইসরাঈলের দখল রয়েছে এবং যা সেখানে থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সিরিয়ার বিখ্যাত জনবসতি 'হিমাহ' ঐ এলাকায়ই রয়েছে সেখানকার ঘরবাড়ী জনশূন্য এবং মাসজিদসমূহ অনাবাদ অবস্থায় পড়ে আছে। ইসরাঈলী সরকার ঐ এলাকায় তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী কয়েকটি রাস্তা তৈরী করে নিয়েছে।

এই সফর থেকে আমরা অত্যন্ত নিরুৎসাহিত, ব্যথিত ও বিপর্যস্ত হয়ে ফিরে আসি। শহরের একটি কেন্দ্রীয় জামি মাসজিদে জুমআর নামায আদায় করি। খতীব অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় খুত্বা দেন। তারপর আমরা শহরের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির বাড়ীতে দুপুরের খাবার খাই, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি এবং আসরের নামায আদায় করার পর বক্তৃতা হলের দিকে রওয়ানা হই। হল ছিল শ্রোতায় পরিপূর্ণ। বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। আমাদেরকে ইসলামী শ্লোগানের মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানানো হয়। এর দ্বারা আমরা শহরের ইসলামী মিযাজের দিকটি মোটামুটি আঁচ করে নিই।

আরবদে বক্তৃতা ঃ ইসলাম সম্পর্কে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি

আরবদে আমার বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল, 'ইসলাম সম্পর্কে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি।' আমি ইসলামের স্থান ও ভূমিকা এবং এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মুসলমানদের দল উপদলের মধ্যে যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করি। যেমন, 'কারো কারো মতে, এই বৈজ্ঞানিক ও আণবিক যুগে ইসলাম ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার কোন স্থান নেই। এই ধারণা পোষণে তারাই অগ্রণী, যারা মনে করেন, 'ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল একটি সীমিত বিশ্বে এবং একটি অবৈজ্ঞানিক যুগে।' তাদের মতে, সে যুগে অবশ্যই ইসলাম সংস্কারমূলক বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছে, অনেক

গোষ্ঠীগত অনাচার দূর করেছে এবং অনেক কুরীতি ও কুপদ্ধতির সংস্কার সাধন করেছে, এই যুগে নিশ্চিতভাবেই ইসলাম ছিল একটি উপকারী বস্তু যখন না ছিল বিজ্ঞানের বিকাশ, আর না ছিল উন্নত সভ্যতা সংস্কৃতির অস্তিত্ব, না ছিল বস্তু বিজ্ঞান, আর না ছিল তার কোন আবিষ্কার উদ্ভাবন। এক দল নিজেদের শিষ্টতা ও ইসলাম প্রীতির প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে বলেন, ইসলাম নিশ্চিতভাবে মানবতা ও মনুষ্যত্বের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, মানবতাবাদের প্রতি ইসলামের অবদান অপরিসীম, কিন্তু আজ এই আধুনিক যুগে, ইসলাম এমন একটি বারুদ শূন্য বন্দুক, যার প্রয়োজনীয়তা ইতিমধ্যে ফুরিয়ে গেছে, আজ এই আণবিক যুগে যখন সভ্যতা সংস্কৃতি, প্রকৌশল প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, রাজনীতি এবং দর্শন উন্নতির চরম শীর্ষে আরোহণ করেছে তখন ইসলামী আইনের অনুশীলন, স্রেফ সময় ও শক্তির অপব্যয় ছাড়া কিছু নয়।

আমার মতে, এটা একটা নিছক ভ্রান্ত ও অবিবেচনা প্রসূত দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া কিছু নয়। যারা ইসলামকে বুঝে না এবং আধুনিক যুগের মিযাজমর্জী ও কঠিন সমস্যাদি সম্পর্কেও হুশজ্ঞান রাখেন না শুধুমাত্র তারাই অনুরূপ কথা বলতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে যেসব সমস্যার কোন সমাধান এ যুগের চিন্তাবিদ ও সমাজবিদরা এখনো দিতে পারেন নি, ইসলাম সে সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান অতীতেও দিয়েছে এবং এখনো দিতে পারে। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব এবং একদেশদর্শিতাই ঐ সমস্ত ব্যক্তিকে অনুরূপ মতপোষণে অনুপ্রাণিত করেছে। তারা নিঃসন্দেহে নিজের ভাণ্ডারে কি আছে তার খোঁজ না নিয়ে অন্যের দিকে ভিক্ষার হাত বাড়িয়েছেন।

একটি তর্কাতীত সত্য এই যে, অনৈসলামিক দর্শন ও জীবন ব্যবস্থার উপর যেসব জাতিগোষ্ঠী আস্থা রাখে তারা এগুলোর পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে এবং তাতে কিছু পরিমাণ সাফল্যও লাভ করেছে, তবে যখন আরবরা এগুলো পরীক্ষা করল তখন ইতিহাস তার জ্বলন্ত সাক্ষী – দেখা গেল, তাদের পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়েছে। আরবরা যখনই জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম গ্রহণ করেছে তখনই তাদের অবস্থা উন্নত হওয়ার পরিবর্তে বরং আরো বিপর্যস্ত হয়েছে আমার মতে, এর গুরু রহস্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আরবদের ভবিষ্যৎকে ইসলামের ভবিষ্যতের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে

বেধে দিয়েছেন এবং তাদের ও ইসলামের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন এক স্থায়ী ও অভঙ্গুর সম্পর্ক - যেন আরবরা এমন একটি জাতি, যাদের কাছে একটি নির্দিষ্ট পয়গাম এবং একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য বস্তু রয়েছে-অন্য কথায়, আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের প্রচার, প্রসার ও হিফাজতের জন্য তাদেরকে মনোনীত করেছেন, এমতাবস্থায় তাদের জন্য এটা কোন মতেই সমীচীন নয় যে, তারা ইসলামকে ছেড়ে অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। মুসলিম জাতি যেন সেই অতি প্রিয় ছাত্রটি, যে তার অভাবিত ধীশক্তি ও আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রতিভা দ্বারা শিক্ষকের অতি প্রিয়জনে পরিণত হয়েছে, সে স্কুলে না গেলে শিক্ষক রাগান্বিত হন, তার খোঁজ খবর নেন এবং তাকে তার মর্যী মত যথায় তথায় ঘুরে বেড়াবার অনুমতি দেন না। অপর দিকে কারই সতীর্থ অলস, বোকা ও বখাটে ছেলেদের প্রতি শিক্ষক বড় একটা মনোযোগ দেন না; কিন্তু এই ছাত্রটি যখন কোন ভুল করে, কোন না কোনভাবে অন্যমনস্কতার পরিচয় দেয় তখন শিক্ষক তার উপর চটে যান, এমন কি সময় বিশেষে তাকে বকাবকি করতেও ছাড়েন না।

বর্তমান পরিস্থিতিতে ইসলামী দেশসমূহ যেসব ভয়ভীতি ও দুর্ভাবনার সম্মুখীন তার প্রেক্ষাপটে একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, আরবরা একমাত্র ইসলামের ছত্রছায়ায়ই আশ্রয় নিতে পারে। তাদের নাজাত ও মুক্তির একমাত্র পথ হলো, তারা বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ইসলামকে আপন করে নেবে, কপটতা ও দুমুখো নীতি পরিহার করবে, আরাম প্রিয়তা, অশালীনতা, অভদ্রতা ও অস্থিরতার জীবন পরিত্যাগ করবে এবং আয়েশ-আরামের জিন্দেগী থেকে নিজেদের পৃথক করে নেবে। আরবরা যদি সম্মান ও মর্যাদার জীবন লাভ করতে চায়, যদি চায় আল্লাহ্র সাহায্যে ও সহানুভূতি তাহলে তাদেরকে ঠিক সেভাবেই জীবন-যাপন করতে হবে, যেভাবে জীবন-যাপন করে দায়িত্বশীল জাতি জরুরী অবস্থায়-যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা সীমান্ত ফাঁড়িতে-অথবা যেভাবে জীবন-যাপন করে একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বীর মুজাহিদ শত্রুকে সামনে রেখে।

বক্তৃতাটি শ্রোতাদের কাছে সমাদর লাভ করে এবং তা আগাগোড়া রেকর্ড করে নেওয়া হয়। যখন আমরা আরবদ থেকে রওয়ানা হচ্ছিলাম তখন ঘরে, বাজারে-সর্বত্রই এই রেকর্ড করা বক্তৃতা শ্রুতিগোচর হচ্ছিলো।

ইসলামী মুজাহিদ আবদুল্লাহ্ আত্‌তাল এর ইন্তিকাল

আমরা আম্মানে প্রবেশ করছিলাম, এমন সময় বিশিষ্ট ইসলামী পথ প্রদর্শক, মর্দে মুজাহিদ জেনারেল আবদুল্লাহ্ আত্‌তাল-এর আকস্মিক ইন্তিকালের খবর পাই। ১৯৫১ইং সনে কায়রোর উস্তাদ মুহাম্মদ আলী আত্‌-তাহির-এর বাসভবনে তাঁর সাথে আমার সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ হয়। ফিলিস্তিনী ফ্রন্টে তিনি যে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছিলেন, যে সেনানায়ক সুলভ দৃঢ়তা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা আমি তখনই বিস্তারিতভাবে জানতে পেরেছিলাম। তিনি শুধুমাত্র একজন সমরবিদ ছিলেন না, একজন নামকরা গ্রন্থকারও ছিলেন।[৫]

তার ওফাতের খবর পেয়ে আমরা অত্যন্ত মর্মাহত হই। আমি মনে করি মরহুমের কৃতিত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড এবং ইসলামে ও স্বদেশের জন্য ত্যাগ স্বীকারের স্বীকৃতিস্বরূপ তার পরিবার-পরিজনের প্রতি সমবেদনা জানানোর জন্য তখন তখনই তাঁর বাসভবনে আমাদের যাওয়া উচিত। আমরা বাস্তবেও তাই করি সংগে সংগে তার বাসভবনে যাই, কৃতিত্বপূর্ণ অবদান সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করি এবং তার রূহের মাগফিরাত কামনা করি।

খেলাধূলা ও চিত্তবিনোদন কেন্দ্র

তারপর আমরা আম্মানে ফিরে আসি। এদিক-সেদিক যাওয়ার সময় আমরা প্রতিবারই 'মাদীনাতুল মালাহী' এর নিকট দিয়ে যেতাম, যা রাজধানীর উপকণ্ঠে অবস্থিত । এমন সংকটজনক মুহূর্তে, যখন জাতি জীবন-মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে, 'মাদীনাতুল-মালাহী' এর অস্তিত্ব আমাদের কাছে বিস্ময়করই ঠেকলো। আমরা জানতে পারলাম, এই শহরে এমন সাতটি সুইমিং পুল আছে, যেখানে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ রয়েছে। এর মধ্যে একটি আছে 'ফনদকে' আম্মান-এ, যেখানে আমরা অবস্থান করছিলাম। শহরে প্রেক্ষাগৃহ, ক্লাব এবং অবাধ মিলন কেন্দ্রের সংখ্যাও অনেক। যেখানে সমগ্র দেশ এমন এক অগ্নিকুণ্ডের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে যে অগ্নিকুণ্ড যে কোন মুহূর্তে ফেটে পড়তে পারে-সেখানে এ ধরনের অশালীন চিত্তবিনোদন ব্যবস্থার কোন যৌক্তিকতা অন্ততঃ আমরা খুঁজে পাইনি।

আমরা জানতে পারলাম, এই লজ্জাকর পরিবেশ-যা ইসলামের সরল, সহজ ও ভদ্র মিযাজের সম্পূর্ণ প্রতিকূল - গড়া ও বহাল রাখার জন্য

বহিঃশক্তিসমূহ প্রচুর সাহায্য-সহায়তা করছে। ইসলামী দেশসমূহের দূরবস্থা এবং চরিত্রিক ও আধ্যাত্মিক দেউলিপনা প্রত্যক্ষ করার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, এগুলোর জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমেরিকাই দায়ী। আমেরিকা চায়, এই সমস্ত দেশ নৈতিক ও চারিত্রিক ক্ষেত্রে গোলক ধাঁ-ধাঁয় পড়ে থাক ; এরূপ হলে ফল দাঁড়াবে এই যে, কখনো এরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার মত নৈতিক বলের অধিকারী হতে পারবে না, বরং চিরদিনই অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে এবং ইসরাঈলের সাথে মুকাবিলা করারও দুঃসাহস (?) পাবে না। আমেরিকার এই পলিসির সাথে শুধু আমেরিকার নয় বরং ভেটিকান সিটি তথা সমগ্র খ্রীস্টান বিশ্বের যোগসাজস রয়েছে।

আসহাবে কাহ্‌ফের গুহায়

১৮ই আগস্ট ১৯৭৩ ইং শনিবার আমরা আসহাবে কাহ্‌ফের গুহা দেখতে যাই, যা আম্মানের একটি বস্তিতে অবস্থিত। আমাদের পথ প্রদর্শক (GUIDE) ছিলেন বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ জর্দানের পুরাতত্ত্ববিভাগের পরিচালক উস্তাদ 'তাওফীক ওফাছজানী। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, আসহাবে কাহ্‌ফ যাদের কাহিনী কুরআনে সূরা কাহ্‌ফে, খ্রীস্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থে এবং ইতিহাস ও প্রবাদ বাক্যে উল্লেখিত হয়েছে- যে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তা এই গুহাই।আমি আমার 'মুআর রাকা-ই ঈমান ও রাদ্‌দিয়াত' -এবং ' সূরা কাহ্‌ফ কা মুতালাআ' , শীর্ষক গ্রন্থাদিতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং আমি বেশীর ভাগ গ্রন্থকারের সেই ধারণাকে সঠিক বলে মনে করেছি, যে ধারণা মতে, এই ঘটনা 'আফসূস' বা 'আফসীস' নামক শহরে সংঘটিত হয়েছিল। আফসূস বা আফসীস, আযমীর থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে কাসীতারা নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী আনাতুলিআয় অবস্থিত বারটি আইয়ূবী শহরের অন্যতম। এই শহরটি এখন তুরস্কের অধীন এবং তারসূম নামে খ্যাত। আর যে গুহায় আসহাবে কাহ্‌ফ আশ্রয় নিয়েছিল তা ছিল এই শহরেরই উপকণ্ঠের একটি পাহাড়ে। পাহাড়টির নাম এনচিলিস্ (ANCHILIS), কিন্তু উস্তাদ তাওফীক একথার উপর জোর দিচ্ছিলেন যে, আসহাবে কাহ্‌ফের গুহা এই কাহফুর রাজীবই, যা দেখতে আমরা গিয়েছিলাম। অবশ্য একথার সমর্থনে তাঁর কাছে এমন অনেক যুক্তিপ্রমাণ

রয়েছে, যেগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। তিনি তাঁর 'ইকতেশাফ্ কাহ্ফি আহ্লিল্ কাহ্ফ্' শীর্ষক গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে এই সমস্ত দলীলের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি আমাকে ঐ গ্রন্থের একটি কপি উপহার দেন। উস্তাদ তাওফীক আমাদেরকে গুহার কাছে নিয়ে যান এবং এমন অনেক নিদর্শন ও চিহ্নাদির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এটাই সেই জায়গা যার সাথে কুরআনে বর্ণিত জায়গার মিল রয়েছে। আমি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিই যে, আমি আমার গ্রন্থের উপর পুনরায় চোখ বুলাবো এবং তাঁর কাছ থেকে এ সম্পর্কিত যে সব তথ্য ও তত্ত্বাদি লাভ করেছি তা থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করবো। সত্যের উপর ইজারাদারী বা সত্যকে নিয়ে একগুয়েমি চলে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানে চিরদিনই পরিবর্তন-পরিবর্ধন হতে থাকে। 'কাহ্ফুর রাজীব' আম্মান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আট কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। উস্তাদ তাওফীক-এর উক্তি অনুযায়ী মুকাদ্দাসী, ইয়াকূত, সাইহ্ হারভী, বেরুনী প্রমুখ এ মতই পোষণ করেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, উস্তাদ তাওফীকের হাতে যে মূল্যবান তথ্যাদি রয়েছে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করতে হবে, মর্যাদা দিতে হবে এবং তা থেকে উপকৃত হওয়ারও চেষ্টা করতে হবে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা বৈঠক

আজ (১৮ই আগস্ট) আমাদের একটি আলোচনায় যোগদানের কথা। প্রতিনিধিদলের আগমনকে কেন্দ্র করেই বৈঠকটির আয়োজন করা হয়েছে। এটা ছিল এই সফরের মোটামুটি নির্যাস। বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায়, কুল্লিয়াতুল আলমিয়াতুল্ ইসলামিয়া হলো তাতে অধ্যাপকবৃন্দ, উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দ এবং ইসলামী সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী নাগরিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উস্তাদ মুহাম্মদ ইবরাহীম শাকরাহ অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে এবং সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। এই লেখক, উস্তাদ আহমদ মুহাম্মদ জামাল এবং উস্তাদ কামিল আশ্ শরীফ বিশেষ অতিথি হিসাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচ্য বিষয় ছিল 'বর্তমান সমাজে মুসলিম যুবশ্রেণীর ভূমিকা'। অনুষ্ঠান-পরিচালনাকারী কর্তৃক এ বিষয়ের উপর উত্থাপিত প্রশ্নাদি এবং এই লেখক কর্তৃক প্রদত্ত তার জবাবসমূহ নিম্নে দেওয়া গেল।

যুব শ্রেণীর অস্থিরতার কারণ এবং তার প্রতিকার

অনুষ্ঠানে উস্তায মুহাম্মদ ইবরাহীম শাকরাহ্ উদ্বোধনী ভাষণ দেন। যুব শ্রেণীর বর্তমান অবস্থা কি এবং তাদের অস্থিরতার কারণই বা কি সে সম্পর্কে উস্তাদ শাকরাহ্ বিস্তারিত আলোচনা করেন। সমগ্র ইসলামী বিশ্বে যে সমস্ত শক্তি ও মতামত কাজ করছে সে সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা করার পর উস্তাদ প্রশ্ন করেন, আজ সমগ্র বিশ্ব আকীদা, চিন্তাধারা, কাজকর্ম তথা সর্বক্ষেত্রেই এক মারাত্মক অস্থিরতার মধ্যে রয়েছে। এই অস্থিরতা আমাদের দেশের মুসলিম যুবশ্রেণীর মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। অতএব সর্বপ্রথম আমাদের জানা উচিত, কি সেই কারণ যার ফলে এই অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে বা এই অস্থিরতা আমাদের সমাজে শিকড় গাড়তে সক্ষম হয়েছে।

আমার জবাব, - যা সংগে রেকর্ড করা হয়, কিঞ্চিৎ পরিবর্তন-পরিবর্ধনসহ ছিল নিম্নরূপ -

'আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান যে, আপনারা এই শিক্ষামূলক আলোচনায় আমার উপর আস্থা রেখেছেন এবং আমার ও আমার সংগীদের কাছে এই প্রশ্নের জবাব চেয়েছেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রশ্নটি বর্তমান পরিস্থিতির দর্পণস্বরূপ এবং যে অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা দিন গুজরান করছি তার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বন্ধুগণ, আমি অতি স্পষ্টভাষায় বলতে চাই যে, আমি প্রকৃতই বিস্মিত হতাম, যাদি মুসলিম যুবক অস্থিরতার শিকারে পরিণত না হত, যা আপনারা নিজ চোখে দেখছেন, নিজ কানে শুনছেন এবং নিজ অন্তরে অনুভব করছেন। গাছ ফল দেবে, এতে দোষারোপ বা তিরস্কারের কি কারণ থাকতে পারে বলুন ? হতে পারে মালী কোন চারাই লাগাবে না; কিন্তু সে যদি একটি চারা লাগায়, সেটাকে দেখাশুনা করে, সময়মত তাকে সজীব সতেজ রাখার জন্য পরিশ্রম করে, প্রখর রৌদ্রতাপ ও ঝড়বৃষ্টি সহ্য করে এই আশায় যে, গাছটি একদিন বড় হবে এবং তাতে ফল ধরবে - তাহলে এটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক কথা হবে যে, গাছটি যখন চিরাচরিত নিয়মে ফল দিতে থাকবে তখন মালী তা অপসন্দ করবে এবং এজন্য গাছের নিন্দা করবে, তাকে গালিগালাজ করবে। কেননা যখন থেকে প্রকৃতি অস্তিত্ব লাভ করেছে, যখন থেকে গাছের উদ্ভব হয়েছে তখন থেকেই তার স্বভাব বা প্রকৃতিতে

কোন পরিবর্তন হয় নি। যায়তূন বৃক্ষ বরাবরই যায়তূন ফল দিয়ে আসছে এবং আনার বৃক্ষ, আনার-এতে কখনো অন্যথা হয় নি এবং ভবিষ্যতেও হবার সম্ভাবনা নেই।

এই অস্থিরতা, যার মধ্যে বিশ্বের যুবসমাজ বিশেষ করে মুসলিম যুব সমাজ আজ বন্দী, তার প্রধান কারণ হলো শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রচারের বৈপরিত্য। যুবকরা উত্তরাধিকার সূত্রে একটি দর্শন পেয়েছে ; কিন্তু তার পরিবেশ অন্য দর্শন পেশ করছে, আর উলামায়ে দ্বীন অপর আর একটি দর্শনের তালীম দিচ্ছেন। এই পরস্পর বৈপরিত্য, মতবিরোধ আর মত পার্থক্য এক সাথে চড়ে বসেছে যুবকদের উপর-যে কারণে তারা আজ বিপর্যস্ত, দিশেহরা এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ধরুন, শিশু একটি মুসলিম বংশ ও মুসলিম পরিবারে জন্ম নিল, যার ফলে সে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইসলামী আকায়েদ দ্বারা প্রভাবিত হলো, তারপর সে এমন একটি ধর্মীয় পরিবেশে - যেখানে ইসলামী নীতিমালা অনুসরণ করা হয়-বর্ধিত ও প্রতিপালিত হলো এবং আল্লাহ্ তাওফীক দিলে কিছু ইসলামী ইতিহাসও অধ্যয়ন করলো, এরপর তাকে হাঁকিয়ে দেওয়া হল (আমার, এই শব্দ ব্যবহারে অপরাধ মার্জনীয়। কেননা সন্তান তখন অল্প বয়স্কা থাকে এবং তার কোন ইখতিয়ারই থাকে না।) এমন এক জায়গায় যেখানে সে তার শিক্ষকদের কাছ থেকে-যাদেরকে সে সম্মান করে, সমীহ করে, কেননা তারা অনেক বিষয়ে পারদর্শী ও বিশেষজ্ঞ - এমন সব কথা শুনে, যা ঐ সমস্ত চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণার বিপরীত, যা অতীতের ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রভাবে তার মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল হয়েছে এবং সর্বত্র সে এমন সব জিনিষ দেখে ও শুনে যা অতীতের সবকিছুকে অস্বীকার করে-অস্বীকার না করলেও অন্ততঃ অবজ্ঞা করে। এমতাবস্থায় সে এক ভয়ানক ধরনের ক্লান্তিকর ও দুটানা অবস্থায় পতিত হয় এবং এক দারুণ অস্থিরতা তাকে পেয়ে বসে, যা কোন অলৌকিক ঘটনা না ঘটলে দূর হবার কোন উপায় নেই। প্রকৃত ব্যাপার হলো, যে পরিবেশে আমরা জীবন-যাপন করছি, সেখানে এই মানসিক অস্থিরতা ও টানা পোড়ন থেকে নিস্তার পাওয়াটা একটা অলৌকিক ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়। এরূপ অসস্তিকর অবস্থা যুদ্ধক্ষেত্রেও দেখা দেয়, তবে যুদ্ধ চলে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এবং প্রায় ক্ষেত্রেই তা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এই যে মানসিক দ্বন্দ্ব ও দু'টানা অবস্থা, তা সর্বদাই চলতে

থাকে মাসজিদে, মাদ্রাসায়, ঘরে, বাইরে সর্বত্রই থাকে এর দাপট, কোথাও শান্তি বা স্বস্তি বলে কোন জিনিষের অস্তিত্ব থাকে না।

এই ভয়ংকর, বিরক্তিকর ও সর্বনাশা অবস্থার উৎসে হচ্ছে তথ্য ও সংবাদ সরবরাহ সংস্থাসমূহ এবং বেতার ও টেলিভিশন। আমাদের রাতদিন ঐ সমস্ত প্রোগ্রাম দেখে ও শুনে, যা তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের মূলে অনবরতঃ কুঠারাঘাত করতে থাকে, তাদের মন–মস্তিষ্কে বিদ্রোহ ও মানসিক অশান্তির সৃষ্টি করে। প্রেস কিংবা সাংবাদিকতা যা অনেক লোকের কাছে হিজ ম্যাজেস্টি (HIS MAJESTY)–এর চাইতে কম নয়। আমাদের যুবকদেরকে সকালে, দুপুরে, এমন কি প্রত্যুষে যখন তাদের কুরআন অধ্যয়ন করার কথা–এমন খোরাক পরিবেশন করে যা তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় স্বাস্থ্যের পক্ষে যারপরনাই ক্ষতিকর। পত্র–পত্রিকায় ও টেলিভিশনে সর্বপ্রথম যে জিনিষটি তাদের নজরে পড়ে তা হলো কোন স্ত্রী লোকের উলংগ ছবি অথবা শালীনতা–বর্জিত কোন প্রবন্ধ বা ফিচার। তাই প্রথম পদক্ষেপেই সে শুবা–সন্দেহের সম্মুখীন হয়, যার ফলে তার ঈমানই নড়বড়ে হতে থাকে। আমাদের যুবকরা এমন সব বই পুস্তক পড়ে যার দ্বারা প্রত্যেকটি বাজার ভর্তি হয়ে আছে যাতে সুকৌশলে ও অতি আকর্ষণীয়ভাবে এমন সব কথা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যা তাদের ঈমান ও নৈতিকতাকে ধ্বংস করে, ধর্ম সম্পর্কে তাদের অন্তরে সন্দেহের সৃষ্টি করে, যে সভ্যতা–সংস্কৃতি ও আদর্শের মাধ্যমে তাদের পূর্ব পুরুষরা একদিন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সেগুলো সম্পর্কে তাদের অন্তরে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করে এবং ক্রমেক্রমে তারা এমন অবস্থায় গিয়ে পৌছে যে, নিজেদের মহান পূর্ব–পুরুষদের সমালোচনায়–যাদের প্রতি তাদের চিরকৃতজ্ঞ থাকারই কথা–মুখর হয়ে উঠে। আজ আমাদের যুবকরা তাদের পরিবেশে যা দেখছে, যা পাচ্ছে এবং যা অনুভব করছে তাতে অভিজ্ঞ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও দূরদর্শিতা সম্পন্ন লোকেরই মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার কথা, অতএব এ কারণে তাদের কচি মনমস্তিষ্কে যদি বিকারের সৃষ্টি হয় তবে সে জন্য তাদেরকে একচেটিয়াভাবে দোষী করা চলে না।

আজ আমাদের যুবকদের অবস্থা সেই গাড়িয়ালের মত, যার গাড়ী টানছে দু'টি শক্তিশালী ঘোড়া, কিন্তু একটি টানছে সামনের দিকে, তো অন্যটি ঠিক পিছনের দিকে। এই গাড়িয়ালের যে অবস্থা, আমাদের যুবকদেরও ঠিক সেই

অবস্থা। তারা আজ দুটানা অবস্থায় পড়ে বিস্মিত, বিপর্যস্ত ও হতভম্ব, কোন দিকে যাবে কোথায় যাবে, তা ঠাহর করতে পারছে না।

আরব রাষ্ট্রসমূহের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বে যারা ছিলেন, এবং অন্ততঃপক্ষে গত পঞ্চাশ বছর থেকে যে সাহিত্যিক উপাদান আমাদের সামনে আসছে তাতে এই নবীরা তো দূরের কথা, আমাদের প্রবীণদেরই মাথা খারাপ হওয়ার যোগাড়।এই সমস্ত বই পুস্তকে যে ঐশ্বর্য,যে খ্যাতি ও যে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সস্তা শ্লোগান ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে তাতে আমাদের যুবকরা পথের দিশা পাওয়ার চাইতে পথ হারিয়েছে বেশী। নিজেদের উপর এবং নিজেদের জাতির উপর আস্থাশীল হওয়ার চাইতে সন্দিহানই হয়েছে বেশী। তাদের হৃদয়ে ও মনমগজে ফলবান বৃক্ষের নামে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করা হয়েছে এবং তা সযত্নে লালন-পালনও করা হচ্ছে। এগুলোই হচ্ছে আমাদের যুবকদের অস্থিরতার মূল কারণ।"

এবার উস্তাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন, 'যুব সমাজের এই অস্থিরতার প্রতিকার কি'? আমার উত্তর-

"আমার মতে, এই ধ্বংসকর অবস্থা থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করতে হলে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হবে, শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যে অদ্ভুত বৈপরিত্য ও দু'টানা অবস্থা বিরাজ করছে তা অবিলম্বে দূর করা। আপনাদের সামনে এই পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দান নিষ্প্রয়োজন বলেই আমি মনে করি। কেননা আপনারা সকলেই জানেন যে, বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থা দু'টি ব্লকে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একটি ধর্মীয় এবং অপরটি অধর্মীয় বা ধর্ম নিরপেক্ষ। অন্য কথায় বলতে গেলে, একটি প্রাচীন বা নৈতিকতা পন্থী এবং অপরটি নবীন বা নৈতিকতা-বিবর্জিত আধুনিক পন্থী। শিক্ষা ব্যবস্থার এই দুমুখো অবস্থা এবং বৈপরিত্যই আমাদের যুবকদের অস্থিরতার বড় কারণ। অতএব যদি এই অস্থিরতা দূর করতে হয় তাহলে সর্বপ্রথম শিক্ষার উদ্দেশ্য ও শিক্ষার পাঠক্রমের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। যেমন আমি বলেছি, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আজ যত বৈপরিত্য-একটি পদ্ধতি যা প্রমাণ করে অন্য পদ্ধতি তা বাতিল করে দেয়। এই প্রেক্ষিতে আমাদের সর্বপ্রথম সংগ্রামী পদক্ষেপ হবে, বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে সমঝোতা বিধান করা। শিক্ষার মধ্যে প্রাচীন, আধুনিক, ধর্মীয় নিরপেক্ষ, প্রাচ্য দেশীয় বা পাশ্চাত্য দেশীয় বলে কোন কথা নেই, শিক্ষাকে শ্রেণী-বিন্যাস বা ভাগ-বন্টন করা

চলে না। যদি এর মধ্যে কোন ভাগ-বন্টন হয় তবে তা হবে তার লক্ষ্য ও উপদানের প্রেক্ষিতে। আর এই উপদানরাজির মধ্যে এমন ঐক্য থাকতে হবে যাতে এর সব কয়টিই মূল লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করে।

এরপর ঐ পরস্পর বিরোধিতা দূর করতে হবে, যাকে শরীআত ও কুরআনের ভাষায় 'নিফাক বলা হয়। আমার মতে, সামঞ্জস্য বিধানের অর্থ এই নয় যে, এক দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে অন্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে এবং এর অর্থ, একই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যে অসামঞ্জস্য রয়েছে তা দূর করতে হবে। এজন্য শিক্ষানীতিকে আগাগোড়া ঢেলে সাজাতে হবে এবং এমন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে যা লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রভাব বিস্তারের দিক দিয়ে এক ও একক। এজন্য প্রয়োজন একটি বিরাট বিপ্লবের-যে বিপ্লব হবে দুঃসাহসিকতাপূর্ণ ও সর্বব্যাপী। এজন্য দরকার এমন কিছু অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বের, যারা শিক্ষার পাঠক্রম সংশোধন করবেন, তাতে সংস্কার সাধন করবেন। এজন্য স্বভাবতই বিরাট পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে এবং ব্যাপকতর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রসমূহকে এবং ইসলামী একাডেমীসমূহকে এর পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসতে হবে। যদি আমরা শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনে সফল হই এবং আমাদের সমাজে ও পরিবেশে যে বৈপরিত্য ও মতদ্বৈততা, রয়েছে তা নিরসনে সক্ষম হই তাহলে আশা করা যায়, আমাদের যুবকরা এই ধ্বংসকর অস্থিরতা ও শ্বাসরুদ্ধকর অস্থিরচিত্ততা থেকে মুক্তিলাভ করবে।"

এবার উস্তাদের অনুরোধ, 'অনুগ্রহপূর্বক বলুন ঐ সমস্ত সংস্থার মধ্যে যথাযথ সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে কি ধরনের বাস্তব ভূমিকা পালন করতে হবে?' আমার উত্তর ছিল-

"এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই সব মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা দূর করে সমাজের মধ্যে শান্তি ও স্বস্তির জীবন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাষ্টের যথার্থ ভূমিকা পালন তখনি সম্ভব যখন রাষ্ট্রের হাতে কোন পরিষ্কার মতাদর্শ থাকবে। আমি এখানে কোন নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের উল্লেখ করছি না, এখানে কাউকে কটাক্ষ করাও আমার উদ্দেশ্য নয়, বরং আমি একটি শিক্ষাগত বিষয়ের উপর আলোচনা করছি- আমি বলতে চাচ্ছি, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের কাছে তার সেই ধর্মীয় মতাদর্শের পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে যার উপর সে বিশ্বাসী, ঐ সমস্ত লক্ষ্য সম্পর্কে তার স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে, যাকে সে তার মূল লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ

করেছে এবং সে চায় যে, এই লক্ষ্য অর্জিত হোক, সজীব হোক এবং ফলে-ফুলে সুশোভিত হয়ে উঠুক। এটাকে আমরা ইসলামের পরিভাষায় ঈমান ও আকীদা বলে থাকি। রাষ্ট্রের ঈমান ও বিশ্বাস পাকাপোক্ত ও সুদৃঢ় হতে হবে। ইসলাম যে প্রকৃষ্টতা ও মহান লক্ষ্যের প্রতি আহ্বান জানায় সেটাকে 'জাবায়ত' (লেনদেন)-এর ভিত্তিতে নয়, বরং 'হিদায়াত'-এর ভিত্তিতে অর্জন করতে হবে।৬

এরপর প্রয়োজন আন্তরিকতা, দুঃসাহসিকতা ও ত্যাগ স্বীকারের। এই সব গুণাবলীই ইসলামী ব্যক্তিত্বসমূহের পরিস্ফুটন, উন্নয়ন এবং তার জীবনের মূল লক্ষ্য অর্জনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে এবং পরিণামে তারা বিশ্বের আদর্শ জাতি ও শ্রেষ্ঠ মানব গোষ্ঠীতে পরিণত হয়।

তার শেষ প্রশ্ন উপস্থাপন করতে গিয়ে উস্তাদ মুহাম্মদ ইবরাহীম শাকরাহ্ বলেন, 'এবার আমি উস্তাদ আবুল হাসানের কাছে আবেদন করছি, তিনি যেন তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে - যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি তার যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব অতিক্রম করে বার্ধ্যক্যে উপনীত হয়েছেন-এই শেষ প্রস্তাবটি সম্পর্কে তার অভিমত ব্যক্ত করেন এবং এই সাথে সর্বশেষে আমাদের যুব সমাজকে তার মূল্যবান পরামর্শ ও উপদেশ দ্বারা উপকৃত করেন। আল্লাহ্ তা'আলা উস্তাদকে দীর্ঘায়ূ করুন-এই আমাদের আকুল প্রার্থনা।' আমি উত্তরে বলি, "অমি যুবকদের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার ব্যাপারে নিরাশ নই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের যুবকরা ইসলামী দাওয়াত ও ইসলামী ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে কিছু করতে চাচ্ছে এবং সেই চিন্তার জগত সৃষ্টিতে প্রকৃত মুসলিম হিসাবেই নিজেদের নিয়োজিত করতে চাচ্ছে যার দ্বিতীয় কোন নজীর এযাবত মানবেতিহাসে পরিলক্ষিত হয় নি।

বন্ধুগণ, যুবকদের মধ্যে বিভিন্ন স্তর ও বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে। চিন্তার ক্ষেত্রে তারা সবাই এক নয়। আমি এমন অনেক যুবক দেখেছি যারা নিজে-দের দায়িত্ব পালনের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে এবং তাদের মধ্যে দায়িত্ব পালনের পরিপূর্ণ যোগ্যতাও রয়েছে। মুসলমানদের বর্তমান দুরবস্থার উপর তারা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এই যুবকরাই আমাদের বর্তমানে পুঁজি এবং ভবিষ্যতের আশা-ভরসা। সত্যি কথা বলতে গেলে, এই যুবকরাই পারে বর্তমান বাতিল চিন্তাধারার মোড় ঘুরিয়ে দিতে। আমি আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর ভরসা করে আপনাদেরকে নিশ্চিত করে বলতে পারি,

বর্তমানে যুবকদের মধ্যে ইসলামী দাওয়াতের কাজ করার বিস্তৃত ক্ষেত্র রয়েছে। তাদের মধ্যে যে অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে তাই তাদের উন্নতি ও প্রকৃষ্টতা অর্জন প্রচেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ। আমাদের যুবকরা আজ হতাশাগ্রস্ত। পাশ্চাত্য সভ্যতা তাদেরকে শান্তি ও স্বস্তিদানে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। ফলে তাদের মধ্যে এমন এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, যা পূরণ করা যায় নি এবং যাবেও না। যেমন উস্তাদ কামিল আশ্-শরীফ বলেছেন শুধুমাত্র ইসলামই এই শূন্যতা পূরণ করতে পারে। ইউরোপ আমাদের চিন্তা-চেতনা ও দেহমনে যে জিনিষের ছাপ সৃষ্টি করেছে সে জিনিষটি শুধু পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্যই ছিল নির্দিষ্ট যা তারা দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এবং দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা দ্বারা সঞ্চয় করেছিল। কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়-আর এটাকে মানবজাতির দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে-যখন ইউরোপ চিন্তার জগতে নেতৃত্ব লাভ করল তখন তাদেরই চিন্তাধারা ঐসব জাতির মনমস্তিষ্কেও ঢুকে পড়ল, যাদের সমাজে ও পরিবেশে ঐ চিন্তাধারার দূর দূরান্তের ও কোন সম্পর্ক বা অভিজ্ঞতা ছিল না। এটা ছিল সেই নির্দিষ্ট সমাজের অভিজ্ঞতা যাদের ধর্মের ছিল একটি আলাদা গতি এবং একটি পৃথক মিযাজ। ঐ সমাজে গীর্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে রেষারেষি দেখা দিয়েছিল, ধর্ম ও শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল। তাদের ধর্ম ও বিজ্ঞানের পরস্পর বিরোধিতা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে পরিণত হয়েছিল-এসব ছিল ইউরোপীয়দের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এসব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে প্রাচ্য দেশসমূহ ছিল একেবারে অনবহিত। কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, ইউরোপীয়রা সেসব অভিজ্ঞতা এবং তার কুপ্রভাব আকস্মিকভাবেই চাপিয়ে দিল প্রাচ্যবাসীদের উপর। 'ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার, 'ধর্ম ও রাজনীতি দু' টি পৃথক বস্তু' - ইত্যাকার দর্শনসমূহ ছিল পাশ্চাত্য জাতি-সমূহের নিজস্ব অভিজ্ঞতা প্রসূত বস্তু-যা বিশেষ অবস্থা, বিশেষ পরিবেশ এবং পাশ্চাত্যের ধর্ম-ঈসাইয়ত'-এর বিশেষ মিযাজের প্রেক্ষিতে অস্তিত্ব লাভ করেছিল। কিন্তু এগুলোকেই প্রাচ্যের জাতিসমূহ কোন ভাবনা-চিন্তা ছাড়াই স্বাগত জানালো। অপরিণামদর্শিতা সৃষ্ট এই শূন্যতাই আজ আমাদের যুব সমাজের মধ্যে পরিদৃষ্ট হচ্ছে, তারা এই শূন্যতাকে ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে। আজ আমাদের যুবকদের মধ্যে যে পথভ্রষ্টতা, বাড়াবাড়ি ও একদেশদর্শিতা পরিলক্ষিত হয় তা তাদের এই উপলব্ধিরই ফলশ্রুতি। আমি এশিয়া ও প্রাচ্য দেশসমূহ সফরের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, আমাদের

যুবকদের মধ্যে এই নতুন বিপ্লবের নেতৃত্বদান এবং চিন্তাজগতের এই কঠিন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার সব রকমের যোগ্যতাই রয়েছে।

কিন্তু মুশকিল হলো এই যে, আমাদের এবং আমাদের যুবকদের মধ্যে এক সাগর দূরত্ব বিরাজ করছে। আমরা তাদের সাথে সম্পর্ক রাখি না। আমরা তাদের সম্পর্কে শুধু ভ্রান্তধারণা পোষণ করি–তাদেরকে জানার এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার কোন চেষ্টাই করি না। আজ আমাদের বুড়োদের, যুবকদের, প্রচারকদের এবং পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের মধ্যে যে দূরত্ব বিরাজ করছে তা যদি কমিয়ে আনা যায় তাহলে আমাদের যুবকরা অবশ্যই নব বলে বলীয়ান হয়ে নতুন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং এটাকে সফল করেও ছাড়বে। কিন্তু এজন্য প্রয়েজন দূরদর্শিতার, ব্যাপক পরিকল্পনার এবং প্রচুর সাহিত্য সামগ্রীর। যুবকদের সাথে আলাপ-আলোচনা করার সময়, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। এজন্য দরকার হিকমাতের, কৌশলের–যেদিকে কুরআন আমাদের পথ নির্দেশ করেছে।

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ –

অর্থ ঃ "তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর হিকমত (সুকৌশল) ও সদুপদেশ দ্বারা এবং ওদের সাথে আলোচনা কর সদ্ভাবে।"–(১৬ ঃ ১২৫)

আর এজন্য দরকার শক্তিশালী, চিন্তাপ্রসু ও মুক্তাঝরা কলমের, দরকার মনের কথা প্রকাশের অসাধারণ ক্ষমতা, সাহিত্যিক মিষ্টি-মুখরতা, ভাষার সাবলীলতা ও যাদুকরী বর্ণনা শক্তির। এছাড়া যুবকদের অন্তর জয় করা যাবে না, তাদের মনমগজও প্রভাবিত করা যাবে না।

আমার অত্যন্ত আক্ষেপ হয় যখন দেখি, আমাদের কোন কোন শ্রদ্ধেয় আলিম ভাষা ও সাহিত্য চর্চাকে অনাবশ্যক জিনিষ বলে মনে করেন। তারা মনে করেন, এগুলো মানুষকে তার আসল কর্তব্য ও দাযিত্ব থেকে বিরত রাখে অথচ আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই যে, খোদ কুরআনও এই জিনিষটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। আমরা সবাই বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ তা'আলা অভাবশূন্য, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন– অথচ আমরা দেখি যে,

তিনি কুরআনকে আকর্ষণীয় বর্ণনাভঙ্গি সম্পন্ন বা 'আরবী উম্ মুবীন' গ্রন্থ রূপে নাযিল করেছেন এবং খোদ কুরআনেরই একাধিক জায়গা একথার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে –

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ۝

অর্থ ঃ "জিবরাঈল ফিরিশতা এটা অবতীর্ণ করেছে তোমার হৃদয়ে, সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়, যাতে সতর্ককারী হতে পারো।"–(২৬ ঃ ১৯৩–১৯৫)

আরো বলা হয়েছে –

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

অর্থ ঃ "কুরআন, এটা আমি অবতীর্ণ করেছে আরবী ভাষায় যাতে তোমরা বুঝতে পার।"–(১২ ঃ ২)

এদ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, ভাষার সাবলীলতা এবং আকর্ষণীয় বর্ণনাভঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ। আর যখন আমরা দাওয়াত, তাজদীদ ও ধর্ম সংস্কারের ইতিহাস অধ্যয়ন করি তখনও দেখতে পাই যে, ঐ সমস্ত মহান ব্যক্তি, যারা নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র সাথে সম্বন্ধ স্থাপনের ক্ষেত্রে উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন তারা কখনো এদিকটাকে অবজ্ঞা করেন নি বরং এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আমি এ প্রসংগে নবী (সা.)–এর দৃষ্টান্ত পেশ করছি না। কেননা এটা কে–না জানে যে, তাঁর ভাষা অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীল এবং তাঁর বর্ণনাভঙ্গি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী ছিল ? হযরত আলী বিন আবী তালিব (রা.)–এর ভাষাও ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও অলংকার সমৃদ্ধ। এভাবে যদি আমরা ইসলামী ইতিহাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি শতাব্দীর উপর চোখ বুলাই তাহলে দেখতে পাব, যারাই ইসলামী দাওয়াত ও ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্ট বর্ণনাভঙ্গি এবং শ্রোতার মন আকৃষ্ট করার মত ভাষা প্রয়োগের ক্ষমতা দান করেছিলেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, যখন আমি সাইয়িদুল আবদুল কাদির জিলানী (র.)–এর ভাষণসমূহ পড়ি তখন মুগ্ধ না হয়ে পারি না। যে ব্যক্তি সমগ্র বিশ্বের এবং সর্বযুগে আপন যুহ্‌দ, তাকওয়া, আল্লাহ্ প্রেম কেনাআ'ত, অল্পেতুষ্টি, ধৈর্য প্রভৃতি গুণাবলীর কারণে বিখ্যাত হয়ে

আছেন-আমরা দেখি, ইসলামী সাম্রজ্যের রাজধানী ও আব্বাসী খিলাফতের কেন্দ্রভূমি বাগদাদে, যেখানে হারীরী ইবনে জূযী ও সাবী জন্মগ্রহণ করেছেন, যেখানে ১৪.০০ শরীফরযী, মুতানাব্বী, আবূ তামাম ও মাআরবী তাদের যাদুকরী ভাষার লীলাখেলা দেখিয়েছেন-সেখানেই তিনি আপন সমাজকে এমন সুমধুর ভঙ্গিতে ও সুন্দর ভাষায় সম্বোধন করছেন, যে সম্বোধন তাদের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করছে এবং তাদের মন-মানসিকতায় সৃষ্টি করছে এক বিরাট আলোড়নের। তাঁর ঐ সমস্ত ভাষাণের প্রভাব এবং আকর্ষণ এখনো বাকী আছে। একারণেই সংকলনকারীরা চেষ্টা করেছেন হযরত জিলানীর ভাষাসমূহ হুবহু নকল ও সংরক্ষণ করার। এরূপ করা না হলে নিশ্চয় এগুলো তাদের প্রভাব অনেকটা হারিয়ে ফেলত।

এসব কথা দ্বারা সাহিত্য ও বর্ণনাভঙ্গির গুরুত্ব স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। অতএব আমরা যদি আমাদের যুবকদেরকে সঠিক ইসলামী তারবীয়ত ও প্রশিক্ষণ দিতে চাই তাহলে এজন্য আমাদেরকে সাহিত্য ও শিক্ষাগত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হতে হবে, ঐ সমস্ত শর্ত পূরণ করতে হবে যা প্রতিটি স্থান ও প্রতিটি কালের জন্য অপরিহার্য ছিল এবং আজো আছে। অর্থাৎ আমাদেরকে এমন এক সমৃদ্ধ ইসলামী সাহিত্য তৈরী করতে হবে, যা যুবকদের মন-মানসিকতা ও বোধগম্যতার নিকটবর্তী, যা তাদেরকে আকর্ষণ করবে এবং পড়ার জন্য তারা অধীর হয়ে উঠবে। যদি আমরা এই শর্তসমূহ পূরণ করি তাহলে আমার বিশ্বাস, আমাদের যুবকরা এই মতাদর্শের প্রতি শুধু আস্থাশীলই হবে না বরং এর প্রচার ও প্রসারের জন্যও যথাসম্ভব চেষ্টা করবে। এমনকি এজন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করতেও দ্বিধা করবে না।"

সন্ধ্যায় প্রতিনিধিদল একটি নৈশভোজে যোগদান করেন যা আম্মানস্থ ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত (চার্জ দ্য এফেয়ার্স) উস্তায মুহাম্মদ মায়মাশ কর্তৃক প্রতিনিধিদলের সম্মানে দেওয়া হয়েছিল। ঐ নৈশভোজে বহু সংখ্যক উলামা, নেতৃস্থানীয় নাগরিকবৃন্দ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আম্মান থেকে কারক

সফর সাক্ষাৎকার এবং ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দেখার দিক দিয়ে ১৯শে আগস্ট, ১৯৭৩,ইং রোববার ছিল আমাদের জর্দান সফরের ব্যস্ততম দিন।

সকাল সাড়ে ছয়টায় আমরা 'কারক'-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। আওকাফ মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী উস্তাদ আবদ্ খলফ আমাদের সাথে ছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি ও স্থানসমূহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। তিনি সীরাত ও ইতিহাসের উপরও ব্যাপকভাবে পড়াশুনা করেছেন। তিনি প্রায়ই ঐ সমস্ত জায়গায় ঘুরাফেরা করেন। কেননা তাঁর বাসস্থান ও এগুলোর সন্নিকটেই। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ উস্তায রফীক ওফাদ্জানী-এর (কাহ্ফ সফর প্রসংগে যাঁর উল্লেখ করা হয়েছে) সাহচর্য লাভ করায় এই সফরে আমাদের ইতিহাসগত জ্ঞান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। চিত্তবিনোদনের সাথে সাথে এই সমস্ত ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি থেকে আমরা অনেক মূল্যবান উপদেশ গ্রহণেরও সুযোগ পেয়েছি। এমন অনেক জিনিষই অন্ততঃ আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে, যা আমি সীরাত, ইতিহাস ও ভূগোলের বই পুস্তকে পড়েছিলাম বটে, তবে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহচর্য ও পথ প্রদর্শন দ্বারা তা হাতে-কলমে বুঝা মোটেই সম্ভব ছিল না। এই সংক্ষিপ্ত সফরে আমি সেই জ্ঞান লাভ করতে পেরেছি যা পঞ্চাশটি বই পুস্তক পড়েও লাভ করা সম্ভব হত না। তাছাড়া ঐ স্থানসমূহ স্বচক্ষে দেখার পর অন্তরের মধ্যে যে আবেগ ও অনুভূতির সৃষ্টি হয় তা কোন বই-পুস্তক অধ্যয়নের মাধ্যমে হওয়াটা মোটেই সম্ভব নয়।

সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা

আমরা যখন আম্মানে ছিলাম তখন সর্বপ্রথম জর্দান রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর একটি সামরিক কেন্দ্র দেখতে যাই। সেখানে আমাকে অনুরোধ করা হয়, যেন আমি সেনা-ছাউনীতে অবস্থানকারী এবং একটি নাজুক ও গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তে মোতায়েন ঐ সৈন্যদের উদ্দেশ্যে কিছু বলি। এই আগ্রহ প্রদর্শনের জন্য আমি ঐ এলাকার সেনানায়কদেরকে ধন্যবাদ জানাই। এটা আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা যে, আমি একটি মহান মুসলিম রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সাক্ষাত এবং উৎসর্গীকৃতপ্রাণ সেই মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করছি, যারা ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও ইসলামের পবিত্র স্থানসমূহ সংরক্ষণের জন্য এবং নিজেদের প্রতি আগত যে কোন বিপদাশংকার মুকাবিলায় নিজেদের সদা-প্রস্তুত রেখেছেন।

যখন সশস্ত্র জওয়ানরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ইসলামী পদ্ধতিতে আমাকে সালামী দিল -এবং আমি এই দৃশ্য আমার জীবনে এই প্রথমই দেখলাম- তখন আমার দেহে, ঈমান, দৃঢ়তা ও আনন্দের স্রোত বয়ে গেল, চোখে দেখা দিল আনন্দাশ্রু, সজীব হয়ে উঠল মন এবং মুখের ভাষা ফুটে উঠার আগেই যেন অন্তরের ভাষায় বলতে শুরু করলাম-

"আমি লালিত-পালিত হয়েছি জ্ঞান-অনুশীলনকারী এমন একটি ধর্মীয় পরিবেশে-যেখানে জ্ঞানী, চিন্তাবিদ ও লেখকদের সাথে উঠাবসা করার ও তাদের থেকে উপকৃত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ ছিল, আমি এমন অনেক বৈঠক ও মজলিসে যোগদান করার সুযোগ পেয়েছি যেখানে অনেক প্রখ্যাত আলিম ও বক্তারা সমাগম হত। কিন্তু আজ আমি যে বিশ্বস্ততা, বিনয় ও নম্রতা প্রত্যক্ষ করছি, যে আনন্দ ও উৎসাহবোধ করছি তা জীবনে কখনো করি নি। যদি আমার ইখতিয়ার চলত এবং এজন্য আমাকে অনুমতি দেওয়া হত-তাহলে আমি আপনাদের প্রত্যেকের হাতে চুমো খেতাম। কেননা আপনাদের হাত ইসলামের জন্যই উৎসর্গীকৃত। ইসলাম এবং মুসলমানদের হিফাজতের জন্যই তো আপনারা নিজেদের হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَ الْمُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً ٠

অর্থ ঃ "বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধনপ্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ্ তাদেরকে, যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর, মর্যাদা দিয়েছেন"-(৪ ঃ ৯৫)

আপনারা ইসলামী দেশসমূহের রক্ষক, মুসলমান স্ত্রীলোক ও শিশুদের মান-সম্মানের হিফাজতকারী এবং ঐ সমস্ত মাসজিদ ও শিক্ষায়তনের পবিত্রতা রক্ষাকারী যেখানে আল্লাহ্র ইবাদত করা হয়, আল্লাহ্কে স্মরণ করা হয়, ইসলামের প্রচার হয়, ইল্মের প্রসার হয়, ফারায়েয ও সুনান্ শিক্ষা দেওয়া হয় - সর্বোপরি আত্মাকে পবিত্র করার এবং হাল-অবস্থাকে সংস্কার করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ইসলামী সীমান্তসমূহের রক্ষক ও নিগাহ্বানগণ, যদি আপনারা ত্যাগ, উৎসর্গ, বীরত্ব ও বাহাদুরী না থাকত তাহলে মুয়ায্যিনদের পক্ষে 'আযান দেওয়া সম্ভব হত না, মুসল্লীদের পক্ষে আল্লাহ্র ঘরে ফরয সালাত আদায় করা কঠিন হয়ে দাঁড়াত, দ্বীনী ইল্ম প্রচার এবং এই আমানতকে এক বংশ থেকে অন্য বংশে হস্তান্তরিত করার কোন কেন্দ্র থাকত না, বৃদ্ধ, মহিলা ও দুর্বলদের জন্য শান্তির নিদ্রা হারাম হয়ে যেত এবং বণিকদের জন্য ব্যবসা ও পেশাদারদের জন্য দেশ চালিয়ে যাওয়া মুশকিল হয়ে দাঁড়াত। প্রত্যেকটি ধর্মীয় নিদর্শন, প্রত্যেকটি জ্ঞানগত তথা জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আপনাদের ঋণ রয়েছে–চাই তা স্বীকার করুক অথবা না করুক। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন–

عينان لا تمسهما النار ، عمن بكت من خشية الله و عين باتت تحرس فى سبيل الله ٠

অর্থ ঃ "জাহান্নামের আগুন দু'টি চোখকে স্পর্শ করতে পারবে না–একটি চোখ, যে আল্লাহ্র ভয়ে কেঁদেছে এবং অপর চোখ, যে আল্লাহ্র পথে পাহারা দিয়ে সারা রাত কাটিয়েছে।"[৭]

অন্য একটি বর্ণনায় আছে,

ما اغبرت قدما عبد فى سبيل الله فتمسه النار

অর্থ ঃ "এমন হবে না যে, বান্দার দু'টি পদদ্বয় আল্লাহ্র পথে ধূলিধূসরিত হয়েছে এবং সেগুলোকে দোযখের আগুন স্পর্শ করবে।"[৮]

অপর একটি বর্ণনায় আছে,

رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا و ما عليها

অর্থ ঃ "আল্লাহ্র পথে একদিন পাহারা দেওয়া এবং সীমান্তের হিফাজত করা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে হিফাজত করা, দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চাইতে শ্রেষ্ঠ।"[৯]

অপর একটি বর্ণনায় আছে,

غدوة فى سبيل الله او روحة خير من الدنيا و ما فيها

অর্থ ঃ "আল্লাহ্র পথে একটি প্রাতঃ–সফর কিংবা সান্ধ্য–সফর দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চাইতে শ্রেষ্ঠ।।"[১০]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জিহাদকে ইসলামের 'শীর্ষভাগ" (সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন কাজ) আখ্যা দিয়েছেন। একটি সহীহ্ বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মুআয ইবনে জাবালকে বলেছিলেন–

الا أداك برأس الامر و عموده و ذروة سنامه ، قلت بلى يا رسول الله قال

رأس الامر الاسلام و عموده الصلواة و ذروة سنامه الجهاد .

অর্থ ঃ "আচ্ছা, আমি কি তোমাকে সর্বপ্রধান কর্মাদর্শ, তার স্তম্ভ ও শীর্ষবস্তু সম্পর্কে বলবো? আমি (মু'আয) বললাম, 'অবশ্য অবশ্যই বলুন।' তিনি (সা.) বললেন, সর্ব প্রধান কর্মাদর্শ হলো, ইসলাম, নামায হলো তার স্তম্ভ এবং জিহাদ তার শীর্ষবস্তু।"[১১]

আমি তাদের সামনে উপমহাদেশের জিহাদের ইতিহাস থেকে, হিজরী তেরশ' শতাব্দীর পতাকাবাহী এবং দাওয়াত ও ইসলামের সর্ববৃহৎ সংগ্রামের নায়ক হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদের একটি ঘটনা বর্ণনা করি।

একদা মুজাহিদরা তাদের আমীর হযরত সাইয়িদ আহমদের নেতৃত্বে 'মায়ার'–এর যুদ্ধ থেকে বিজয়ী বেশে ফিরে আসেন। তখন তাদের চেহারা এমন ধূসরিত এবং পোশাক–পরিচ্ছদ এত ময়লাযুক্ত ছিল যে, তাদেরকে চেনাই যাচ্ছিলো না। এমতাবস্থায় সরদার বাহ্রাম একটি রুমাল দিয়ে আমীরের চেহারা থেকে ধূলা ঝাড়তে উদ্যত হলে হযরত সাইয়িদ আহমদ বলেন, 'পাঠান ভাই, একটু থামো, এটা হচ্ছে সেই ধূলা যার সম্পর্কে নবী (সা.) বলেছেন,

لا يجتمع غبار فى سبيل الله و دخان جهنم

অর্থ ঃ "পথের ধূলা এবং জাহান্নামের ধূঁয়া একত্রিত হয় না।"[১২]

আমাদের এখানে আসার এবং এই সমস্ত দুঃখ কষ্ট সহ্য করার উদ্দেশ্যই ছিল ধূলা লাভ করা। অতএব পাঠান ভাই, একটু ধৈর্য ধরো, এত তাড়াহুড়ার প্রয়োজন নেই। অগত্যা মুজাহিদরা তাঁবু গাড়লেন, কিন্তু কেউ নিজের গায়ের ধূলা ঝাড়লেন না।[১৩]

তারপর আমি দু' টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সৈন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তারমধ্যে একটি হলো, নিয়্যাত বিশুদ্ধ হবে, উদ্দেশ্য হবে শুধু ইলা-ই-কালিমাতুল্লাহ্ (আল্লাহ্র দ্বীন প্রচার) ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ। আমি তাদের সামনে এই বিখ্যাত হাদীসটি পেশ করি।

سئل رسول الله صلعم عن الرجل يقاتل شجاعة و يقاتل حمية و يقاتل رياء اى ذلك فى سبيل الله فقال رسول الله صلعم من قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء فهو فى سبيل الله .

অর্থ ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'এক ব্যক্তি বাহাদুরী দেখাবার জন্য যুদ্ধ করে, অপর ব্যক্তি ইয্যত ও আত্মসম্মান রক্ষার্থে যুদ্ধ করে এবং অপর আর একজন লোক–দেখানোর জন্য যুদ্ধ করে–তাদের মধ্যে কে আল্লাহ্র পথে প্রকৃত যোদ্ধা বলে বিবেচিত হবে?' রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উত্তরে বলেন, 'যে শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে যে, আল্লাহ্র পথে প্রকৃত যোদ্ধা বলে বিবেচিত হবে।'[১৪]

অপর যে জিনিষটির প্রতি আমি সৈন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম তা হলো, এমন সব কাজকর্ম ও আচার–আচরণ থেকে দূরে থাকা যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণে পরিণত হয় এবং যেগুলো তার সাহায্য আসার পথ বন্ধ করে দেয়। সাইয়িদিনা উমার ইবনে আবদুল আযীয (র.) তার এক সেনাপতিকে লিখেছিলেন, "তুমি শত্রুর শক্তি, প্রতিপত্তি ও অস্ত্র–শস্ত্রকে ভয় করো না বরং ভয় কর গুনাহ্কে ও আল্লাহ্র অবাধ্যতাকে। কেননা আমার মতে, গুনাহ্ মানুষের জন্য শত্রুর কূটচালের চাইতেও ভয়ংকর।'[১৫]

এই বক্তৃতা শ্রোতাদের উপর খুব প্রভাব বিস্তার করে এবং সংগে সংগে তা রেকর্ড করে নেওয়া হয়। আমার মতে নিজ নিজ সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি সৃষ্টি করা, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের কাছে জিহাদের কি স্থান ও মর্যাদা, শাহাদতের কি ফযীলত ও প্রকৃষ্টতা এবং শহীদদের কি সওয়াব ও পুরস্কার রয়েছে তা তাদের সামনে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা–প্রত্যেকটি মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শক্তির এই বিরাট উৎসটিকে উপেক্ষা করার ফলে ইসলাম ও মুসলমানরা যারপরনাই ক্ষতিগ্রস্থ

হয়েছে। এরই ফলে ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ তাদের সামরিক ও প্রতিরক্ষামূলক শক্তি এবং গায়র ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ, তাদের সামরিক ও প্রতিরক্ষামূলক শক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য বাকি থাকে নি; অথচ পার্থিব ও ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য এই ছিল যে, মুসলমানরা যখন যুদ্ধ করত তখন তাদের পিছনে প্রেরণা যোগাত ঈমান, তারা প্রত্যাশা করত আল্লাহ্‌র কাছে তারই সন্তুষ্টি ও পুরস্কারের এবং তারই উপর ভরসা করে নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত শত্রুর উপর এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে বলেন।

وَلَا تَهِنُوْا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ
وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ـ

অর্থ ঃ "শত্রুদলের সন্ধানে তোমরা কাতর হয়ো না। যদি তোমরা যন্ত্রণা পাও তবে তারাও তো তোমাদের মতই যন্ত্রণা পায় এবং আল্লাহ্‌র নিকট তোমরা যা আশা কর ওরা তা আশা করে না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।"

– (৪ ঃ ১০৪)

আমার পর উস্তাদ মুহাম্মদ আহমদ জামালের পালা আসে। উস্তাদ জামাল আয়াতে কুরআনীর যথাযথ নির্বাচন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা রাখেন। 'মতন' সহ অনেক হাদীসই তার মুখস্থ। সুতরাং তিনি কুরআন ও হাদীসের আলোকে এমন পান্ডিত্যপূর্ণ ও আকর্ষণীয় বক্তৃতা দেন যে, শ্রোতা মাত্রেই তাকে বাহ্‌বা জানায়।

নাস্তা করার পর আমরা যখন এই সামরিক কেন্দ্র থেকে বের হই তখন এক অনাবিল আনন্দ ও ইসলামী প্রেরণায় আমার অন্তর ছিল ভরপুর। আমরা কায়মনো বাক্যে দু'আ করছিলাম যেন আল্লাহ্ তা'আলার গায়বী সাহায্য আমাদের এই ফৌজী ভাইদের চিরসাথী হয়।

শুহাদা–ই মূতার সমাধি ভূমিতে কিছুক্ষণ

আমরা এগিয়ে চললাম এবং কিছুক্ষণ পর 'মূতা' নামক সেই স্থানে গিয়ে পৌঁছলাম যেখানে রাসূলুল্লাহ্‌র যুগেই একটি বিরাট ইসলামী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। আমরা এই যুদ্ধের বিবরণী, ইসলামী সীরাত ও ইতিহাস গ্রন্থাদিতে

পড়েছি। এই সংঘর্ষে মুসলমানরা অভূতপূর্ব বীরত্ব ও বাহাদূরীর পরিচয় দিয়েছিলেন। মূতা কারক থেকে দক্ষিণে বারো কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত একটি প্রান্তর।[১৬] এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল তিন হাজার এবং রোমান ও ঈসায়ীদের সম্মিলিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ। হযরত যায়দ ইবনে হারিসা যে স্থানে শাহাদাত বরণ করেছিলেন তা এখন মাশহাদ নামে খ্যাত। হযরত যায়দের পর হযরত জাফর ইবনে আবূ তালিব পতাকা তুলে ধরেন। শত্রুর তরবারির আঘাতে তার ডান হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে তিনি বামহাতে পতাকা উঁচিয়ে ধরেন। যখন বাম হাতটিও কেটে যায় তখন দুই বাহু দ্বারা তিনি কোন মতে পতাকাটি ধরে রেখে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত শাহাদত বরণ করেন। এই বীরত্ব ও ত্যাগ-স্বীকারের কারণেই তিনি 'জাফর তাইয়ার' ও 'যুল্‌জানাহাইন' উপাধি লাভ করেন। তারপর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা মুসলিম বাহিনীর পতাকা হাতে নেন এবং লড়তে লড়তে তিনিও শাহাদাত বরণ করেন। এরপর মুসলমানরা সর্বসম্মতিক্রমে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদের হাতে পতাকা তুলে দেয়। হযরত খালিদ অসাধারণ বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার সাথে লড়তে থাকেন। ধীরে ধীরে রাত ঘনিয়ে আসে। তখন রোমানরা উত্তর দিকে এবং মুসলমানরা দক্ষিণ দিকে চলে যায়। পরবর্তী ভোর পর্যন্ত উভয় বাহিনীই যুদ্ধে ক্ষান্ত দেয়। এই অবসরে হযরত খালিদ একটি রণ-কৌশল অবলম্বন করেন এবং সে অনুযায়ী আপন বাহিনীর বেশ কিছু সৈন্যকে পিছনের দিকে একটি দীর্ঘ সারিতে মুতায়েন করেন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ভোর হওয়ার সাথে সাথেই সৈন্যরা বিরাট হৈ চৈ শুরু করে। তখন শত্রুরা মনে করে যে, নবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে নতুন সাহায্য বাহিনী এসেছে। তারা প্রথম দিন মাত্র তিন হাজার সৈন্যের সাথে লড়ে যেভাবে হেস্তনেস্ত হয়েছে, যেভাবে তাদের অসংখ্য লোক নিহত হয়েছে তাতে এই নতুন বাহিনী আসার পর-যাদের সঠিক সংখ্যাও তারা জানে না নিশ্চিতভাবে আরো ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি হবে ভেবে মুসলিম বাহিনীর উপর পুনরায় হামলা করার সাহস পায় নি। তারা খুশী হয় এই দেখে যে, মুসলিম বাহিনীও তাদের উপর হামলা করে নি। তারা আরো বেশী খুশী হয় যখন দেখে যে, হযরত খালিদ হঠাৎ মদীনায় ফিরে গেছেন। এই যুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ না করলেও, রোমানরাও কিন্তু জয়লাভ করেনি।[১৭]

আমরা ঐ বীর সিপাহীদের দুঃসাহসিকতা ও অতুলনীয় বীরত্বের কথা চিন্তা করে বিস্ময়াভূত অবস্থায় সেখানে বেশ কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়েছিলাম। ঐ মুজাহিদরা এসেছিলেন মদীনা থেকে সুদূর মূতায়–যে অঞ্চলটি তখনকার বিশ্বের সর্বাধিক শক্তিশালী রাষ্ট্রের অধীনে ছিল। মদীনা থেকে মূতার দূরত্ব ছিল আনুমানিক ১১০০ কিলোমিটার। মুসলিম মুজাহিদরা উট এবং ঘোড়ায় চড়ে এই বিরাট দূরত্ব অতিক্রম করেছিলেন। মদীনা থেকে বের হওয়ার পর তারা কারো কাছ থেকে কোন রসদ–সামগ্রী পাননি, এমন কি রাজধানীর সাথে তারা নির্ভীক চিত্তে ঢুকে পড়ছিলেন শত্রুব্যূহের মধ্যে। সীরাতে ইবনে হিশামে আছে–

"তারা এগিয়ে চললেন এবং সিরিয়ার 'মাআন' নামক স্থানে গিয়ে পৌছলেন। সেখানে পৌছে জানতে পারলেন যে, সম্রাট হিরাক্লিয়াস এক লক্ষ রোমান সৈন্য নিয়ে 'বলকা' এলাকার মূআব নামক স্থানে পৌছে গেছেন এবং তার সাথে যোগ দিয়েছে লাখাম, জাযাম, কীন বাহ্‌রা এবং বিলী সম্প্রদায়সমূহের আরো এক লক্ষ যোদ্ধা। মুসলমানদের কাছে এই সংবাদ পৌছার পর তারা মাআনে দুদিন অবস্থান করে এবং উপস্থিত পরিস্থিতির উপর চিন্তাভাবনা করতে থাকে। সে প্রেক্ষিতে মুজাহিদদের অভিমত হলো, শত্রুদের সংখ্যা ও উপস্থিত পরিস্থিতির কথা জানিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌কে পত্র লেখা হোক। তিনি হয় আমাদের জন্য সাহায্য পাঠাবেন না হয় যে হুকুম দেবেন আমরা তাই পালন করবো।[১৮] তখন আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠেন, 'বন্ধুগণ, তোমরা যে জিনিষটি (অর্থাৎ শাহাদাত)–কে ভয় করছ তার জন্যই তো তোমরা এখানে এসেছ। আমরা তো জনসংখ্যা বা শক্তির আধিক্যের উপর ভরসা করে যুদ্ধ করি না, আমরা যুদ্ধ করি সেই দীনের জন্য এবং সেই দীনকে বুকে ধারণ করে যা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ধন্য করেছেন। অতএব এগিয়ে চলো, দু'টি নিয়ামাতের (অবদানের) একটি আমরা অবশ্যই পাব–হয় জয়ী হবো, না হয় শাহাদাত বরণ করবো।' তাঁর একথা শুনে সবাই এক বাক্যে বলে উঠলো, 'আল্লাহ্‌র কসম, ইবনে রাওয়াহা ঠিক কথাই বলেছেন।' এরপর তারা বেরিয়ে পড়েন।[১৯]

যুদ্ধ শুরু হলো। মুসলিম বাহিনীর তিনজন সেনাপতি –হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হারিসা, হযরত জাফর ইবনে আবী তালিব এবং হযরত আবদুল্লাহ্

ইবনে রাওয়াহা (রা.) একের পর এক শাহাদত বরণ করলেন। এই ছিল প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের ঈমানী প্রেরণা, আল্লাহ্‌র পথে প্রাণ বিসর্জনের ঐকান্তিক আগ্রহ-যা থেকে পরবর্তী যুগের মুসলমানরা বঞ্চিত হয়ে পড়েছে। এ কারণেই অতীত ও বর্তমান যুগের মুসলমানদের অবস্থার মধ্যে এত বিরাট পার্থক্য, এত ব্যাপক অসংগতি।

আমরা সেনাপতিত্রয়ের কবর জিয়ারত করি। তাদের যিনি যেখানে শাহাদত বরণ করেছিলেন সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। আমরা সাইয়িদিনা 'জাফর ইবনে আবী তালিবের মসজিদ'ও দেখি এবং তার সমাধিতে দাঁড়িয়ে তার অতুলনীয় বীরত্বের কথা স্মরণ করতে থাকি। এই মসজিদ ও সমাধিসমূহের উপর হাশিমী যুগে সুউচ্চ মিনার তৈরী করা হয়। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে পর্যটকদেরকে যে প্যাম্পলেট দেওয়া হয় তাতে এই মাযারসমূহের ইতিহাস ও অন্যান্য বিবরণী লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমরা যখন মাযারগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে ফাতিহা পাঠ করছিলাম তখন নিজেদেরকে অতি নগণ্য হীন বলে মনে হচ্ছিল।

মূতার ঐতিহাসিক স্থানসমূহ

সাইয়িদিনা হযরত জাফরের মসজিদের পাশেই অতি সম্প্রতি একটি ইসলামী মিউজিয়াম নির্মিত হয়েছে। তাতে ইতিমধ্যে কিছু ইসলামী নিদর্শন ও ঐতিহাসিক চিঠিপত্র রাখা হয়েছে। আওকাফ মন্ত্রণালয়, মিউজিয়ামের দায়িত্বে রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এই মিউজিয়ামের একটি প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে। এটাকে আল মালিক আন্‌নাসির মুহাম্মদ ইবনে কালাউনের শাসনামলে ৭২৩হিঃ সনে সর্বপ্রথম নির্মাণ করেন শূবাক ও কারকের নায়েবে সুলতান বাহাদুর আল্‌-মালিকী আন্‌-নাসিরী। এতে উস্তায মাহমূদ আল-আফগানী প্রমুখের সংগৃহীত কিছু নিদর্শনও রয়েছে।

বাতরা সফর

মূতা থেকে আমরা বাতরা ও মাআন অভিমুখে রওয়ানা হই। পথিমধ্যে 'লাখতা' নামক একটি জনবসতি পড়ে। সেখানকার পানি নাকি উদরাময় ও পাথরী রোগ নিরাময়ের পক্ষে খুবই উপকারী। তাই দূর-দূরান্ত থেকে লোক

পানি নিতে আসে। আমরা 'দ্বানাহ্' নামক জনবসতি অতিক্রম করে শভাক-এ গিয়ে পৌঁছি এবং সেখানকার কৃষি বিদ্যালয় দেখে তারপর আরবাহ্ উপত্যকা অতিক্রম করি। মধ্যাহ্ন ভোজ সেরে আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি। কেননা আসরের নামাযের পর আমাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সফরে বের হতে হবে। সেজন্য কিছুটা দৈহিক সজীবতার প্রয়োজন।

আসরের নামাযের পর আমরা 'বাতরা' এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।[২০] বাতরা হাজার হাজার বছরের প্রাচীন একটি শহর। আরবীয় নাবাতীরা এই শহরের গোড়াপত্তন করেছিল। হিজর ও মাদায়েনয়ে সালেহ-এর মত এই শহরটিও পাথরের পাহাড় খোদাই করে তৈরী করা হয়েছিল। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে, এখানকার খোদাইকর্মের ধরন ও পদ্ধতিসমূহ সামূদ বংশের খোদাই কর্মের চাইতে অপেক্ষাকৃত উন্নত।

আমাদের মোটরগাড়ী একটি দীর্ঘ ও উন্মুক্ত সুড়ঙ্গ দিয়ে, পাহাড় কেটে তৈরী, একটি রাস্তা অতিক্রম করলো। এই রাস্তাটি কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ এবং আঁকাবাঁকা। এর দুদিকে দু'টি উঁচু পাহাড়। এরপর আমরা একটি শহরে প্রবেশ করি। সেখানেও পাহাড় কেটে তৈরী প্রাসাদ, উদ্যান, বাজার, বিচারালয়, পাকা সড়ক প্রভৃতি ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি রয়েছে। আমাদের পথ প্রদর্শক (GUIDE) ছিলেন উস্তাদ রফীক ওফাদজানী। তিনি আমাদেরকে ঐ সমস্ত নিদর্শনাদির ইতিহাস অনবরতঃ বলে যাচ্ছিলেন। সত্যি, তিনি আমাদের সাথে না থাকলে আমাদের ঐ সফরই ব্যর্থ হত।

ঐ বিরাট শহরটি আমরা পুরোপুরি দেখতে পারি নি। কেননা আমাদের হাতে সময় ছিল কম, আর বাতরার আয়তন হচ্ছে ৩০ বর্গ কিলোমিটার। যাহোক এই সফর যেমন ছিল আমাদের জন্য জ্ঞানবর্ধক তেমনি শিক্ষাপ্রদ। শহরটি দেখে আমরা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের মর্মার্থ একেবারে হাতে কলমে উপলব্ধি করার সুযোগ পাই। আয়াতটি হচ্ছে -

وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فَارِهِيْنَ

অর্থ ঃ "তোমরা তো নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছ।"-(২৬ ঃ ১৪৯)

রাতের বেলা আমরা আম্মানে ফিরে আসি। আমাদের এই সফর ছিল খুবই দীর্ঘ। আমরা একই দিনে মেটর গাড়ীতে এত দীর্ঘ পথ আর কখনো অতিক্রম করি নি।

আম্মান ত্যাগ

২০শে আগস্ট ১৯৭৩ ইং সোমবার আমাদের আম্মান থেকে ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার কথা। বিমান উড্ডয়নের সময় ছিল বিকাল সাড়ে চারটা। আমাদের বিদায়ী সাক্ষাতের জন্য যারা আসেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মসজিদে আকসার সাবেক খতীব শায়খ আসআদ আল-হুসায়নী। শায়খ কিছু সময় আমাদের সাথে কাটান। তখন তাঁর কাছ থেকে, বায়তুল মুকাদ্দাস ইয়াহূদীদের কবলে যাওয়ার চাক্ষুষ অবস্থা এবং আরব নেতৃবৃন্দের দুর্বলতা ও হীনমনোবৃত্তির অনেক ঘটনার কথা শুনতে পাই। তার কথাবার্তা ছিল তথ্যসমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয়। রাবেতায়ে উলূমে ইসরামিয়াহ্-এর সভাপতি উস্তাদ তায়সীর যুবইয়ান ও সদলবলে আমাদের সাথে দেখা করতে আসেন। সাইপ্রাসের একটি তুর্কী প্রতিনিধিদলও আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সে দেশের মুসলমানরা নিজেদের ইসলামী বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য কিভাবে লড়ে যাচ্ছেন তার বিস্তারিত বর্ণনা দেন।

উস্তাদ কামিল আশ্-শরীফ মুতামারে ইসলামীর পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদলের সম্মানে একটি মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেন। ঐ অনুষ্ঠানে আমরা অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাই, যাদের সাথে এই সংক্ষিপ্ত সফরে সাক্ষাৎ করার সুযোগ হয়ে উঠে নি। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন কুল্লিয়াতুশ শারীআহ-এর প্রিন্সিপাল (বর্তমানে জর্দানের আওকাফ মন্ত্রী) শায়খ আবদুল আযীয খাইয়াত প্রমুখ।

আমাদের মাননীয় মেযবান ডঃ ইসহাক ফারহান এবং আরো অনেক জ্ঞানী, পন্ডিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি আমাদেরকে বিদায় জানানোর জন্য হোটেলে আসেন। তাদের সাথে কিছু সময় কাটানোর পর আমরা বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ও সফরসঙ্গী ডঃ আবদুল্লাহ্ আজম-যিনি আমার অন্তরের গভীরে একটি অনন্য স্মৃতিরূপে বিরাজ

করছেন, আমার প্রবীণ বন্ধু, সাহিত্যিক ও 'হিযারাতুল ইসলাম' পত্রিকার সম্পাদক ডঃ আদীব সালেহ, সিরিয়া বিশ্ববিদ্যালযের কুল্লিয়াতুশ্ শারীআহ্-এর উস্তাদ-যিনি বর্তমানে আম্মানের কুল্লিয়াতুশ শারীআয় 'ভিজিটিং প্রফেসার' হিসাবে অধ্যাপনা করছেন এবং দীর্ঘদিন পর যার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, সাউদী আরবের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত উস্তাদ মুহাম্মদ মায়মাশ এবং উস্তাদ কামিল আশ-শরীফ প্রতিনিধিদলকে বিদায় সম্বর্ধনা জানান। আল্লাহ্ তাআ'লা তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন।

টীকা ঃ

১. জর্দানের লোকেরা তাদের শাহকে 'সাইয়িদুনা' শব্দ দ্বারা সম্বোধন করে। এই শব্দটি হিজায থেকে গৃহীত হয়েছে এবং বর্তমানে সেখানে একমাত্র এই শব্দই প্রচলিত।

২. এই কাব্যানুবাদের নাম ছিল 'সামসামুল ইসলাম। তা কালামী সাহেবের জীবৎকালেই নোল কিশোর, লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত হয় এবং পাঠকদের কাছে তা সমাদরও লাভ করে।

৩. ইতিমধ্যে একথা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্র এবং ইশারা ইংগিতেই সুলতান আবদুল হামীদ খান সিংহাসনচ্যুত হয়েছিলেন তাঁর কাছে ক্ষমতাচ্যুতির ফরমানটি যে নিয়ে গিয়েছিল সেও ছিল একজন ইয়াহুদী।

৪. মানিক ছিল কবি মুতাম্মিমের ভাই। সে রিদ্দাহ যুদ্ধে নিহত হয়। মুতাম্মিম সারা জীবন তার জন্য আহাজারি করে।

৫. কয়েক বছর পূর্বে 'খাতারুল ইয়াহুদিয়াতিল আলমিয়ার্ আলাল ইসলাম ওয়াল মাসীহিয়াহ শীর্ষক তার একটি গ্রন্থ 'দারুল কলাম কুয়েত কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ফিলিস্তিন যুদ্ধ সম্পর্কিত তাঁর রোজনামচাও ১৯৫৯ইং সনে প্রকাশিত হয়েছে।

৬. এই আদর্শ বাস্তবায়নের গুরুত্ব সাইদিনা উমর বিন আবদুল আযীয (র.)-এর সেই ঐতিহাসিক কথা দ্বারা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, যে কথাটি তিনি তার এক কর্মচারীর অভিযোগের উপরে বলেছিলেন। কর্মচারীটি অভিযোগ করেছিল, দ্রুত বিস্তার লাভ করায় জিয্য়ার পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। তখন তিনি বলেছিলেন, ধিক তোমাকে! রসূলুল্লাহ (সা.)-কে তো খাজনা উসূলকারী হিসাবে নয় বরং হাদী (পথ প্রদর্শনকারী) হিসাবে পাঠানো হয়েছিল।

৭. তিরমিযী (ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত)।

৮. বুখারী, তিরমিযী ও নিসায়ী (আবি আবস্ থেকে বর্ণিত)।

৯. বুখারী ও মুসলিম।

১০. বুখারী ও মুসলিম।

১১. তিরমিযী, আহমদ ও ইবনে মাজায় বর্ণিত এই হাদীসটি বেশ দীর্ঘ। স্মরণশক্তির দুর্বলতার কারণে আমি আমার বক্তৃতায় শুধু হাদীসটির ভাবার্থ বলেছিলাম। কিন্তু লিপিবদ্ধ করার সময় গ্রন্থ দেখে মূল শব্দসহ আসল হাদীস এবং এর ভাবার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্য কয়েকটি হাদীসের উদ্ধৃতি তুলে দিলাম।

১২. সুনান।

১৩. সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদঃ দ্বিতীয় খণ্ড (লাহোর সংস্করণ)

১৪. বুখারী ও মুসলিম।

১৫. সীরাতে উমর ইবন আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদিল হিকম

১৬. এই গাযওয়ার বিস্তারিত বিবরণের জন্য সীরাতে ইবনে হিশাম ঃ তৃতীয় খণ্ডঃ পৃষ্ঠা ৩৭৩-৩৮৯ (মুসতাফা আল্-বাবী আল হালবী কর্তৃক মিসরে মুদ্রিত)ঃ দ্বিতীয় সংস্করণ এবং সিয়ার ও মাগাযীর অন্যান্য গ্রন্থাদি দ্রষ্টব্য।

১৭. হায়াত-ই-মুহাম্মদঃ ডঃ মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল্ঃ পৃষ্ঠা-৩৭৭

১৮. সীরাতে ইবনে হিশামঃ তৃতীয় খণ্ডঃ পৃষ্ঠা-৩৭৫

১৯. জর্দানের লোক এটাকে بترا এবং ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদরা بطراء ও بطوه বলে থাকেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, এটা সেই জায়গা যেটাকে ইব্‌রানীরা সালা' বলত। এটা সেই আরবী উপত্যকা-বসতি-যা গ্রীক ও রোমানদের কাছে খুবই বিখ্যাত ছিল। আরবী বংশোদ্ভূত নাবাতীরা হাজার বছর পূর্বে এই বসতি স্থাপন করে। তারা সভ্যতা-সংস্কৃতিতে ছিল অনেক উন্নত। এখানকার অনেক কবি, চিকিৎসক ও বণিক মিসর, সিরিয়া, ফুরাত ও রোমান এলাকা সফর করতেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তারা ছিল পৌত্তলিক। 'লাত' মূর্তি, যা উত্তর হিজাযের লোক এখানে নিয়ে এসেছিল-এতদাঞ্চলের ঐ সমস্ত কেন্দ্রীয় দেবতাদের মর্যাদা লাভ করে, যেগুলোর পূজা নাবতীরা করত।

ইফাবা. (উ)/১৯৯২-৯৩/ অঃ সঃ/৪১৩৯-৫২৫০